সুখ দুঃখ

সুখ দুঃখ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি চন্দ্রিমা মণ্ডল
অর্পিতা প্রকাশনী
বি-৬/১৭৫, কল্যাণী
নদীয়া

ব্যবস্থাপক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

পরিবেশক :
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রকাশ : ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : রতন মুখার্জী

মুদ্রাকর :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

সুখ দুঃখ

নারীতান্ত্রিক

ভেতর বারান্দায় কলিংবেল বেজে উঠতে ধড়মড় করে উঠে পড়ল বিমান। রতনের বাপ কাজে এসে গেল? বাজে কটা? চোখ কচলে দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। ছটা পঁয়ত্রিশ। ইশ, এত বেলা হয়ে গেছে! এরপর কখনই বা টুবলিকে স্কুলের জন্য তৈরি করবে, কখনই বা রান্না চড়াবে......! কালও অনুরাধাকে ভাত না খেয়ে অফিসে ছুটতে হয়েছে। রোজ রোজ এমনটা হলে অসুখে পড়ে যাবে না অনু! অতক্ষণ রাত জেগে কাল টিভি দেখা বিমানের উচিত হয়নি, নেশাটা এবার কমাতে হবে।

কদিন ধরে জম্পেশ শীত পড়েছে। গত সপ্তাহে কোথ্থেকে এক নিম্নচাপ এসেছিল কলকাতায়, ভরা ডিসেম্বর ঝমঝম তিন দিন বৃষ্টি ঝরিয়ে যেই না মেঘ সরেছে ওমনি বাতাস একেবারে বরফ। বিছানা থেকে নেমে বিমান একখানা হাফ সোয়েটার চড়িয়ে নিল গায়ে, অনুরাধার কিনে দেওয়া জয়পুরী চাদর তার ওপরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বাইরে এসে দরজা খুলেছে।

ঘুম জড়ানো গলায় বলল—এত দেরি?

—বাপ্‌স, যা কুয়াশা! রতনের বাপ টুক করে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে, —টেরেন, এক্কেবেরে ঢিকির ঢিকির চলে, নড়তেই চায় না, নড়তেই চায় না।

—আসবে তো দুটো স্টেশন, তার জন্য কত বাহানা! সাধে কি তোমার দিদি ট্রেনের লোক রাখতে বারণ করেছিল! গজ গজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে এগোল বিমান—বাসনের কাঁড়ি জমে আছে, চটপট মেজে মশলাটা করে দাও।

রতনের বাপ আর বেশি রা কাড়ল না। বাসনের স্তূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সিংকের সামনে।

বিমান গ্যাস জ্বালিয়ে চায়ের জল বসাল। ফ্রিজ থেকে দুধ বার করে বসিয়েছে পাশের বার্নারে। কাপে চিনি দিতে দিতে টেরচা চোখে রতনের বাপের দিকে তাকাল—কাল ডুব মারলে যে বড়?

—গা গতরে কাল বড় বেদনা গো জামাইবাবু! বিছানা ছেড়ে উঠতিই পারিনি।

—শুধু মিথ্যে কথা। পরশুও বাড়ি যাওয়ার সময়ে দিব্যি সুস্থ ছিলে......

—নাগো জামাইবাবু। সত্যি। মহাদেবের দিব্যি। পরশু রাতে রতনের মা এমন পেটাল......মিছিমিছি...

—মিছিমিছি কেন হবে? নিশ্চয়ই কিছু করেছিলে?

—কিছু করিনি। কাজ সেরে ফেরার পথে ধরমবোনের সঙ্গে একটু দেখা করতে গেছিলাম, তাই নিয়ে সন্দেহ।.....পুরুষমানুষ হয়ে জন্মানোটাই পাপ জামাইবাবু।

রতনের বাবার ওপর এবার একটু মায়া হল বিমানের। সত্যিই, রতনের মা-র বেজায় সন্দেহবাতিক, কারণে অকারণে বরকে মারধর করে। মহিলাকে দেখেছে বিমান, শুঁটকো হাড়গিলে চেহারা। ওই চেহারায় অত বল আসে কোথ্‌থেকে কে জানে! বাজারে ডিম বিক্রি করে রতনের মা। পাঁচ বাড়ি ঠিকে কাজ করে রতনের বাপ যে কটা টাকা কামায় মাস পয়লায় তাও ছিনিয়ে নিয়ে বোতল বোতল চুল্লু গেলে। বেচারা রতনের বাপ!

চা নাড়তে নাড়তে বিমান বলল,—তুমিও বাপু কেমন যেন আছ। বউ যখন পছন্দ করে না, ধরমবোনের কাছে যাওয়া কেন? তোমার দিদি যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশতে বারণ করে, আমি তার সঙ্গে মাখামাখি করতে যাব? পুরুষমানুষের স্বভাব চরিত্র নিয়ে কথা ওঠা কি ভালো?

রতনের বাপ শার্টের হাতার চোখের জল মুছছে। বিমান চায়ের কাপ নিয়ে শোওয়ার ঘরে এল। অনুরাধা এখনও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে, কোলের কাছে টুবলি। মা মেয়ে দুজনেই খুব আরামপ্রিয়, কিছুতেই লেপের ওম ছাড়তে চায় না।

মশারি তুলে খুনসুটি করার ভঙ্গিতে লেপ টানল বিমান,—টুবলি ওঠ। স্কুল যাবি না?......অ্যাই শুনছ? চা নাও!

টুবলি নড়েচড়ে উঠল। অনুরাধা নতুন করে লেপ ঢেকেছে গায়ে।

—ওঠো। উঠে পড়ো। সাতটা বাজে।

—উমমম্।

—আলসেমি কোরো না। যাও, চা খেয়ে নিয়ে আগে বাজারটা করে দাও।

অনুরাধা পাশ ফিরে শুল,—আঃ, জ্বালিও না তো। চা ড্রেসিং টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও।

বিমান মুখ টিপে হাসল। কী বললে এক্ষুনি অনুরাধা লাফিয়ে উঠবে তার জানা। যেন দেওয়ালকে শোনাচ্ছে এমনভাবে বলল,—খবরের কাগজে আজ একটা দারুণ নিউজ আছে। তোমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এগারো পারসেন্ট ডি-এ বেড়েছে।

কাজ হল। তড়াং করে লেপ ছেড়েছে অনুরাধা,—কই, কাগজ কোথায় দেখি।

—ব্যালকনিতে পড়ে আছে। বিমান মশারির খুঁট খুলতে খুলতে হাসছে,— গুলটা না মারলে তুমি উঠতে!

অনুরাধা বেজার মুখে চায়ে চুমুক দিল,—উফ, তুমি না—

বিমান আর দেরি করল না। মেয়েকে টেনে ঘুম থেকে তুলেছে। টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে, হাতে ধরিয়ে দিয়েছে পেস্ট আর ব্রাশ। তারপরেই ছুট, দুদ্দাড়িয়ে

রান্নাঘর। মেয়ের স্কুলবাস এসে যায় ঠিক পৌনে আটটায়, তবে আগে মেয়ের একটা মোটামুটি জলখাবার তৈরি করে ফেলতে হবে। কী করবে? চাউমিন? হুঁ, ওতে সময় কম লাগে। সেদ্ধ করো আর ভাজো! মেয়েও ওটা পছন্দ করে। সঙ্গে একটু দুধ কর্নফ্লেক্সও খাওয়াতে হবে। দিন দিন সিড়িঙ্গে হয়ে যাচ্ছে মেয়ে। টুবলির স্কুলের টিফিন নিয়ে অবশ্য সমস্যা নেই। অফিস থেকে ফেরার সময়ে অনু কাল কলা আঙুর এনেছে, সঙ্গে ডিমসেদ্ধ আর চার পিস মাখন পাউরুটি দিলেই যথেষ্ট।

গরম জলে নুডল্স ছেড়ে দ্রুত হাতে পাঁউরুটিতে মাখন মাখাচ্ছে বিমান। কত কাজ এখন হাতে, কত কাজ। মেয়ের ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করতে হবে, স্কুল ব্যাগ গুছিয়ে দিতে হবে, জামা জুতো পরাতে হবে মেয়েকে—। অনুরাধা তো একটু নড়েও বসবে না, পা ছড়িয়ে এখন খবরের কাগজ গিলবে। বাজারের থলি, তেলের শিশি সব মুখের সামনে ধরে না দিলে গাত্রোত্থানই করবেন না তিনি। টিকু টিকু করে বাজার এনেই চেঁচাতে শুরু করবে, শিগগির ভাত দাও। আমার দেরি হয়ে গেল! বেরনোর আগে তারও আবার শতেক প্যাখনা। পাট পাট শাড়ি চাই। ব্লাউজের হুকটা ঢলঢল করছে, দুটো ফোঁড় দিয়ে দাও না! কাচা রুমাল কই আমার, কাচা রুমাল! টিফিনে আজ একটু স্যান্ডউইচ করে দিও না সোনা, রোজ রোজ রুটি তরকারি খেতে খেতে জিভে চড়া পড়ে যাচ্ছে! ও হ্যাঁ, বাজার যাওয়ার সময়ে অনুরাধাকে একটা ফিনাইল আনার কথা বলতে হবে, আর একটা আজিনামটোর প্যাকেট। আর এক ছড়া তেঁতুল। আর একটা কী যেন? আর একটা কী যেন? মনে পড়েছে। সুজি। মা মেয়ে কদিন ধরে সুজির পায়েস সুজির পায়েস করছে। সঙ্গে নতুন গুড়ের কথাও মনে করিয়ে দিতে হবে। নিজে থেকে তো কিচ্ছু গুছিয়ে আনে না অনুরাধা।

রতনের বাপ দুধের প্যাকেট এনে দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে অন্য বাড়ির বুড়ি ছুঁতে চলে গেল। গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে খচাখচ ছুরি চালিয়ে পেঁয়াজ কুচোচ্ছে বিমান, টসটস জল গড়াচ্ছে চোখ বেয়ে।

দিন শুরু হল।

বছর দুয়েক হল অফিস থেকে লোন দিয়ে দু কামরার এই ফ্ল্যাটখানা কিনেছে অনুরাধা। বিয়ের পর থেকে একতলা ভাড়া বাড়িতে দিন কেটেছে বিমানের, বড় সাধ ছিল নিজস্ব আস্তানাটা অন্তত দোতলা তিনতলায় হোক। লটারিতে অনুরাধার একতলাই উঠল। কী আর করা, সব কিছু তো আর মনের মতো হয় না। আরও কত কীই তো মনে মনে ভেবেছিল। ডাক্তার বউ হবে, ইঞ্জিনিয়ার বউ হবে, নিদেনপক্ষে সিভিল সারভেন্ট কি প্রফেসার। কপালে যদি গভর্নমেন্ট অফিসের ইউ ডি লেখা থাকে তো বিমান করবেটা কী!

মনের দুঃখ মনে রেখে একতলার এই ছোট ফ্ল্যাটখানাকেই সুন্দর করে সাজিয়ে

নিয়েছে বিমান। খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, সোফা, টিভি ক্যাবিনেট, শোকেস, ডাইনিং টেবিল, ফ্রিজ, ওয়াটার ফিল্টার সব মাপা জায়গায় ঠিকঠিক করে রাখা। বিমানের গোছানো রান্নাঘর যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। অনুরাধার বান্ধবীরা গা টেপাটেপি করে, কপাল করে এসেছিলি বটে অনু, এমন একখানা বর পেয়েছিস। আমাদের বরগুলো সব ন্যাদোসেরও ন্যাদোস। ঘর সাজানোর টেস্টই নেই। রান্না করতে গিয়ে হ্যালহ্যাল ঝ্যালঝ্যাল দশা। তাদের চোখ আরও কপালে তুলে দিতেই নিউমার্কেট গড়িয়াহাট ঘুরে ঘুরে টুকটাক শোপিস কিনে আনে বিমান। চিনেমাটির পুতুল, পিতলের ফ্লাওয়ার ভাস, পোড়ামাটির মুখোশ, আরও কত কী। ফ্ল্যাটের ছোট ব্যালকনিটা অনুরাধার ভীষণ প্রিয়, সময়ে অসময়ে ওখানে বসে থাকতে খুব ভালোবাসে অনুরাধা। বসে বসে তারা দেখে, পথচলিত মানুষদের দেখে, অনেক রাত অবধি বিমানকে পাশে বসিয়ে অফিসের গল্প শোনায়, কিংবা ছুটির দুপুরে চুল শুকোয় রোদ্দুরে। শুধু অনুরাধার ভালো লাগবে বলেই ব্যালকনিতে পাতাবাহারের টব সাজিয়েছে বিমান, অনুরাধার জন্য সুদৃশ্য একটা বেতের চেয়ারও কিনে রেখেছে।

গ্রিলঘেরা সেই ব্যালকনিতে এখন মিঠে রোদ খেলা করছে। মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে অনুরাধার চেয়ারটিতে এসে বসল বিমান। ভাত খেয়ে ওঠার পর এতক্ষণে কেমন গা ছেড়ে আসছে। মা মেয়ে দুজনেই নটার মধ্যে বেরিয়ে যায় বটে, তারপও কি হাঁপ জিরোবার অবসর আছে! কাজ কাজ আর কাজ। ঘরেও কোথাও এতটুকু ধুলো ময়লা বিমান একদম সহ্য করতে পারে না, আজও ঘুরে ঘুরে ঝাড়ল সব। পনেরো দিন ধরে জমাদার ডুব মেরে বসে আছে, অ্যাসিড ফিনাইল দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করল। ওবেলার জন্য বাঁধাকপির তরকারি রাঁধল, আলুর দম করল.....। তার মধ্যেই ঘোড়ায় জিন টেনে রতনের বাপ হাজির। একটুখানি নজর সরালেই বাবু ঘর দুটোকে ন্যাতাজোবড়া করে মুছে রেখে যাবে, তার পিছনে লেগে থাকতে হল কিছুক্ষণ। রতনের বাপের কাপড় কাচাও বিমানের একটুও পছন্দ নয়। সাবানজল থেকে তুলল, থুপল কি থুপল না, ধুয়ে মেলে দিল। আজও রতনের বাপ ধুয়ে যাওয়ার পর অনুরাধার অফিসে পরার শাড়িসায়াব্লাউজ আর সিল্কের সালোয়ার কামিজটা নতুন করে কাচতে হল বিমানকে। এতসব কিছু সারতে টুবলি ফিরে এল, তখন তাকে নিয়ে পড়ো। চান করাও, খাওয়াও, ঘুম পাড়াও। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে না নিলে সন্ধেবেলা পড়তে বসেই টুবলি ঢুলতে শুরু করে। আজ হোমটাস্কে টুবলিকে প্রচুর অঙ্ক দিয়েছে, মেয়ের স্কুল ব্যাগ খুলে দেখে নিয়েছে বিমান। সন্ধে হলেই মেয়েকে ঘেঁটি ধরে বসাতে হবে।

ভাবতে ভাবতে ম্যাগনাম সাইজের চার-পাঁচটা হাই তুলল বিমান। চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে। উঁহু, ঘুমোলে চলবে না। এই শীতের বেলায় ঘুম মানেই সারা সন্ধে গা ম্যাজম্যাজ। সকাল থেকে খবরের কাগজে চোখ বোলানো হয়নি, উঠে

নিয়ে আসবে ঘর থেকে? থাক, আলিস্যি লাগছে।

পাশের ফ্ল্যাটের সুব্রত ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে,—কি দাদা, কাজকর্ম সব সারা?

—এই খেয়ে উঠলাম। বিমান আর একটা হাই তুলল,—আপনার?

—আর বলবেন না। আমার ম্যাডাম আজ বাজার থেকে ইয়া ইয়া গলদা এনে হাজির। মালাইকারি খাওয়ার শখ হয়েছে। বসে বসে ছাড়াও, নারকেল কুরে দুধ বার করো, কম হ্যাপা!

সুব্রত শোনাচ্ছে। বউ গভর্নমেন্টের ইন্সপেক্টর তো, খুব কাঁচা পয়সা। পোলাও মাংস কাবাব ছাড়া কথা বলে না। তিনতলার অরিন্দম বলে সুব্রতর বউ নাকি বাজারে গিয়ে মাছ টাছের দর করে না। মাছওলার সামনে ঝড়াৎসে বাজারের থলি ফেলে দিয়ে বলে,—ওই ইলিশটা তুলে দাও, ওই চিতলটা কেটে দাও—! কপাল!

সুব্রত গ্রিলের ধারে সরে এসেছে। চোখে ইশারায় বিমানদের দোতলাটা দেখাল। চাপা স্বরে বলল,—ওপরে কী হচ্ছিল বলুন তো রাতে? চেঁচামেচি শুনছিলাম?

—যা হয় রোজ। বিমানের স্বরও সতর্ক, অফিস থেকে ফিরে শমিতা পেটাচ্ছিল রণজিৎকে।

—সেই মেয়েটা আবার বুঝি রণজিতের কাছে এসেছিল?

—তা ছাড়া আর কী! ওই মেয়েটাকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। রোজ দুপুরে ফ্ল্যাটে ঢলানি করতে আসবে......বউ যতই লিবারাল হোক, তারও তো সহ্যের একটা সীমা আছে দাদা। অমন মেয়েচাটা পুরুষ আর আমি দুটো দেখিনি। এত মার খায় তবু শিক্ষা হয় না! যে তোর ভাত-কাপড় দেয় তুই তার কোনো কথা মান্য করবি না!

—রণজিৎ তো বলে মেয়েটা তার পিসতুতো বোন।

—ছাড়ুন তো। যদি পিসতুতো বোনই হয়, কখনও সকাল বা সন্ধেয় আসে না কেন? শমিতা যেদিন লাথি মেরে বের করে দেবে সেদিন টেরটি পাবে। বাপের বাড়ি গিয়ে তো অনাহারে থাকতে হবে। জানেন তো, শ্বশুরবাড়ির সংসারও শমিতাই টানে। সাহায্য করে বলে দুটো খেতে পায় বুড়োবুড়ি। শমিতার মা তো শুনি পেনশনও পান না!

—হুঁ, রণজিৎটা.......। সবই বুঝি, আবার মায়াও হয়। বেচারাদের এখনও বাচ্চাকাচ্চা হল না.....কিছু নিয়ে তো একটা থাকতে হবে রণজিৎকে..সারাটা দিন একা একা বেচারা কাটায় কী করে!

—হচ্ছে না কেন? খুঁতটা কার?

—কী করে বলব দাদা! শমিতা তো একদিন আমার ম্যাডামকে বলছিল, রণজিৎকে এবার একদিন ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে।

—তাই?

কথা বলতে বলতে ঘুমঘুম ভাব পুরোটাই কেটে গেল বিমানের। এইসব পরনিন্দা পরচর্চা তার বেশ লাগে, শরীর মন ঝরঝরে হয়ে যায়। অনুরাধা এসব কুটকচালি পছন্দ করে না, এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটের গোপন কথা শোনাতে গেলে বিরক্ত হয়। বলে, এসব না করে দুপুরবেলা তো কোনো কাজের কাজ করতে পারে। অর্থাৎ সেলাই ফোঁড়াই, কি নতুন কিছু রান্নাবান্না, কিংবা উল বোনা—।

কথাটা মনে হতেই বিমান নাড়া খেয়ে গেল। অনুরাধার কার্ডিগানটা অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে, ফাঁকা দুপুরে ওটা নিয়ে তো বসাই যায়। শীত থাকতে থাকতে তৈরি না হলে ওটা আর অনুরাধার কী কাজে লাগবে!

সুব্রত ব্যালকনিতে মেলা কাপড়চোপড় তুলে ভেতরে ঢুকে গেছে। ঘর থেকে উল কাঁটা নিয়ে চেয়ারে ফিরল বিমান। বুনছে টুকটক। আর ইঞ্চিখানেক ঝুল বাড়ানোর পর বগল ফেলতে হবে। কাঁটা চালানোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট শ্বাস পড়ছে বিমানের। কত কিছুই তো শিখেছিল জীবনে। এম এ করেছে, কম্পিউটারের একটা ছোট কোর্স নিয়েছে, এক মাস মাস-কমিউনিকেশনের ক্লাসেও তো—সব ভুলে গিয়ে উলের কাঁটাই এখন মোক্ষ। বিয়ের পর পরই যদি জেদ করে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়ত তা হলেই বোধহয় ভালো হত। পেয়েও ছিল তো একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে। অনুরাধা তখন করতে দিল না। বলল, বরের চাকরি করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। ঘরের বর ঘরের বরের মতো থাকো। সেই অনুরাধা এখন গল্প শোনায়, অমুকের বর এই চাকরি করছে তমুকের বর ওই চাকরি করছে! নাঃ, বিমানেরই ভুল হয়েছে। জোর করে চাকরিটায় ঢুকে পড়লে অনুরাধা হয়ত এতদিনে মেনে নিত। সংসার ঠিকই চলত, টুবলিরও কিচ্ছু অসুবিধে হত না, কথায় কথায় বিমানকে হাত পাততে হত না অনুরাধার কাছে! নয় একটা রাতদিনের লোকই রেখে নিত। রতনের বাপকেই না হয়—

বিমানের বুক বেয়ে এবার একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। যা হয়নি তা ভেবে আর কী লাভ! এবারকার পুরুষ জন্মটা এভাবেই কেটে গেল। হাঁড়ি ঠেলে, ঘর সামলে, আর মেয়ে মানুষ করে।

টুবলি উঠে পড়েছে। উলকাঁটা গুছিয়ে ঘরে এল বিমান। সাড়ে তিনটে বাজে, মেয়েকে এবারে জিমন্যাস্টিকের ক্লাসে নিয়ে যেতে হবে।

ঘুম থেকে উঠেই টুবলি বল নিয়ে খেলতে শুরু করেছে। বিমান আলগা ধমক দিল মেয়েকে,—খেলা নয় টুবলি। দুধ খেয়ে রেডি হয়ে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে টুবলি নাকি সুরে বায়না জুড়েছে,—উহুঁহু বাবা, আজ জিমন্যাস্টিকের ক্লাসে যাব না।

—কেন?

—এমনিই। ভাল্লাগছে না। আজ একটু শম্পা তিতলিদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলি না বাবা।

—না। তোমার মা খুব রাগ করবে। তোমাকে তো আর কিছু বলবে না, আমাকেই কথা শুনতে হবে।

টুবলির মুখ পলকে ভার। মেয়েকে পাত্তা না দিয়ে বিমান রান্নাঘরে এল, দুধের সঙ্গে চায়ের জলও বসিয়েছে। দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে আলমারি খুলে মেয়ের জিমন্যাস্টিকের পোশাক বার করল, ভরে নিল ব্যাগে। আজ মেয়েকে ক্লাবে ঢুকিয়ে অন্য বাবাদের সঙ্গে আড্ডা মারলে চলবে না, ঝট করে একবার গড়িয়াহাট ঘুরে আসতে হবে। লেপের ওয়াড়গুলো ফেঁসে ফেঁসে গেছে, বদলানো দরকার। 'কৃষ্ণ সাজো' বুটিকে ভালো ভালো প্যান্টের পিস্ এসেছে, ফরেন জিন্সও—মোটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে—ওখানে একবার ঢুঁ মারলে হয়। থাক গে, মাসের শেষ, এখন বুঝেশুনে খরচা করাই ভাল—সামনের মাসের গোড়ায় বরং দেখা যাবে। আর এত জামাকাপড়ে তার হবেই বা কী! কবে কখন অনুরাধার সময় হবে, বর মেয়ে নিয়ে বেড়াতে যাবে, ঘরে তো আর নিত্যনতুন প্যান্টশার্ট পরে সঙ সেজে বসে থাকা যায় না! ও হ্যাঁ, মনে করে ফেরার সময়ে ইস্ত্রিওয়ালার কাছ থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে নিতে হবে। আজ একবার সেলুনে ঢুকতে পারলেও বেশ হত। দাড়িটা একটু ট্রিম করাতে হবে, ঘাড়ের কাছের চুলটাও একটু....সময় কি হবে?

টগবগ জল ফুটছে চায়ের। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্য সোনালি আলোর আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছে জানালা দিয়ে। বিকেলটাকে ছুঁকছে বিমান।

—এটা কী রান্না হয়েছে, অ্যাঁ, পুরো নুনকাটা!

—কোন্‌টায় নুন বেশি হয়েছে? বাঁধাকপি?

—আজ্ঞে না, তোমার এই আলুরদম। মুখে দিয়ে দেখেছ?

—এ হে হে হে, তাহলে বোধহয় দুবার নুন পড়ে গেছে। সরি।

—পেঁয়াজও তো দিয়েছ গেদে। এখন কত দাম যাচ্ছে পেঁয়াজের জানো?

—অত চোটপাট করছ কেন? বললাম তো সরি।

—সরিতেই সাতখুন মাপ! অনুরাধা ভুরু কুঁচকোল,—বাজার হাটে তো যেতে হয় না। খাচ্ছ দাচ্ছ আর ঢেসকুমড়ো হয়ে বসে থাকছ। শুধু একটু খুন্তি নাড়ার কাজ, তাতেও এত হেলাফেলা।

বিমানের মুখ চুন হয়ে গেল।

অনুরাধার তবু রোষ কমল না। বিরক্ত মুখে বলল,—কোথায় মন পড়ে থাকে সারাদিন?

—মন সংসারেই থাকে। বিমান গোমড়া.—সংসারের বাইরে মন যাওয়ার উপায়

রেখেছ? মুখ বুজে জোয়াল টানতে টানতেই তো জীবন গেল।

অনুরাধা আর কিছু বলল না। চুপচাপ খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। শাল জড়িয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে টিভি দেখছে।

বিরস মুখে টেবিল পরিষ্কার করল বিমান। রান্নাঘরে বাসন নামিয়ে ফ্রিজে তুলল খাবার দাবার, জগে জল ভরল। যান্ত্রিক হাতে পান সেজে অনুরাধার কাছে এসে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পানটা মুখে পুরে আড়চোখে বিমানকে দেখল অনুরাধা, ঠোঁট টিপে হাসল। বিমান সরে যাচ্ছিল পাশ থেকে, খপ করে ধরেছে তার হাত—রাগ হয়েছে?

বিমান চুপ।

—একটা রিকোয়েস্ট করলে আরও রেগে যাবে?

বিমান গোঁজ।

—ঠাণ্ডায় উঠতে ইচ্ছে করছে না, একটু পিকদানটা এনে দাও না প্লিজ। কচকচ পান চিবোচ্ছে অনুরাধা—আর ওই টেবিলের ওপর রাখা জর্দার কৌটোটাও এনো।

এমনভাবে বলা যেন রাতে খাওয়ার পর বিমানের আয়েশ নেই, বিমানের শীতবোধ নেই, বিমানের কষ্ট নেই! নারী জাতটা কি এমনই নিষ্ঠুর হয়!

নিঃশব্দে আদেশ পলন করে খানিক তফাত রেখে সোফায় বসল বিমান। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট খাওয়া তার একমাত্র বিলাস, সেটাও ইচ্ছে করছে না আজ। স্থির চোখ এঁটে আছে টিভির পর্দায়। বীভৎস এক হরর মুভি চলছে, অনুরাধা এখন এসবই গিলবে। বিমানের আজ আর ফার্স্ট চ্যানেলের 'আ যা মেরি বাহোঁ মে' সিরিয়ালটা দেখা হবে না। কি আর করা, কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম।

আরও একটুক্ষণ বসে থেকে রান্নাঘরে চলে গেল বিমান। গ্যাস মুছল, সকালের মশলাপাতি বার করে রাখল, কোণের নর্দমার মুখটা ইট দিয়ে বন্ধ করল চেপে চেপে। রতনের বাপ দুধের ডেক্‌চি ঘষে না ভালো করে, ওষুধের খালি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে মাজল বাসনটাকে। কনকনে ঠাণ্ডা জল, হাতের আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। শোওয়ার ঘরে এসে দেখল অনুরাধা মশারির ভেতর ঢুকে পড়েছে।

রাতবাতি জ্বালিয়ে বিমানও বিছানায় এল। টুবলির শোওয়া খুব খারাপ, গা থেকে লেপ সরে গেছে, মেয়েকে টেনে সোজা করে শুইয়ে ঢেকে দিল। নিজের লেপ গায়ে চাপিয়ে চোখ বুজেছে। বড় ক্লান্তি, বড় ক্লান্তি, মাথাটা টিপটিপ করছে।

হঠাৎই শরীরে অনুরাধার ছোঁয়া। লেপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কাঁধ ধরে টানছে অনুরাধা। আলতো ঝাঁকি দিয়ে সরে গেল বিমান।

অনুরাধা বিমানের লেপের তলায় চলে এল,—এখনও রাগ করে আছ?

বিমান উলটোদিকে ফিরে শুল।

—আর বোলো না, অফিসে আজ যা একটা বিশ্রী ব্যাপার হল না! ডেপুটি

সেক্রেটারি বিনা কারণে আমাকে ডেকে ধাতাল। কি, না তার কোন রিলেটিভের পেনশন ফাইল নাকি আটকে আছে! যত বলি ম্যাডাম, ওটা আমার কাছে নেই—

ও, এই ব্যাপার। অফিসের রাগ বাড়ির বরের ওপর এসে দেখানো। বিমান ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। বর তো ডাস্টবিন, বাইরের যত রাগ অপমান আক্রোশ, সব কিছু তার গায়ে ছুঁড়ে দাও।

অনুরাধা আরও একটু ঘন হল,—এসো, কাছে এসো।

বিমান শক্ত হয়ে গেল। তপ্ত নারীনিঃশ্বাস ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীর, সরু সরু পাঁচটা আঙুল মাকড়সার মতো খেলা করছে বুকে।

বিমান অল্প ঝেঁঝে উঠল,—আহ্ ঘুমোতে দাও।

—অমন করছ কেন? এসো না।

—আমার মাথাব্যথা করছে। ভালো লাগছে না।

অনুরাধা বিমানের চুল ঘেঁটে দিল,—ঠিক আছে, অন্যায় হয়েছে। আর বকব না।

—সত্যি আমার মাথা ধরেছে।

—এসো, টিপে দিচ্ছি।

জোর করে নিজের দিকে বিমানের মুখটা ঘোরাল অনুরাধা। কপালে চকাস করে চুমু খেল। ঠোঁটেও।

আর উপায় নেই। যতই মাথা ধরুক আর যাই হোক, সব শরীর খারাপ এখন শিকেয় তুলতে হবে। বিমানের ইচ্ছে অনিচ্ছে ভালোলাগা মন্দলাগা সমস্তই মূল্যহীন।

ধরা ধরা গলায় বিমান বলল,—এত করেও তোমার মন পাই না। সকাল থেকে রাত উদয়াস্ত খাটছি, তোমার সংসার ছাড়া কিচ্ছু ভাবি না—কত কাল বাবার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত যাই না—তবু পান থেকে চুন খসলে তোমার মুখ ঝামটানি।

অনুরাধা নয়, ছায়া ছায়া অন্ধকারে খল খল হেসে উঠল কেউ। অন্য কেউ। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা অনেক সহ্য করেছি, এবার তোমাদের পালা। দ্যাখো কেমন লাগে!

বনসাই

দাড়িওলা দোকানদার ব্যস্তসমস্ত মুখে প্রশ্ন করল,—আপনি ঠিক কোন রংটা খুঁজছেন ম্যাডাম?

সুন্দরী গৃহিণী তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। দোকানের কোণে তারের খাঁচায় এক ঝাঁক বদ্রিকা হুটোপুটি করছে, প্রায় ছুটে চলে গেল সেখানে। দোলায় বসা একটা পাখির দিকে ঝট করে আঙুল দেখাল,—ওইটা। ঠিক ওই রংটা চাই।

প্রার্থিত রঙের টিন কাউন্টারে সাজাচ্ছে দোকানদার........

সিরিয়ালের মাঝে কমার্শিয়াল ব্রেক। রঙের বিজ্ঞাপন। দূর, সাদাকালো টিভিতে রঙের মহাত্ম্য কিছুই বোঝা গেল না। কী রং চাইল মেয়েটা? নীল? খয়েরি? হলুদ? নাকি এ ঘরের দেওয়ালের মতো ক্যাটকেটে সবুজ?

বিরক্ত মুখে সীমা বলে উঠল,—অসহ্য।

তাপস সবে বাড়ি ফিরে অফিসের খোলস বদলাচ্ছিল। শোওয়ার ঘর থেকেই বউয়ের আক্ষেপোক্তি বুঝি কানে গেল তার। লঘু স্বরে প্রশ্ন ছুড়ল,—হল কী?

—তোমার এ টিভি। সীমা আবার বলল,—অসহ্য।

—কেন, পিকচার গণ্ডগোল করছে?

মেঝেয় বসে পিসবোর্ডে টুকরো জোড়া দিয়ে খেলনাবাড়ি বানাচ্ছে তিতলি। ফুড়ুৎ করে বলে উঠল,—না বাবা, পিকচার ঠিক আছে।

—তা হলে?

—তা হলে কী তুমি জানো না? সীমা ঝেঁঝে উঠল,—কবে থেকে বলছি এ টিভিটাকে বদলাও, এ টিভিটাকে ফ্যালো। বিশ্বসুদ্ধ লোকের বাড়ি কালার টিভি এসে গেল, শুধু আমরাই ওই মান্ধাতার আমলের......দূর দূর, কোনো কিছুর রং বোঝা যায় না। গাছের রংও যা, মানুষের রংও তাই, শাড়ির রংও তাই......

গজগজের মেলট্রেন চলছে সীমার। তাপস উত্তর দিল না কোনও। টুক করে বাথরুমে ঢুকে গেল। ফিরে এসে বসেছে সোফায়। ঝুঁকে মেয়ের চুলে হাত বোলাচ্ছে। সীমা কটমট করে স্বামীর দিকে তাকাল, — বোবা হয়ে থাকলেই সব চাপা পড়ে যাবে? আমি শুধু মুখ নষ্ট করে হেনস্থা হচ্ছি?

—যাহ্ বাবা। কে তোমায় হেনস্থা করল?

—তুমি করছ। আমার কোনো চাওয়ার মূল্য নেই তোমার কাছে। একে হেনস্থা

করা ছাড়া আর কী বলে?

তাপস হেসে ফেলল,—চটছ কেন? যা হয় না তা বলছই বা কেন?

—কেন হয় না? আমাদের কি একটা কালার টিভি কেনারও মুরোদ নেই?

তাপসের মুখ সামান্য ম্লান হল এবার,—কালার টিভির দাম জানো?

—সব্বাই জানে। তিতলিও জানে। তিতলি বলে দে তো বাবাকে একটা কালার টিভির দাম কত।

চার বছরের তিতলি ঘাড় না তুলে পাকা বুড়ির মতো জবাব দিল, —বুবাইদের টিভির দাম কুড়ি হাজার টাকা, বুবাই বলেছে।

আরও ম্লান হল তাপসের মুখ,—এক কথায় অত টাকার একটা জিনিস কিনে ফেলা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

—একটু কম দামের কোনো। বারো হাজারে, তেরো হাজারে।

—তাই বা পাব কোথায়?

—ইনস্টলমেন্টে কেনো। আজকাল তো হাজারো রকমের স্কিম চালু হয়েছে।

—সেখানেও তো প্রথমে কিছু থোক লাগবে। তা ছাড়া মাসে মাসে আমি ইনস্টলমেন্টের টাকাই বা জোগাব কোথ্থেকে? পি এফে প্রতি মাসে কতগুলো করে টাকা শোধ করতে হচ্ছে, এল আই সি'র লোন মেটাতে হচ্ছে......

—বুঝেছি বুঝেছি। শুধু বাহানা, শুধু বাহানা। আসল কথা বলো না, বউয়ের কোনো সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ হয় তা তুমি চাও না। তুমি একটি ন্যাদোস।

তিতলি হি হি হেসে উঠল,—এমা, বাবা নাকি ন্যাদোস।

সীমা সংযত হল একটু। উঠে দাঁড়িয়ে হিম হিম গলায় বলল,—চা খাবে?

—থাক। এসে থেকেই যা জুটছে।

—সে তো নিজের দোষে।

—আমার কী মনে হয় জানো সীমা? তোমার একটু অন্য রকম ঘরে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। টাকাপয়সাওলা ফ্যামিলিতে। ফস করে কথাটা বলে ফেলল তাপস,—আমার মতো কেরানি গোছের মানুষ তোমার জন্য মিসফিট।

তাপস গোমড়া হয়ে গেছে। সন্তর্পণে তিতলির দিকে তাকিয়ে রান্নাঘরে সরে এল সীমা। মেয়ের সামনে মাকে এমন কথা বলে কোনও বাবা? ছিঃ ছিঃ। তাপস কথাটা আজকাল প্রায়ই বলে। ইচ্ছে করে বলে। সীমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বলে। সত্যি সত্যি তাপসের থেকে ভালো বর জোটেনি বলেই হয়তো বলে। সীমা গ্যাসে কেটলি বসাল। হত হত, ভালো বিয়ে হত মশাই। সীমা দেখতে খারাপ, না ফিগার খারাপ? বিয়ে তো নয় নয় করে কম দিন হয়নি, ছ'বছর, এখনও তাপসের বন্ধুরা আড়ে আড়ে তাকায় কেন? খারাপ যদি কিছু থেকে থাকে, সে হল সীমার কপাল। তার লিখন কে খণ্ডায়। নইলে কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল.... সেই যে ছেলেটা

ডটপেন তৈরির বিজনেস, ফর্সা লম্বা, কী স্মার্ট..... ব্যবসা করে বলে বাবা তাকে বাতিল করে দিল। কী না ব্যবসায়ীদের রোজগারের কোনও স্থিরতা নেই! আজ রমরমা, তো কাল উলটো গণেশ! ছেলেটা ছবি দেখেই সীমাকে পছন্দ করেছিল তো! সেসব আফসোস ভুলে তাপসকে তো মেনে নিয়েছে সীমা, তার পরও এত কথা ওঠে কেন!

জল ফুটে গেছে। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে কেটলির ঢাকনা খুলল সীমা, চায়ের পাতা ফেলল। হালকা সুগন্ধ ভেসে এল নাকে, তবু খিঁচড়োনো মেজাজটা সিধে হচ্ছে না। তাপস কি চেষ্টা করলে আরেকটু সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করতে পারে না সীমার!

কাপ প্লেট হাতে সীমা বসার জায়গায় এল। তাপসের পাশ ঘেঁষে বসেছে। চোখের কোণ দিয়ে তাপস দেখছে তাকে, টের পাচ্ছে সীমা। অপলক চোখে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটা হিন্দি সিরিয়াল চলছে টিভিতে। দেখছে সীমা, অথচ দেখছে না।

—রাগ করে আছ এখনও?

সীমা ঘুরল না,—রাগ করে থাকা কি আমার শোভা পায়?

—কখন কী বলে ফেলি! সরি!......স্লিপ অফ টাঙ্।

সীমা নিশ্চুপ।

তাপস ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল,—কেন আমার অবস্থাটা একটু ফিল করতে চাও না তুমি? কার জন্য আমি প্রাণপাত করি? আমার বাপ ঠাকুর্দা চোদ্দ পুরুষ চিরকাল ভাড়া বাড়িতে জীবন কাটিয়েছে। শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে এই ফ্ল্যাটের জন্য আমি জান লড়িয়ে দিইনি? কত টাকা আমি মাইনে পাই তুমি তো জানো।

—আমি সব জানি। সীমার স্বর ভারী।

—তা হলে মাঝে মাঝে এমন উটকো বায়না করো কেন? ফ্ল্যাট করার জন্য আমাকে একটু ধন্যবাদ অন্তত দিও। একটু অন্য ভাবে কথা বোলো।

—হুঁহ্। ভারি তো ফ্ল্যাট! সীমার ঠোঁট বেঁকে গেল,—শোনালে সাতশো দশ স্কোয়ার ফিট, ঢোকার সময়ে ছশো হয়ে গেল।

—সেকি আমার দোষ? করপোরেশনে প্ল্যান নিয়ে ঝামেলা না হলে.....

—তুমি বসে বসে তোমার গাওনা গাও। আমার অনেক কাজ আছে। সীমা মেয়ের হাত ধরে টানল,—তিতলি চলো, খাবে চলো।

সীমা মেয়েকে খাবার টেবিলে এনে বসাল। ছোট্ট টেবিল আর চারটে চেয়ারে ভরে আছে জায়গাটা, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার মধ্যেই ফ্রিজটাকে যে কী করে বসানো হয়েছে!

ফ্রিজ থেকে মেয়ের মাছের ঝোল বার করে গরম করে আনল সীমা। রাতে

মাছ খেতে চায় না মেয়ে, ভাতও না। ঝোলে রুটি ডুবিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করে খাওয়াতে হয়। মুরগি খেতে বেশি ভালোবাসে মেয়ে, কিন্তু সে তো সপ্তাহে একদিন বরাদ্দ। অজান্তেই নিশ্বাসটা আবার ঘন হয়ে এল সীমার। তিতলিকে খাওয়াতে খাওয়াতে তাকাচ্ছে চতুর্দিকে। কান্না পায়, এই ফ্ল্যাটটাকে দেখে সত্যিই তার কান্না পায়। বছর ঘুরতে চলল, এখনও মেনে নিতে পারল না মন থেকে। মাত্র তো দুটো ঘর, তারও কী সাজ। প্রোমোটার প্রথমে বলেছিল দুটোই নাকি দশ বাই বারো হবে, শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল আট বাই এগারো, দশ বাই দশ। বাথরুম, রান্নাঘর, তাও যা একটু পদের। কিন্তু ঘরেই যদি দু পা হাঁটতে তিনটে ঠোক্কর লাগে, ভালো লাগে মানুষের। আর ওইটাই বা কী ড্রয়িং হল। সাত বাই আটের একটা খালি প্যাসেজ, সেখানে টিভি শোকেস বেতের চেয়ার মোড়া, একেবারে জবরজং দশা। কত স্বপ্ন ছিল ড্রয়িংরুম ছিমছাম সাজাবে, কিচ্ছু হল না। পুতুল, ফুলদানি পেতলের শো-পিস সব ডাঁই করে রাখতে হয়েছে। বাড়ি যদি হলই নিজের, আরেকটু কেন মনোমতো হল না!

খেতে খেতে ঢুলছে তিতলি। মেয়েকে ঝাঁকি দিয়ে জাগাল সীমা। গরাস তুলে তুলে মেয়ের মুখে ঠাসছে। অপাঙ্গে দেখল দরজার কাছে রাখা কাগজের মোড়কটা নিয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছে তাপস। নির্ঘাৎ আবার নিম কি তেঁতুল কি কাঁঠাল। কী যে বিদ্‌ঘুটে বনসাই-এর শখ তাপসের! টবে টবে চার বাই আড়াই ব্যালকনিটা ভরিয়ে দিল!

চোখ বুজে বুজে খাওয়া শেষ করল মেয়ে! চোখ বুজে বুজেই আঁচাল। মেয়েকে কোলপাঁজা করে এনে ঘরে শুইয়ে দিল সীমা। শান্তি। সারাদিন যা হুড়ুদ্দুম করে মেয়ে। পাড়ার নার্সারি থেকে ফিরল তো একবার এই ফ্ল্যাট, একবার সেই ফ্ল্যাট। একবার চারতলা তো একবার তিনতলা। মেয়ের বা দোষ কী। এইটুকুন জায়গায় কি কোনও শিশুর মন আঁটে!

তাপস এখনও ব্যালকনিতে। খুটুর খুটুর করছে। টিভিটা খোলা, চলছে নিজের মনে। পুরোনো হিন্দিফিল্ম শুরু হয়েছে একটা। দেব আনন্দের প্রেমপূজারী। কলেজ কেটে সিনেমাটা দেখেছিল সীমা, কী অপরূপ সিনসিনারি ছিল ছবিটায়। ওই টিভিতে সব দৃশ্যই এখন বিবর্ণ, সবই ম্যাড়মেড়ে।

সীমা ফট করে টিভিটা বন্ধ করে দিল।

তাপসের গলা শুনতে পাওয়া গেল,—টিভিটা অফ করলে কেন?

দেখছেটা কে? শুধু শুধু চলার কী দরকার?

—গানগুলো শুনছিলাম।

শুধু গান শোনার ইচ্ছে হলে রেডিও কোনো, টেপ কোনো। সীমা আরেকটু গলা ওঠাল,—ও, তোমার তো আবার পয়সা নেই। তুমি তো এখন ফ্ল্যাট কিনেই

ফতুর। ভালো ভালো। ওই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিই তোমার রেডিও টেপ.....

তাপস ব্যালকনি থেকে ফিরল। মাটি মাখা হাত। আঁহত চোখে দেখছে সীমাকে,—তোমার মাঝে মাঝে কী হয়, অ্যাঁ? হঠাৎ হঠাৎ ফোঁস! পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া!

—আমি তো এরকমই। ঝগড়ুটে লোভী বে-আক্কেলে.......

—উঁহু, তুমি মোটেই তা নও। আর নও বলেই তো আমার অবাক লাগে।

তাপস বেসিনে হাত ধুতে ধুতে হাসছে,—তোমার মাথায় কি এক-এক দিন ভূত ঢোকে সীমা? নাকি কোনও পোকা...?

সীমা জবাব দিল না। ঘরে এসে ঘুমন্ত মেয়ের মাথার কাছে বসেছে। বসেই আছে। চৈত্রের দমকা হাওয়া থেকে থেকে ঝাঁপ কাটছে ঘরে। মিঠে বাতাসে ক্রমে জুড়িয়ে এল মন। সত্যি, এক একদিন কী যে তার। মাথাটা কিছুতেই বশে থাকে না। আজ সন্ধেতেই বা হল কেন এমনটা? রং-কোম্পানির বিজ্ঞাপনটাই কি...? ওই বিজ্ঞাপন তো রোজই দেখে, দশ বার বিশ বার করে দেখে.....। হয়তো একই দৃশ্য প্রতিদিন মনের ওপর একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, আবার অতি নিরীহ ছবিও হঠাৎ কোনো ক্ষণে স্ফুলিঙ্গ হয়ে বাসনার বারুদগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে সত্যিই কি তাপসের কিছু করার আছে? মাত্র সাড়ে ছ'হাজারি এক আধা-সরকারি কর্মচারী এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে চৌত্রিশ বছর বয়সে একটা ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছে, এই না ঢের।

তিতলি এপাশ-ওপাশ করছে। মশা?

ছত্রিতে মশারির খুঁটগুলো টাঙিয়ে দিল সীমা। টেনে টেনে গুঁজে দিল বিছানায়। বেরিয়ে তাপসকে ডাকল,—খাবে এসো।

তাপস খবরের কাগজ উল্টোচ্ছে। ভার গলায় বলল,—পরে খাব।

—খেয়ে নাও না। সাড়ে নটা বাজে।

—যাই।

বলেও উঠছে না তাপস। আদ্যোপান্ত পড়া কাগজটায় চোখ গেঁথে বসে আছে। পড়ছে, নাকি সীমার ওপর অভিমান হয়েছে একটু?

সীমা টেবিলে খাবার সাজাল। শব্দ করে করে। ওই শব্দেই যেন সমে ফিরল তাপস। এসেছে টেবিলে। এখনও তার মুখের ভাব যথেষ্ট গম্ভীর, যেচে কোনও কথা বলছে না। টুকটাক দু-একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলল সীমা, হুঁ-হ্যাঁ করে এড়িয়ে গেল তাপস।

সীমার হাসি পাচ্ছিল। তাপসটা একেবারে ছেলেমানুষ। কোথায় মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে বউকে স্বচ্ছন্দ করে দেবে, তা নয়.......

খেয়ে উঠে রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজ সারল সীমা। শোয়ার ঘরে এসে দেখল

কাগজে কী সব হিসেব কষছে তাপস। ডাকল না তাপসকে, ঢুকে পড়েছে মশারিতে। চোখ বুজল।

একটু তন্দ্রা তন্দ্রা মতো এসেছিল, তাপসের ছোঁয়ায় ঘোরটা কেটে গেল।

—কিছু বলছ?

—হুঁ?

—কী?

—রাগ পড়েছে?

সীমা ঘুরে চিত হয়ে শুল,— আমি তো রেগে নেই।

—তা হলে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ছ যে?

সীমা হাসল সামান্য,— এই বলার জন্য ডাকলে?

—না। ..... বসে বসে একটা এস্টিমেট করলাম, বুঝলে। জুলাইয়ে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে তো, প্লাস একটা ছোট্ট এরিয়ারও পাব। সব মিলিয়ে তখন হাজার চারেকের মতো হাতে আসবে। ওই অ্যামউন্টটা যদি ডাউন পেমেন্ট করে দিই...... তা হলে পরের মাস থেকে যে করে হোক ইনস্টলমেন্টের টাকাটা... না হয় কটা বেশি ইনস্টলমেন্টই নেব, ছত্রিশ মাসের।

সীমার হৃদয়টা দ্রব হয়ে গেল। সে বড় অকারণে দোষারোপ করে মানুষকে। চোর-ছ্যাঁচোড় নয়, উপরি রোজগারের জন্য ছোঁক ছোঁক করে না, নেহাত ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না বলেই তো সাধ-আহ্লাদগুলোকে ছেঁটে ফেলতে চায় তাপস। সে কি বেশি চাপ সৃষ্টি করেছে? ভাবতে গিয়ে সীমা একটু মজাও পেল। তার চাপ আছে বলেই না জিনিসটার জন্য যেমন তেমন করে হোক উঠেপড়ে লাগতে চাইছে তাপস।

সীমা পলকা স্বরে বলল,—এখন থাক। তোমার তো অসুবিধে হবে।

—নাহ্, এবার কিনেই ফেলব। তুমি সারাদিন একা একা থাকো, রঙিন টিভি এলে সে তোমার ভালো সঙ্গী হবে।

—উঁহু, এখন দরকার নেই।

—আছে আছে। মেয়েকে টপকে সীমার বালিশে চলে এল তাপস। নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এল দুজনে। টুকটাক কথা বলছে। সাংসারিক কথা, মেয়ের কথা, অফিসের কথা। দরকারি কথা। অদরকারি কথা।

এক সময়ে তাপস বলল,—জানো অফিসে আজ অ্যাকাউন্টস্ অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এক দু'মাসের মধ্যে এল-টি-সিটা নিয়ে নিতে বলছে।

—কেন?

—নইলে নাকি টাকা ফেরত চলে যাবে।

—সে কী কথা। ফেরত দেবে কেন? চলো তাহলে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। একটা কোথাও ঘুরে এলে হয়।.... এই প্রথম এল-টি-সি অ্যাভেল করার চান্স পেলাম, সুযোগটা বেমক্কা চলে যাবে।..... কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?

—কত পাবে?

—হাজার কিলোমিটারের মতো ভাড়া দেবে ট্রেনের। সেকেন্ড ক্লাস। আর ধরো হোটেল খরচা ফরচা মিলিয়ে.... মনে মনে কয়েক সেকেন্ড যোগ করল তাপস,— সব মিলিয়ে হাজার তিনেক মতো দেবে।

—মাত্র?

—তিন হাজার টাকা কি কম?

একটুক্ষণ চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সীমা। অনেক দিন আগের একটা স্বপ্নকে মনে পড়ছিল তার। ছোটবেলাকার। ফিসফাস করে বলল,— কন্যাকুমারিকা যাওয়া যায় না?

—ওরেব্বাস! সে তো বিস্তর দূর। মিনিমাম চার-পাঁচ হাজার কিলোমিটার হবে যাতায়াত।

— হোকনা, জায়গাটা কী সুন্দর ভাবো! একদিকে বঙ্গোপসাগর, একদিকে ভারত মহাসাগর, অর একদিকে আরব সাগর। তিন সমুদ্রের জল একই পাড়ে এসে মিলেছে। তারপর ধরো বিবেকানন্দ রক, যেখানে বসে স্বামীজি ধ্যান করেছিলেন..... এই তো তিনতলার শুভম্‌রা পুজোর সময়ে ঘুরে এল ..... বলছিল তিন সমুদ্রের নাকি তিন রকম বালি, স্পষ্ট তফাত বোঝা যায় ... তিন সমুদ্রের জলও নাকি আলাদা আলাদা ...

— সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পাচ্ছি তো সাকুল্যে হাজার তিনেক। তিনজন ওদিকে যেতে গেলে কত পড়বে কিছু আন্দাজ আছে? মিনিমাম ছ'সাত হাজার।

—পড়ুক না। তবু ওটা একটা অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

—কিন্তু এক্ষুনি অত টাকা পাব কোথায়?

—কারও কাছ থেকে লোন করে নাও। জুলাইয়ে এরিয়ার পাবে বলছ, তখন শোধ করে দিও।

—আর তোমার টিভি?

—সে পরে দেখা যাবে।

—তাপস নীরব হয়ে গেল। একটু যেন শক্ত হয়ে গেছে শরীর। হঠাৎ বলে উঠল, —পুরী গেলে হয় না?

—পুরী!

—হ্যাঁ, পুরী। টাকাতেও খাপে খাপে কুলিয়ে যাবে, ভালো একটা হোটেলেও থাকা যাব ....

তাপসের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সীমা,— বেড়াতে যাওয়ার নাম হলে খালি পুরীর কথাই মনে পড়ে? হানিমুনে পুরী, তিতলি হওয়ার পর পুরী....

— তো কী আছে? নয় আরও একবার গেলে। পুরীতেও সুন্দর সমুদ্র আছে, সোনালি বালি আছে ...

— থাকুক। আগের বারও তুমি আমায় ওই সব ভুজুং ভাজুং দিয়েছিলে। এতগুলো পড়ে পাওয়া টাকা আসছে হাতে তাও কন্যাকুমারীকা যাওয়া হবে না?

অন্ধকার নৈঃশব্দ্যে ভরে রইল খানিকক্ষণ। চোখ খুলে অন্ধকারকে দেখছিল সীমা। অজান্তেই চোখের কোণে জ্বালা জ্বালা ভাব। খোলা জানালা দিয়ে একটা উটকো হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরে, মশারি দুলিয়ে ঘরের যন্ত্রবাতাসে মিলিয়ে গেল।

তাপস কথা বলছে। নীচু স্বরে।

— শুধু টাকার প্রবলেমই নয়, আমার ছুটির ব্যাপারও একটা আছে। অফিসে স্টাফ কম, বেশি দিন লিভ্ নেওয়া যাবে না। বড় জোর দিন সাতেক। এদিক দিয়ে পুরীই কিন্তু সব থেকে আইডিয়াল।

— মোটেই না। সীমার স্বর ভিজে গেছে,—যাই যদি, তবে আমি অনেক দূরে যাব। ওই কন্যাকুমারিকাই যাব। নইলে যাবই না।

—এটা তো জেদের কথা।

—উঁহু, এটা আমার অন্তরের কথা। ইচ্ছে।

ইচ্ছেগুলোকে একটু কাটছাঁট করা শেখো সীমা।

তাপসের স্বরে ঝাঁঝ নেই, দোষারোপ করা নেই, শুধু এক তীব্র আকুতি। চেষ্টা করেও সীমা রেগে উঠতে পারল না। কোনও প্রতিবাদও ফুটল না গলায়। এক চাপা বিষণ্ণতায় ভরে যাচ্ছে বুক। কাটছাঁট করা জীবনে কী থাকে!

মশারি তুলে খাট থেকে নামল সীমা। পায়ে পায়ে লাগোয়া ব্যালকনিতে। বনসাই-এর টবে টবে বোঝাই ব্যালকনি, দাঁড়ানোর ঠাঁই নেই। তাপস এসব নিয়েই পড়ে আছে বেশ। বাড়ি থাকলেই কী পরিচর্যার ধূম! শিকড় ছাঁটছে, ডালপালা ছাঁটছে, মাটি পরীক্ষা করছে, রোদ জলের মাপ বুঝে টব সরাচ্ছে এদিক-ওদিক। বৃক্ষের অতিকায় হওয়ার সম্ভাবনাকে ছোট্ট একটা মাপে বেঁধে বামন করে রাখার প্রয়াস। এক হাত বেড়ে বটগাছ ঝুরি নামিয়েছে, দেড়ফুট নিম ডালপালা ছড়িয়েছে সাধ্যমতো, খর্বকায় নারকেলের মাথায় বেঁটে বেঁটে পাতা। দেখতে এত বিচ্ছিরি লাগে সীমার।

ভাবতে ভাবতেই সামনের একটা টবে হোঁচট খেয়েছে সীমা। উফ্ করে বসে পড়ল। কাতরাচ্ছে।

তাপস হুড়মুড়িয়ে ছুটে এল। ব্যালকনির আলো জ্বালিয়েছে, — কী হল?

সীমা ককিয়ে উঠল, —এই তোমার সৃষ্টিছাড়া টব .... মাগোঃ .... বাগান করার ক্ষমতা নেই, টবে টবে ....! তাও যদি একটাও গাছের মতো গাছ হত ....

—লাগল তোমার? কোথায়? তাপস থেবড়ে বসে পড়েছে।

সীমা পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল,—থাক, তুমি আর দেখে কী করবে?

—আহা দেখি না। সীমার হাত জোর করে সরিয়ে শিউরে উঠল তাপস,—ইস, নখটা যে নীল হয়ে গেছে। ... দাঁড়াও দাঁড়াও। নড়ো না। বরফ নিয়ে আসি।

সীমা ঝুঁকে দেখল আঙুলটাকে। নখে অল্প নীল নীল ভাব হয়েছে বটে, তবে তেমন কিছু নয়। আঙুলটাকে মুড়ল আস্তে আস্তে, সোজা করল, টিপল নখটাকে। নাহ্, খুব একটা ব্যথাও লাগছে না।

ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রেটাই নিয়ে চলে এসেছে তাপস। খট খট ঠুকে বরফ বার করল। ঘষছে সীমার পায়ে, —আলোটা জ্বালিয়ে বারান্দায় আসবে তো।

কী কাণ্ড ঘটালে বলো তো!

—কী করছ কী? ছাড়ো। বরফ দেওয়া মতো কিচ্ছু হয়নি।

—অমন করে না সীমা। কালশিটে পড়ে গেলে নখটাই উঠে যাবে।

— গেলে যাবে। তোমার যত সব বিদ্‌ঘুটে কাণ্ডকারখানার জন্য আমাকে তো ভুগতেই হবে।

অপরাধী অপরাধী মুখে হাসছে তাপস। চোখের পাতায় উদ্বেগ, না মমতা, না প্রেম?

উপুড় টবটাকে সোজা করছে তাপস। খর্বকায় গছটার দিকে চোখ পড়তেই সীমা হঠাৎ নিষ্পলক। দেড় ফুট কৃষ্ণচূড়ার ডালে ঝিরিঝিরি সবুজ পাতা। ক্ষুদি ক্ষুদি পাতার আড়ালে ফুটে আছে একটা ফুল। একটাই।

লাল। টুকটুকে লাল।

আপন সুখে বাড়তে না দেওয়া কাটাছাঁটা গাছেও এমন রক্তিম ফুল ফোটে?

ফোটে ফোটে। একটু তাকালেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

অথবা চোখ বুজলে।

সীমা চোখ বুজে ফেলল। তাপসের স্পর্শে হারিয়ে যাচ্ছে গভীরে, অনেক গভীরে।

মনে মনে সীমা বলল, —আমার সাদাকালো টিভিই ভালো। আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটই ভালো। আমার পুরীই ভালো। ইচ্ছের গাছ আকাঙ্ক্ষার বনসাই হয়েই থাকুক। ছোট্ট ফুল ফুটিয়ে। টুকটুকে লাল ফুল।

শিখার ঠিকানা

— তোমার নাম কী মামণি?

—মউউ। মউটুসি।

—উঁহু। ডাক নাম নয়। ভালো নাম বলো।

—কাঞ্চনকুন্তলা সেন।

—বাবার নাম?

—অনিন্দ্যকান্তি সেন।

—বাহ্। কোথায় থাকো তুমি? ঠিকানা কী?

—সাতের তিন বালিগঞ্জ স্টেশন রোড ...

তোতা পাখিটার মতো টকটক উত্তর দিয়ে চলেছে মউ। আধো আধো স্বরে। বুলি ফোটার পর থেকে এভাবেই ওকে প্রতিদিন নাম-ঠিকানা মুখস্থ করায় অনিন্দ্য। সব সময় ভয় মেয়ে যদি কোথাও হারিয়ে যায়। মেয়েও তেমনি। রোজ একবার ভালো নাম বলার আগে ডাক নামটা বলবেই। খেলা যেন। ডাক নাম? না আদরের নাম? শব্দটা ঠিক কী হওয়া উচিত?

প্রশ্নটা মনে এসেই পলকে মিলিয়ে গেল। শাড়ির কুঁচি সাজাতে সাজাতে ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় চোখ রাখল শিখা। আয়নার বুকে ওরা দুজন ভেসে রয়েছে। খাটের ঠিক মাঝখানে এলোমেলো খেলনা ছড়িয়ে মউ। মউ-এর পাশে, কোলবালিশে কনুই রেখে অনিন্দ্য আধশোয়া। তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও এদিকেই চোখ রয়েছে অনিন্দ্যর। কী দেখছে? কী ভাবে সাজল শিখা? নাকি অণুবীক্ষণে পড়ে নিতে চায় এই মুহূর্তে শিখার ভাবনাগুলোকে? নিজস্ব অধিকারবোধে সব পুরুষই বোধ হয় এক জায়গায় এক। তা সে অনিন্দ্যই হোক, বা দেবাশিস। মানুষভেদে সামান্য যা ডিগ্রির তারতম্য হয় মাত্র। শিখা চোখ ফিরিয়ে নিল। ভালোমতো জানে মনে হাজার সংশয় থাকলেও কখনও তা প্রকাশে সোচ্চার হবে না অনিন্দ্য। যার যা স্বাভাব। তবে বিরক্তিটাও লুকিয়ে রাখতে পারবে না তেমন করে। হালকাভাবে হলেও ফুটে উঠবে কথায়। আচরণে। গ্রীষ্মের দুপুরে আপনাআপনি ফুটে ওঠা ঘামের মতো। কাল সন্ধেবেলাই কেমন দুম করে গোমড়া হয়ে গেল।

—তুমি ফোন করলে? তুমিই?

—বললাম তো।

—কী বলল?

—প্রথমে হ্যাঁ না কিছুই বলছিল না। অনেক করে রিকোয়েস্ট করাতে ...

—কী বললে তুমি?

—ছেলেটার কাল জন্মদিন। অনেক দিন দেখিনি। একবার যদি দেখতে দেয় ... ভীষণ মন কেমন করছিল ...

—ওভাবে নীচু হতে খারাপ লাগল না তোমার?

—খারাপ লাগবে কেন? আমরাই তো ছেলে। তার জন্য ...

—ও বাড়িতে আবার যাবে তুমি? ওরা তোমায় ওভাবে অপমান করার পরও?

কথাটা যে শিখারও মনে হয়নি, তা নয়। তবে কিছু কিছু তৃষ্ণা মান অপমান ভুলিয়ে দেয়। আবেগের কাছে যুক্তি বড় অসহায়। অনিন্দ্যও যে এ-কথা একেবারে বোঝে না তাও নয়।

—ওকে বললে না কেন ছেলেকে অন্য কোথাও নিয়ে আসতে?

অনিন্দ্য পারতপক্ষে দেবাশিস বা মান্তুর নাম করে না। শিখা জানে। এটা কি ঈর্ষা! অথবা অন্য কিছু! যাই হোক, ব্যাপারটা মনে লাগে শিখার। তার অতীতটা জেনেই তো অনিন্দ্য ...

—তার মানে তুমিই ও বাড়িতে যেতে চেয়েছিলে?

—না। বাইরেই আনতে বলেছিলাম। যে কোনও জায়গায়। রাজি হল না।

এর পর অবশ্য আর কথা বাড়ায়নি অনিন্দ্য। আচমকা মউকে নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যেন। এখন যেমন।

ড্রেসিংটেবিলের সামনে থেকে উঠে শিখা শপিং ব্যাগটা নামাল আলমারির মাথা থেকে। কাল বিকেলেই অফিস থেকে ফেরার সময় সবকিছু কিনে এনেছে। দু সেট জামাপ্যান্ট। একটা ক্রিকেট ব্যাট। রবারের বল গোটা চারেক। স্পোর্টস গেঞ্জি স্টিকার লাগানো। এক বাক্স চকোলেট। জামাপ্যান্টগুলো মান্তুর গায়ে হবে কি না কে জানে! বাড়ের বয়স। অবশ্য সাত আট মাসে কত আর বড়সড় হয়েছে! সাত আট মাস! সময়টাকে কী ভীষণ দীর্ঘ যে লাগে। মনে হয় যেন কয়েক যুগ। কিংবা তারও বেশি। অফিস থেকে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা ফোন করে বটে। লুকিয়ে লুকিয়ে। দুচার মিনিটের বেশি কথা হয় না। তাও যদি মান্তুই ফোন ধরে। অফিস থেকে বেরিয়েও স্কুলের সামনে গিয়েছে কয়েকবার। স্কুল ছুটির সময়। মুখটাকে ভালো করে দেখা হয়ে ওঠে না তখন। তার আগেই ঠাকুমার সঙ্গে রিকশায় উঠে পড়ে মান্তু। শিখার আর এগোতে সাহস হয় না। কে জানে হয়তো পাঁচজনের সামনেই কী বলতে কী বলে দেবেন ভদ্রমহিলা। নিঃশব্দে সরিয়ে আনতে হয় নিজেকে।

এসব কথা অনিন্দ্যও জানে।

জেনেবুঝেও কেন ওরকম একটা ব্যবহার করল সকালবেলা! ঘুম থেকে উঠে

আচমকা সে কী হাঁকডাক!

—শিখা। এদিকে এসো তো একবার এখখুনি।

শিখা তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত মেয়ের দুধ জ্বাল দিতে। কমলার মা বা ঠিকে-ঝি কেউ তখনও আসেনি।

—কী হল? এই শিখা ...

গ্যাস নিবিয়ে প্রায় দৌড়ে এল শিখা,—কী হল?

—মউ-এর গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো তো। বেশ ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে না?

মেয়ে তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। টাটকা ফুল হাত পা মেলে ছড়িয়ে আছে বিছানায়। জানালা দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে দিব্যজ্যোতির মতো ছুঁয়ে আছে নরম পাপড়িগুলোকে। শিখা ভয়ে ভয়ে হাত রাখল ফুলের শরীরে।

—কই না তো!

—ভালো করে দ্যাখো।

শিখা গালে গাল ছোঁয়াল। গলা ছুঁল। বুক ছুঁল।

—যাহ্। একেবারে ঠাণ্ডা গা হাত পা।

—অসম্ভব। থার্মোমিটার নিয়ে এসো।

—দূর। কিছু হয়নি।

—কিছু হয়নি? নাকি কিছু হলেও আজ গায়ে মাখতে চাও না?

—মানে?

—মানে আবার কী। বিছানা থেকে নেমে ফস করে সিগারেট ধরাল অনিন্দ্য, —আমাদের থেকে তোমার এখনও ওদের দিকেই টান বেশি।

—আমাদের মানে?

—আমাদের মানে আমরা। আমি। আমার মেয়ে।

—আমি নেই তোমাদের মধ্যে?

—আছ কি?

চোখের বাষ্পে মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে গেল মউ-এর মুখ। অনিন্দ্যও। তবে কি অনিন্দ্য কোনও দিনই মনে মনে মেনে নিতে পারেনি? শুধুই ভান করেছে এতদিন? তিন চার বছর ধরে? ভান? নাকি অভিনয়? ভদ্রতার? সৌজন্যের? মহানুভবতার?

মাস্তুর জন্য কেনা জিনিসগুলো আরেকবার ব্যাগে গুছিয়ে নিল শিখা। বুকের কাছে জমাট কষ্টগুলো গলায় উঠে আসতে চাইছে। কোনওরকমে নিজেকে সামলে ঘুরে তাকাল অনিন্দ্যর দিকে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব? সত্যি বলবে?

—কী? সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে পিঠ সোজা করেছে অনিন্দ্য।

—তুমি কি সত্যিই চাও আমি যাই?

—এখন আবার একথা উঠছে কেন? নিশ্চয়ই যাবে। আমি কি কোনোদিন কোনো কাজে তোমাকে বাধা দিয়েছি? অনিন্দ্য উঠে বসেছে বিছানায়। পরিষ্কার বোঝা যায় জোর করে হাসি ফোটাতে চাইছে মুখে,—তখন কী বলে ফেলেছি, তাই নিয়ে এখনও ভেবে চলেছ? তুমি কি কোনো কথাই সহজে ভুলতে পারো না?

তুমি পারো? কেউই কি পারে? বলতে গিয়েও শব্দগুলো গিলে নিল শিখা। অনিন্দ্যর মতো করেই হাসি মাখাতে চেষ্টা করল ঠোঁটে।

—তখনকার কথা বলছি না।

—তা হলে?

—তোমরা যদি না চাও, আমি সত্যিই যাব না।

—তোমরা মানে? অনিন্দ্য এবার সত্যি সত্যি হাসছে।

শিখা আর হাসার চেষ্টা করল না একটুও। বিছানার ধারে গিয়ে কাছে টানল মেয়েকে। আদর করল। চুমু খেল। তারপর অনিন্দ্যর চোখে চোখ রাখল খুব শান্তভাবে।

—তোমরা মানে তোমারা। তুমি। তোমার মেয়ে।

মনে মনে বলল, আমার ঠিকানা।

দুই

বাড়িটার কাছাকাছি এসেও কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইল শিখা। পা দুটো বড় বেশি কাঁপতে শুরু করেছে। বুকের মধ্যে বিশ্রি একটা ডুবডুব শব্দ। গলা শুকিয়ে কাঠ। আশ্চর্য! এত উৎসাহ, এত আগ্রহ, এত মন-কেমন করা সব যেন নিমেষে হারিয়ে গেছে। ফিরে যাবে? নাহ্। এতদূর এসে এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল ভালোভাবে। শপিং ব্যাগটা এ হাত থেকে ও হাতে নিল। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ তেজি পুরুষের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিক। এদিকের ফুটপাথেই শুধু যা একফালি দুর্বল ছায়া। শিখা সেই ছায়াটুকু ধরেই আবার এগোল কয়েক পা। চৈত্র শেষের দুপুর ছুটির দিনের আলস্য মেখে শুয়ে আছে। রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন। আশপাশের বাড়িগুলো দুপুরের স্তব্ধতায় নিঝুম। শিখা মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করল। এই সময়ে এসে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। এখন অন্তত প্রতিবেশীদের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ভাবতে ভাবতেই ভাবনা হোঁচট খেল। পিকলুদের জানালায় পিকলুর মা না? শিখা তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ আড়াল করল। ত্রস্ত পায়ে পার হল হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটা। পেরিয়েই চকিতে বিরক্ত নিজের ওপরই। ভদ্রমহিলার সঙ্গে

দেখা হলেই বা কী হত? না হয় দুটো কৌতূহলী প্রশ্ন ছুঁড়ত মহিলা। ছুঁড়ত। তাতেই বা কী এসে যায়? ওভাবে চোরের মতো নিজেকে লুকোনোর কোনো অর্থ হয় না। সংকোচই বা কিসের? অন্যায় করেছে কি কোনো? একজনের সঙ্গে মেলেনি, ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পরেনি, বেড়ালের মতো আঁচড়েছে, কামড়েছে, সম্পর্ক ছিঁড়ে গেছে। আরেকজনকে ভালো লেগেছে। নিজের মতো করে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এতে অন্যায়টা কোথায়? তা ছাড়া দেবাশিসের তো কোনোদিন নিরাপত্তা বোধে হাত পড়েনি। শিখার পড়েছে। তখন এই লোকগুলো ছিল কোথায়? ভাবতে ভাবতে অনেকটা যেন জোর ফিরে এসেছে মনে। তবুও যে কেন পা কাঁপে। সারা গায়ে ঝাঁঝালো রোদ মাখা বাড়িটার দরজায় পৌঁছে হারিয়ে যায় মনের সব শক্তি! এক সময়ের অতি পরিচিত সদর দরজাটাকে কী ভীষণ অচেনা লাগছে। বন্ধ দরজা যেন দরজা নয়, দেবাশিস, দেবাশিসের মা, বাবা, দাদা, বউদি সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ দরজা হয়ে। ওপারে মান্তু। ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে। এক ভাবে বুড়ো আঙুলের নখ কেটে চলেছে দাঁতে। মান্তুর মুখ চোখের সামনে ফুটে উঠতেই পলকে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব চুরমার হয়ে গেল। বেশ জোরে কলিং বেল টিপে ফেলল শিখা।

—এসো।

দরজা খুলেছে দেবাশিসই।

শিখা হাসার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ আগে অনিন্দ্যর সামনে যে হাসি এনেছিল ঠোঁটে, সেই হাসি, —একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

দেবাশিস শুনেও শুনল না। হাত বাড়িয়ে সোফা দেখাল, বোসো। মান্তুকে তুলতে হবে।

বলেই চলে যাচ্ছে ভেতরের দিকে। পিছন থেকে বেশ শীর্ণ দেখাচ্ছে চেহারাটা। ক'বছরেই শরীর ভেঙে গেছে অনেক। শিখার বুকটা একটু চিনচিন করে উঠল। দেবাশিস একটু যদি ... একটু যদি বুঝত শিখাকে! নিজের বাইরে চোখ খুলে দেখতেই পারল না কোনোদিন। ওর ওপর এখন রাগ হয় না। এতদিন পর রাগ আর থাকেও না। রাগটাই আস্তে আস্তে কখন করুণা হয়ে যায়। অথবা মায়া।

শিখা একেবারে সামনের ছোট সোফায় বসে পড়ল আলতোভাবে। ঘরটা একদম একরকম আছে। দরজার মাথায় সেই লম্বা পেণ্ডুলাম ঝোলানো পুরোনো আমলের দেওয়াল ঘড়ি। বই-এর আলমারির মাথায় সেই মিনে করা ফুলদানিটা। ক্যাবিনেটের প্রতিটি খোপে একই জিনিস। সেই সব রুপোলি সোনালি কাপ, মেডেল। দেওয়ালে সেই রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি। কেবল সোফা কভার আর দেওয়ালের রংগুলোই অনেক বিবর্ণ হয়ে গেছে। শিখার পছন্দেই হয়েছিল বলে বোধহয়। শিখা কি সত্যি চলে গেছে এ ঘর থেকে! এই ঘর! এই দেওয়াল! ওই দরজা! সব যেন কেমন ভুল

হয়ে যাচ্ছে। শিখা আলগাভাবে সোফার গায়ে হাত বোলাল কয়েকবার। বোলাতে বোলাতেই চকিতে টান-টান। প্যাসেজে কারও পায়ের শব্দ। কে আসছে? শ্বশুর? শাশুড়ি? ভাসুর? বড় জা? অন্যমনস্কভাবে মাথায় আঁচল তুলে ফেলল। ব্যগ্র চোখ ওদিকের পরদার ওপরে স্থির। কিন্তু না। এ ঘরে এল না কেউ। ভারী পায়ের আওয়াজ পাশের খাবার ঘরে ঢুকল বোধহয়। ও ঘরেও কি এখনও সেই ডাইনিং টেবিলটাই আছে! নীল সানমাইকা লাগানো! টেবিল ঘিরে ছটা চেয়ার!

সোফার পিঠে হেলান দিল শিখা। বড় করে নিশ্বাস ফেলল। অদ্ভুত! এখনও ওদের শ্বশুর শাশুড়ি ভাসুর জা বলে ভাবছে কেন? আইন অনুযায়ী ওদের সঙ্গেও তো সব সম্পর্ক চুকে গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এক জায়গায় কখনওই থেমে থাকে না। অনিন্দ্যর বউ দেবাশিসের বাবাকে শ্বশুর ভেবে মাথায় ঘোমটা টানবেই বা কেন? এক ঝটকায় মাথা থেকে আঁচল সরিয়ে দিল শিখা। ঠিক তখনই পরদার পাশে এ বাড়ির ছেলে মান্তু। দেবাশিসের ছেলে মান্তু। শিখার ছেলে মান্তু।

—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়।

শিখা উঠে পড়েছে সোফা ছেড়ে। চাপা উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। মান্তু সামনে নিষ্পলক। শান্ত।

—কী হল? কাছে আয়। আসবি না?

এইবার পায়ে পায়ে কাছে আসছে ছেলে। হাসছে ম্লান ভাবে। হাসিটা ঠিক হাসি নয়, কেমন কান্নার মতো। ছেলে কাছে আসার আগে শিখাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে আদর করছে ছেলেকে।

—এটা হল অনেকদিন পর দেখা হওয়ার হামি। এটা জন্মদিনের হামি। আর এটা ...

ছেলে তবুও নিরুত্তাপ।

শিখা ঝাঁকুনি খেল সামান্য। ওকে কি বাড়ির কেউ কিছু শিখিয়ে রেখেছে! ফোনে যখন কথা বলে তখনও তো হেসে হেসে ...।

—কীরে, কিছু বলছিস না যে? কথা বলবি না? শিখার গলা ধরে এল। চোখদুটো জ্বালা করছে। আবেগ কখনও কখনও এত অসংযমীও হয়ে পড়ে। চোখের জল আটকাতে ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরল সজোরে।

এভাবেই একটু একটু করে শিখার গলা যখন ডুবে যাচ্ছে, স্বর ফুটল মান্তুর। আট বছরের বালক আঠাশ বছরের গলায় প্রশ্ন করল।

—তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ কেন?

—কী? কী মিথ্যে কথা?

—আমার জন্য তোমার কষ্ট হয় ... তুমি কত কাঁদ ...

—কাঁদিই তো।

—মিথ্যে কথা। তুমি আবার বিয়ে করেছ। তোমার তো ছোট্ট মেয়ে আছে একটা।

—কে বলল তোকে এসব কথা?

—কেউ বলেনি। আমি শুনেছি। মান্তু কোমরে হাত রাখল। বিজ্ঞ মানুষের মতো,—ঠাম্মার সঙ্গে কাল বাবার কথা হচ্ছিল, তখন শুনেছি। ঠাম্মা বলছিল, কেন তুই আবার ওকে আসতে বললি এ বাড়িতে? তুই না একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলি ওকে? বলেছিলি, খবরদার আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে না? ... এ বাড়িতে যেন কোনোদিন ও না আসে ...?

বলেছিল দেবাশিস। আরও অনেক কথাই বলেছিল। কিন্তু সে সব কথা কি এখন বলা যায় মান্তুকে? কোনোদিনই কি যাবে?

শিখা ছেলেকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে।

—তুই ঠিকই শুনেছিস রে। সব সত্যি।

—তা হলে এসেছ কেন?

না। এ প্রশ্নের উত্তরও এক কথায় দেওয়া যায় না। দিলেও কি বুঝতে পারবে অতটুকু ছেলে? ভালোবাসা শব্দটা ভীষণ জটিল। তবু জবাব একটা তো দিতে হবেই। শিখা চোখ চেপে বন্ধ করে মাথা নাড়ল, জানি না রে।

সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে মান্তু। প্যাসেজ দিয়ে ছুটে যাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে এবার বোধহয় উঠে গেল দৌড়ে।

শিখা ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাল। সোফার একপাশে, শপিং ব্যাগে উপহারগুলো পড়েই রইল। যত্ন করে ব্যাগটা তুলে শুইয়ে রাখল সোফার ওপরে। সদর দরজাটা খোলাই রয়েছে। কেউ কি আসবে বন্ধ করে দিতে? শিখা কি অপেক্ষা করবে? এর পরও?

অপেক্ষার দরকার হল না। দেবাশিসই ফিরে এসেছে ঘরে।

—মান্তু ওভাবে চলে গেল কেন?

শিখা মুখ ফিরিয়ে নিল।

—ভীষণ বেয়াড়া হয়ে গেছে ছেলেটা। আজকাল কারও কথা শোনে না।

শিখা চুপ।

—যাকে যা মুখে আসে তাই বলে দেয়। দেবাশিসের গলা নরম আচমকা, —তোমাকে কি কিছু বলেছে?

শিখা দুদিকে মাথা নাড়ল।

দেবাশিস অল্পক্ষণ চুপ করে ভাবল কিছু। শিখার দিকে দু পা এগিয়েও দাঁড়িয়ে গেল বড় সোফাটার গায়ে।

—এটা নিয়ে যাও।

শিখা ফিরে তাকাল। দেবাশিস বোঝার আগে জলীয় বাষ্পটুকু উবিয়ে দিয়েছে চোখ থেকে।

—কী ওটা?

—তোমার একটা ইন্সিওরেন্সের চিঠি। বছর দশেক আগে করিয়েছিলে। লাস্ট ক' বছর আর প্রিমিয়াম দাওনি। দেবাশিস বাদামি রঙের লম্বাটে খামটা বাড়িয়ে দিল শিখার দিকে,—ম্যাচিওর করে গেছে বোধহয়।

শিখা হাত বাড়াল। চিঠিটা নেবার সময়, অনেকদিন পর, চোখ পড়ল দেবাশিসের চোখে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

—একটা কথা বলব?

—বলো।

—এবাড়িতে তোমার চিঠিপত্র আর যেন না আসে তার ব্যবস্থা কোরো। নতুন ঠিকানা তো আছেই।

—হুঁ।

হুঁ। একটা মাত্র ধ্বনি। তাই বার করতে এত যে বুকের বাতাস দরকার হয় কে জানত। শিখা সদর দরজার দিকে এগোল।

—যাচ্ছি।

—তোমার কিছু বোধহয় ফেলে যাচ্ছ। দেবাশিস এগিয়ে গেল ছোট সোফার কাছে।

—না। শিখা টানটান, —ওগুলো মান্তুর জন্য ...এনেছিলাম। জন্মদিনের উপহার।

—এখানে পড়ে রয়েছে যে! তোমার গুণধর ছেলে বুঝি নেয়নি!

শিখা এবার কথা বলল প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে, —আমার ছেলে নয়। তোমার ছেলে। তোমাদের ছেলে।

তিন

দরজা খুলে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন নীলিমা, —তুই! হঠাৎ?

শিখা তাড়াতাড়ি ঢুকে এল ভেতরে।

—একা এসেছিস যে! মউ কোথায়! অনিন্দ্য আসেনি!

প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঝাপটা। শিখা চটি জোড়া খুলে ফেলল পা থেকে। ঘাড় তুলে শ্বাস নিল জোরে জোরে। যেন কতক্ষণ পর বাতাস ভরতে পাচ্ছে বুকে।

—কী হল! জবাব দিচ্ছিস না যে! ওরা কোথায়!

—আসেনি।

শিখা সটান চলে এল মা-র শোবার ঘরে। মা-র শোবার ঘর? না নিজের

ছোটবেলার ঘর? ওই খাটটাতেই তো ...। সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ল বেডকভার ঢাকা বিছানায়।

নীলিমাও এসেছেন মেয়ের পেছন পেছন।

শিখা চিত হয়ে শুয়ে চোখ ঘোরাল,—দাদা বউদি নেই?

—না। ওরা সিনেমায় গেছে।

নীলিমা এগিয়ে এলেন পায়ে পায়ে। দু' চোখে একরাশ জিজ্ঞাসা। আশংকা। ঘরপোড়া গোরুর মতো।

—তোকে এরকম লাগছে কেন রে? কী হয়েছে তোর?

—কী হবে? কিচ্ছু না। শিখা দু' হাত দিয়ে চেপে চেপে হাত বোলাল মাথায়। মুঠো করে চুল টানল, —বড্ড টায়ার্ড লাগছে মা। এখানে ঘণ্টাখানেক শুতে এসেছি।

নীলিমার চোখ স্থির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন মেয়েকে। কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপছে, —ঠিক করে বল বুড়ি কী হয়েছে। অনিন্দ্যর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?

—নারে, বাবা না। অনিন্দ্যর সঙ্গে কিছু হয়নি। ঝগড়াঝাঁটি কিছু না।

—তা হলে! নীলিমার চোখ মুখে তবু অবিশ্বাস,—ছুটির দিন ... বিকেলবেলা ... একা একা ... যাদবপুর থেকে বেলেঘাটায় তুই শুতে এসেছিস!

শিখা হেসে উঠল শব্দ করে। অনেকক্ষণ পর। বিছানায় আলগা গড়িয়ে নিল একবার, —তুমি এমন উকিলের মতো জেরা শুরু করলে কেন বলো তো মা? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমার কাছে আসতে গেলেও আমাকে দিনক্ষণ ঠিক করে আসতে হবে? ছুটির দিন ... উইক ডে ... অনিন্দ্যর সঙ্গে ... মউকে নিয়ে ...?

নীলিমা তা'ও ভুলবার পাত্রী নন। সোজা হয়ে বসে পড়েছেন খাটে। মেয়ের পাশে। সজোরে চেপে ধরেছেন মেয়ের কাঁধ।

—তুই মিথ্যে কথা বলছিস। আমার কাছে লুকোচ্ছিস কিছু।

শিখা নিষ্পন্দ হল এতক্ষণে। এক হাতে চোখ ঢেকে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। অথবা অনন্ত কাল।

নীলিমা ঝুঁকে হাত রাখলেন তার মাথায়,—আমাকে খুলে বল। অনিন্দ্যর সঙ্গে কিছু হয়নি বলছিস, এদিকে ... বলতে বলতেই চমকে উঠেছেন। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মেয়ের অতীতটা ঝলসে উঠেছে মাথায়। তবে কী ...।

শিখাও, ঠিক তখনই বালিশ ছেড়ে মুখ গুঁজে দিয়েছে মায়ের কোলে। হু-হু করে কেঁদে ফেলেছে। নিঃশব্দ কান্নার দমকে দুলে উঠছে গোটা শরীর।

নীলিমা নিশ্বাস চেপে প্রশ্ন করলেন, —কী হয়েছে মান্তুর?

কাঁদতে কাঁদতে বুকটা ক্রমে হালকা হয়ে গেল। অনেক নির্ভার লাগছে এখন। তবে কী এখানে সে কাঁদতেই এসেছিল। এত কান্না জমেছে বুকে। আরও শান্ত

হওয়ার পর মাথা তুলল। আঁচল দিয়ে চোখ নাক মুছে নিল ভালো করে। কাঁপা কাঁপা নিশ্বাস ফেলল কয়েকটা। কথা বলতে গিয়ে তবু হেঁচকি এল গলায়, মাস্তুর আজ জন্মদিন ছিল। ওকে দেখতে গিয়েছিলাম।

নীলিমার ভুরু জড়ো হল, —ওরা বুঝি দেখা করতে দিল না?

—না। শিখার গলা স্বাভাবিক আস্তে আস্তে, —মাস্তুই চলে গেল আমার সামনে থেকে। আমাকে মিথ্যাবাদী বলল। আমি আবার বিয়ে করেছি বলে। আমার মেয়ে হয়েছে বলে।

—তাই তুই কাঁদছিস এত। নীলিমা মেয়ের মাথায় হাত বোলালেন, —ওসব নিয়ে মন খারাপ করিস না। বড় হলে ছেলে আপনি বুঝে যাবে বাপ কেমন ছিল। ঠিক জানতে পারবে কী ব্যবহারটা করেছিল বাপ। কেন মা থাকতে পারেনি কিছুতেই। বলতে বলতেই কী ভেবে আবার শঙ্কা এসেছে গলায়, তা হ্যাঁরে, তুই যে ওখানে গিয়েছিলি অনিন্দ্যকে বলে গিয়েছিলি তো?

শিখা নীরব প্রথমে।

—কিরে, ওর মত নিয়ে যাসনি?

—কেন?

—কেন মানে? ওকে বলে যাসনি?

শিখা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, —আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওর মতের কী দরকার মা?

—কী বলছিস কী তুই? নীলিমা শিউরে উঠেছেন যেন, —মেয়েদের অত ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকতে নেই। থাকলেও সেটা স্বামীকে বাদ দিয়ে নয়। এর জন্যই তো একবার তোকে ...

উপদেশগুলো ফুটন্ত শিসের গোলা যেন। টপ টপ ঢুকে যাচ্ছে মস্তিষ্কের ভেতর। ছড়িয়ে পড়ছে শিরা-উপশিরায়। বহুদিন পরে সেই পুরোনো অনুভূতিটা ফিরে আসছে আবার। দেবাশিসের বাড়ি থেকে চলে আসার পর যে এক বছর এ বাড়িতে ছিল, সে সময়ে প্রত্যেকটা দিন এই অনভূতি আচ্ছন্ন করে রাখত মনটাকে। শরীরটাকে। বউদি বলত, মেয়েদের অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হয় বুড়ি। মেনে নিতে হয়।

দাদা বলত, তোরও বড় জেদ বুড়ি। একটু-আধটু সকলেরই ওরকম ঝগড়াঝাঁটি হয়, তা বলে নিজের ঘর ছেড়ে এখানে চলে আসাটা বোকামি।

না। শিখা মুখ ফুটে দাদাকে কোনোদিন বলতে পারেনি, ঘর তো আমার এটাও রে। তোর যেমন। এটা আমারও বড় হওয়ার ঘর। সব থেকে আপন আশ্রয়।

বলা যায় না। একবার ছেড়ে চলে গেলে বাপের বাড়ির চৌকাঠ চিরকালের মতো উঁচু হয়ে যায় মেয়েদের কাছে। দখল নিতে গেলে তখন ঠোক্কর খেতে হবেই।

মা'ও কী সেই কথাই বোঝাতে চাইছে? দাদা বউদি যা বুঝিয়ে দিয়েছিল পলে

পলে? যার জন্য অত তড়িঘড়ি করে অনিন্দ্যকে ...

শিখা খাট ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুছিয়ে নিল নিজেকে। মুখ আগুন গরম হয়ে গেছে। জল দেওয়া দরকার। বাথরুমে গিয়ে জলের ঝাপটা দিল বেশি করে। বেরিয়ে এসে চটি পরল।

—যাচ্ছি মা।

—সে কী? চা খেয়ে যা।

—থাক। শিখা হাসল সামান্য, অনিন্দ্যকে সত্যিই জানিয়ে আসা হয়নি।

এরপর মা আর একটুও থাকতে বলবে না। এ কথা তো জানাই। শিখা চৌকাঠ পার হয়ে, তবু ঘুরল মায়ের দিকে। চিৎকার করে বলল, আমি এ বাড়িতে এসে প্রাণ খুলে একবার কাঁদতে চেয়েছিলাম মা। নিজের জন্য। একেবারে নিজের জন্য। নিজের জন্য কাঁদার জায়গা আর কোথাও নেই যে।

একটা শব্দও ফুটল না গলায়।

বাস থেকে নামতেই গায়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আচমকাই ঘূর্ণি ধুলোর ঝাপটা। চৈত্র শেষের ঝড়টা এক্ষুনি বুনো মোষের মতো এসে পড়বে মনে হয়। ঝড়ের আভাস ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। মুখে আঁচল চেপে শিখা দ্রুত রাস্তা পার হল। ওপারে পৌঁছনোর আগেই ঝুপ করে নিবেছে দেউটি। লোডশেডিং। নিমেষে গাঢ় অন্ধকার চতুর্দিকে। প্রথম কয়েক মিনিট। এ অন্ধকারও এক সময় চোখে সয়ে যায়।

একটু দাঁড়িয়ে নিয়ে, ধুলো বাঁচিয়ে, হাঁটা শুরু করল শিখা। আবছায়া মাড়িয়ে সশব্দে পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অটো। সাইকেল রিকশা। গায়ের পাশে, সামনে, পেছনে ছায়া ছায়া মানুষ। হঠাৎ হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় ঝলসে উঠছে পথঘাট। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে ফালা ফালা আকাশ। শিখা আরও জোরে পা চালাল। ঝড় ওঠার আগে পৌঁছতে হবে বাড়িতে। আর বেশি দূরও নয় বাড়ি। বাঁদিকে ঘুরে ডানদিকের গলিটাতে চলে গেল। এর পর আর মাত্র একটুখানি পথ। আর কিছুটা গেলেই.......

শেষ রক্ষা হল না। শেষ বাঁকে পৌঁছনোর আগেই ঝমর ঝমর দৌড়ে এসেছে ঝড়। অন্ধকারের ঝুঁটি চেপে হা হা হেসে উঠল। সেই সঙ্গে খিলখিল বিদ্যুতের হাসি। এলোপাথাড়ি ধূলিকণা চিটপিট চিমটি কাটতে শুরু করেছে গায়ে। চোখে মুখে নাকে ঢুকে পড়েছে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চাইছে মাটিতে।

শিখা একধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন আর হাঁটার কোনো মানে হয় না। হাঁটা উচিতও নয়। পাশের কোনো দোকানের চাল উড়ে গেল ঝনঝন শব্দ তুলে। লোকজন অবশ্য এর মধ্য দিয়েও দৌড়ে যেতে চাইছে। দুটো ছেলে পেছন দিক ফিরে চলতে

শুরু করল। দেখাদেখি আরও কয়েকজন হাঁটতে শুরু করেছে ওভাবে। শিখার বুক ধুকধুক করে উঠল। ওভাবে কি পেছন ফিরে হেঁটে বাড়ি পৌছনো যায়! চোখ বন্ধ থাকলে ঠিকানাই বা চিনবে কী করে! ভয়ে, আতঙ্কে সব কিছু কেমন গুলিয়ে যেতে শুরু করেছে। এ দুর্যোগ বোধ হয় আর কোনোদিনই কাটবে না। আবছা ঘোরের মতো লাগছে সব কিছু। ঝড় উন্মত্ত হচ্ছে আরও। অন্ধকারও গাঢ় থেকে গাঢ়তর।

শিখা দু হাতে মুখ ঢাকল।

—তোমার নাম কী মামণি?

—বুড়ি। বুউউড়ি।

—উহুঁ। আদরের নাম নয়। পোশাকি নাম বলো।

—শিখা। শিখা ভাদুড়ি। না বাগচি। না, না সেন।

—ঠিকানা কী তোমার?

শিখা অন্ধকারের হাতে হাত রাখল। ঝড়ের ঝাপটা মেখে নিল গায়ে। সত্যিকারের ঠিকানা কি থাকে কারুর। কোথাও! কোনখানে! কে জানে! হয়তো বা এভাবেই পিছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে পৌছনো যায়, সেটাই একমাত্র প্রকৃত ঠিকানা। যে ঠিকানা হারায় না কখনও! যে ঠিকানাই সত্য শুধু। জন্ম মুহূর্ত!

তবু শিখা কেন যে উদভ্রান্তের মতো হাঁটা শুরু করল আবার।

উনসত্তর আর তেষট্টি

হানিমুনে চলেছেন তপোধীর আর করুণা। ট্রেন ছাড়তে এখনও মিনিট দশেক বাকি, শেষ বারের মতো মালগুলো গুনে নিচ্ছেন তপোধীর। সুটকেস এক, প্লাস্টিকের থলি দুই, বালতিব্যাগ এক, ঢাউস কিটব্যাগ এক, কাঁধঝোলা ব্যাগ এক, টিফিন কেরিয়ার এক, ওয়াটারবটল এক। ওহো, ছোট বেডিংটাও তো আছে, ট্রেনের জন্য। মোট তবে হল গিয়ে নয়। সঙ্গের গন্ধমাদনটিকে ধরলে অবশ্য হয় দশ। হাঁটতে চলতে দিশা পায় না, ধপাধপ যেখানে সেখানে বসে পড়ে, কোথাও একবার দাঁড়িয়ে পড়লে নড়ায় কার সাধ্যি, এমন মেয়েমানুষ গন্ধমাদন ছাড়া আর কী! জানালার ধারে কেমন ঘটটি হয়ে বসে পড়েছে দ্যাখো! সাংসারিক নির্দেশ দেওয়া চলছে পুত্রবধূকে।

তপোধীর অধৈর্যভাবে বললেন,—পা'টা একটু তোলো তো। সুটকেসটা ভেতরে ঠেলি। একগাল জরদা পান মুখে অবহেলা ভরে তাকালেন করুণা, —তাড়া কোরো না তো। সব হবে। রন্টু সব ঠিক করে দেবে।

—আমার তাড়া আছে। পা সরাও।

—আহ্, চুপ করে একটু বোসো তো। কাজের কথা সেরে নিতে দাও।

কাজের কথা, না গুষ্টির পিণ্ডি। তপোধীর উবু হয়ে বসে পড়লেন। ঠেলে ঠেলে বালতি ব্যাগ ঢোকাচ্ছেন বার্থের নীচে। সাত দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া, তার জন্য মালও কিছু নিয়েছেন বটে করুণা। নিয়েই দায় শেষ। এখন ম্যাও সামলাবে এই বুড়ো চাকর। তপোধীর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এবার টানলেন সুটকেসটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে রন্টু,—ওটা ওখানে থাক বাবা। মা পা রাখবে।

—তারপর রাতে কেউ নিয়ে নেমে গেল কী হবে? তোমার মার ঘুম ভাঙবে?

—ব্যস্ত হতে হবে না। চেন দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি। চাবিটা শুধু কাছে ঠিক করে রাখো, তা হলেই হবে।

তপোধীর সোজা হলেন অগত্যা। গিন্নির কাছে হেরে যাওয়া মুখে বসেছেন এক কোণে। মরুক গে যাক, যে যা খুশি করুক। এখন তিনি এদের হাতের পুতুল। যেমন ইচ্ছে নাচাচ্ছে। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট করে দুখানা টিকিট এনে হাতে ধরিয়ে দিল। তোমাদের দুজনের তো এক সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয় না বাবা, যাও একবার জোড়ে সমুদ্র ঘুরে এসো। আর এই রইল হোটেলের রিজারভেশন, সাত

দিনে একটু চাঙ্গা হয়ে এসো তো দেখি। প্ল্যানটা অবশ্য রন্টুর একার নয়, এর পিছনে মেয়ে-জামাইয়েরও ষড়যন্ত্র আছে। ভালোমানুষ মুখ রন্টুর বউটিও কম যায় না। আর ওই যে রিন্টির মেয়ে বাবলি, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চুকুর চুকুর করে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাচ্ছে, সে বেটিরও সেদিন কী উল্লাস! ইইহ, কী থ্রিলিং! দাদু দিদা হানিমুনে যাচ্ছে! ভূভারতে কেউ শুনেছে বাবা-মার বিবাহবার্ষিকীর দিন এই সব মতলব ভাঁজে ছেলেমেয়েরা! ট্রেনের টিকিট, হোটেলের বুকিং উপহার দিয়ে বার মার বিয়ের চল্লিশ বছর পালন করে! ফাজলামি!

কামরার জানলায় অরুণাংশু। জামাই। ছেলেরই সমবয়সি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ক্লাসমেট ছিল, তখনই রিন্টিকে গেঁথেছে। হাইপাওয়ারের চশমার আড়ালে ছোকরার চোখ হাসছে ফিক ফিক,—বাবা, চা খাবেন?

তপোধীরের তেমন কোনও নেশা নেই, তবু চায়ের নাম শুনলেই জিভ যেন একটু শুলিয়ে ওঠে। বললেন,—লিকার চা হবে?

রন্টুর বউ ফুট কাটল,—এখানে লিকার চা কোথায় পাবেন বাবা?

—থাক তা হল। দুধ চা আমার.....। তোমার শাশুড়িকে দাও বরং।

—আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিয়েছি। নেশার জিনিস বলে কথা। সন্তর্পণে পিক ফেললেন করুণা,—ট্রেন ছাড়লে একটু কফি খাব।

ধন্যি মেয়েমানুষ! কত যে নেশা! চা কফি পান জরদা মৌরি সুপুরি জোয়ান...। দাঁত মাজার সময়ে আবার গুড়াখু চাই। সুযোগ পেলে বোধহয় বিড়ি সিগারেট নস্যিটাও ধরে ফেলতেন।

সিগন্যাল হয়ে গেছে। বউয়ের ইশারায় রন্টু নেমে গেল কামরা থেকে। সামনের স্টল থেকে ম্যাগাজিন হাতে দৌড়ে এল রিন্টি। তপোধীরের হাতে পৌঁছনোর আগে করুণা খপ্ করে নিয়ে নিলেন পত্রিকাটি। এক গাল হাসিতে মুখ ভরে গেল,—ওমা, এ যে দেখি শচীনের ছবি।

তপোধীর সরু চোখে তাকালেন,—তুমি আবার শচীনকে কবে থেকে চিনলে?

—আমি সব্বাইকে চিনি। শচীন আজার মোঙ্গিয়া শ্রীনাথ......তারপর আমাদের ওই ছেলেটা.....সৌরভ গো। আহা, কি মিষ্টি মুখখানা।

—এই করেই তো দেশের ক্রিকেটটা ডুবল। যত মূর্খের দল এখন খেলার সমঝদার হয়েছে। তপোধীর ভেংচে উঠলেন,—আহা, কী মিষ্টি মুখখানা! হ্যাহ্।

—আই, মূর্খ মূর্খ করবে না তো। মেয়েরা কি খেলা বোঝে না? গালি থার্ডম্যান মিডন মিডঅফ সব্ব নাম আমি জানি। এই তো সেদিন রাহুল স্লিপে কী সুন্দর একটা ক্যাচ ধরল.....

—থাক, নাতি-নাতনির মুখের ঝাল খেয়ে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না।

ট্রেন দুলে উঠল। রিন্টি জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে ছুঁল মাকে,—সাবধানে যেও।

দুজনে যেন সারাক্ষণ লড়াই কোরো না।

—আমাকে বলছিস কেন? তোর বাবাকে বলে দে।

—বাবা, তুমি কিন্তু একদম মাথা গরম করবে না।

তপোধীর জবাব দিলেন না। প্ল্যাটফর্ম সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সরে যাচ্ছে কোলাহল। সরে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ জামাই নাতনি। হাত নাড়ছে। রন্টুর গলা উড়ে এল,—কেসটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেল রে। পুরীর সি-বিচে না দুটো লাশ পড়ে থাকে। স্কন্ধ কাটা!

তপোধীর গুম হয়ে গেলেন। সবই যখন জানা, তখন জোর করে পাঠানোর কী দরকার ছিল? কেন যে টিকিট দুটো কুচিয়ে ফেলেননি তপোধীর।

ট্রেন কারশেড পেরোল, এগোচ্ছে ঘটাং ঘটাং। এখনও শহরের আলো ঘিরে আছে ট্রেনটাকে। তপোধীরের কুপের মাঝবয়সি লোকটি লুঙ্গি তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগোল। সামনের তিন যুবক, সম্ভবত সেলসে চাকরি করে, উচ্চৈস্বরে গল্প জুড়েছে। উলটোদিকের দুই জানালায় দুই ক্রিশ্চান সন্ন্যাসী ভাবলেশহীন মুখে বাইরে তাকিয়ে। সব প্যাসেঞ্জার এখনও থিতু হয়নি, অনেকেই ঘুরছে এদিক ওদিক। পাশের কুপে দুটো বাচ্চা কাঁউমাউ করে ঝগড়া করছে। যে দঙ্গলটা একটু আগেও এ জায়গাটা বোঝাই করে রেখেছিল, বোধহয় তাদেরই কেউ। অসহ্য।

করুণা হাতের ম্যাগাজিন তপোধীরের কোলে ফেলে দিলেন। ছোট্ট একটা হাই তুলে বললেন, সকালে কটায় ঠিক আমরা পৌঁছব গো?

তপোধীর বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন,—আমি ট্রেনের টাইম টেবিল নই। বলতে পারব না।

—সে তো জানিই। তুমি হলে গিয়ে খাওয়ার টাইম টেবিল। সাড়ে সাতটায় এই চাই, নটায় এই চাই, সওয়া বারোটায় এই চাই....

—দাও কেন? না দিলেই পারে।

—ওখানে গিয়ে দেব না। তোমার ওই পৌনে চারটের মুসুম্বি, সওয়া পাঁচটার ছানা, ওসব তুমি নিজে জোগাড় করবে।

—ভয় দেখাচ্ছ?

—না, বলে দিচ্ছি। বেড়াতে গিয়ে আমাকে দিয়ে খিদমত খাটাবে, ওটি হবে না।

—তা হলে করবে কী সারা দিন? ভোঁস ভোঁস নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে?

—মোটেই না। ঘুরব, ফিরব, সকাল বিকেল প্রাণ ভরে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করব। ছেলেমেয়ের দয়ায় সুযোগটা যখন এসেই গেল......

একেই বলে নেমকহারাম। বিয়ের সময়ে ক'টাকাই বা মাইনে ছিল তপোধীরের যে বছর বছর বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন। করতেন তো কলেজের মাস্টারি,

সাকুল্যে পেতেন দেড়শো টাকা, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যেত। তার পর যখন মাইনে টাইনে বাড়ল, তখন ছেলেমেয়ের পড়াশুনো নিয়ে হিমশিম দশা। তার মধ্যেও কি বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরোননি দু-চারবার? এই পুরীতেই তো গিয়েছিলেন। বছর কুড়ি আগে। কপাল খারাপ, পৌঁছেই রিন্টির ধুম জ্বর। কোথাও বেরনো হল না, সমুদ্রে নামা হল না, শুধু হোটেল আর ডাক্তারখানা। তাও মেয়ের জ্বর কমার পর একদিন সবাইকে নিয়ে কন্ডাক্টেড টুরে বেরিয়েছিলেন তপোধীর। কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন। ফেরার দিন সকালে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়াও হয়েছিল করুণার। সে সব কথা কি করুণা ভুলে গেছেন!

তপোধীরের ঈষৎ অভিমান হল। ভার গলায় বললেন, —হ্যাঁ, ছেলেমেয়েই তো তোমায় ঘোরাচ্ছে জীবনভর।

—ঘোরাচ্ছেই তো। মেয়েজামাই নিয়ে গেল বলে তবু কেদার-বদরি দর্শন হল। ছেলের কল্যাণে তিরুপতি কন্যাকুমারিকা।

—তার আগে জীবনভর তুমি ঘরেই বন্দি থেকেছ!

—ছিলামই তো। ধম্মের মধ্যে কম্মো, একবার পুরী, একবার দার্জিলিং, আর একবার সিমলা। তার পর থেকে তো শুধু ঘাটশিলা আর শিমুলতলা, শিমুলতলা আর ঘাটশিলা।

—তুমি একটি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। রিটায়ারমেন্টের আগে এই পুরী যাওয়ার জন্য তোমাকে দুবার সেধেছিলাম আমি। টোয়াইস্। মনে পড়ে?

—হবে হয়তো। করুণা অবলীলায় এক টিপ জরদা ছুড়লেন মুখে,

—আমার শুধু মনে পড়ে তোমার সঙ্গে একবার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল। গরুর মতো হেট হেট করতে করতে মন্দিরে ঢোকালে, আর পাঁচন বাড়ি দিতে দিতে বার করলে।

—সে তো ফেরার ট্রেনের তাড়া ছিল বলে। চটপট বলে উঠলেন তপোধীর।

—ট্রেন কিন্তু ছিল সন্ধেবেলা।

তপোধীর অপ্রতিভ মুখে হাসলেন একটু,—সেই কথা এখনও মনে পুষে রেখেছ!

করুণার গাল ফুলল,—আমার সব মনে থাকে। কিছু ভুলি না।

তপোধীর চুপ মেরে গেলেন। আড়চোখে একবার সহযাত্রীদের দেখলেন, একবার স্ত্রীকে। ওই গোলগাল ফরসা মুখ, পুতুল চোখের মহিলাটিকে চল্লিশ বছরেও ঠিক চেনা গেল না। কত দরকারি কথা অনায়াসে ভুলে যায়, অথচ বিশ বছর আগের তুচ্ছ স্মৃতিও যত্ন করে সাজিয়ে রাখে মনে। কেন যে এমন হয়!

শহরতলি পার হয়ে ট্রেনের গতি বেড়েছে। দুদিকে এখন জমজমাট অন্ধকার, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আলোর ফুটকি। মাঝবয়সি লোকটি লুঙ্গি শোভিত উঠে পড়েছে উপরের বার্থে, এখন শেওয়ার তোড়জোড় করছে। দুই সন্ন্যাসিনীও শোওয়ার সিট

জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে, মুখোমুখি বসে কথা বলছে। তিন যুবকের একজন তপোধীর পাশে এসে বসল, হাঁটুতে ব্রিফকেস রেখে তিন সঙ্গী তোড়জোড় করছে তাস খেলার। তপোধীর একটু সরে এলেন করুণার দিকে। শেষ ফাগুনের বাতাস হু হু ঢুকছে জানলা দিয়ে। ঠান্ডা হাওয়া, তবে কামড় নেই। ভারী নরম, মিঠে।

কফিওলা এসে গেল। হেঁকে হেঁকে কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছে। তপোধীর গলাতে চাইলেন করুণাকে,—কফি খাবে না?

করুণার চোখ জানালার বাইরে। ঘুরলেন। গুমগুমে স্বরে বললেন,—থাক।

—থাকবে কেন? খাও না। বলেই কফিওলার দিকে অর্ডার ছুড়েছেন তপোধীর,—দুটো কফি দাও দিকি। একটাতে দুধ একটু কম।

—দুধ তো আমাদের মেশানোই থাকে দাদু।

—ঠিক আছে, তবে তাই দাও।

—তুমি এখন কফি খাবে নাকি? করুণার ভুরু কপালে জড়ো,—তোমার না কফি খেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না।

—একদিন, কিছু হবে না।

—না। এর পর কাল সকাল থেকেই তো বুক জ্বালা অম্বল এসব শুরু হবে।

—সকালের ভাবনা সকালে। কাগজের গ্লাস করুণার এগিয়ে দিলেন তপোধীর। নিজেরটাও নিলেন। চুমুক দিচ্ছেন। একটু ঝুঁকলেন স্ত্রীর দিকে। যুবকদের কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় বললেন,—একটা রাত নয় নাই ঘুমোলাম।

—হঠাৎ এমন বদ খেয়াল?

—আমাদের তো আর আগে হানিমুন হয়নি। ছেলেমেয়েরা যখন পাঠালই, তখন নয় আজ রাত থেকেই.....

—ন্যাকামো। সকালবেলা যদি বলো ঘুম হয়নি বলে পেটে গ্যাস হয়েছে, তখন কিন্তু আমি তোমার ধুধধুড়ি নেড়ে দেব।

কফির গ্লাস বাইরে হাওয়ায় ছুড়ে দিলেন তপোধীর। দুহাতের বুড়ো আঙুল দেখালেন স্ত্রীকে,—আমার কাঁচকলা হবে। গিয়েই একটা এমন সমুদ্র স্নান করব, শরীরটা তর হয়ে যাবে।

—সে কী! তুমি সমুদ্রে নামবে নাকি!

—তা হলে আর পুরী যাওয়া কিসের জন্য। আবার গলা নামালেন তপোধীর,

—কেন, তুমি নামবে না?

—মরে গেলেও না। করুণাও ফিসফিস করছেন,—জলে নামলে কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না......মনে নেই সেবার দিঘায় কী অবস্থা। বাবলি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল......

—ও, এই কথা। তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কী হবে?

—আমার সব খেয়াল থাকে। তোমার জন্য একটা এক্সট্রা আন্ডারওয়্যার এনেছি।

—আমি আন্ডারওয়্যার পরে সমুদ্রে নামব! বিস্ময়ে কথাগুলো ঠিকরে এল করুণার গলা থেকে,—তোমার কি ভীমরতি ধরেছে?

তিন যুবক তাস খেলতে খেলতে টেরচা চোখে তাকাচ্ছে। মুখ টিপে হাসছেও যেন। তপোধীরের লোমঅলা বড় বড় কান লাল হয়ে গেল। মিনমিনে, কিন্তু মরিয়া স্বরে বললেন,—অসুবিধের কী আছে। শাড়ি সায়ার নীচে পরবে।

—ছিঃ।

—অতই যদি লজ্জা, তবে কারুর একটা সালোয়ার কামিজ আনলে না কেন?

—চুপ করো তো। পাগলের মতো কথা বোলো না। করুণা কাঁধের ওপর আঁচল গুছিয়ে নিলেন,—তোমাকেও জলে নামতে হবে না।

—কেন?

—প্রেশারের রুগি, সমুদ্রে নামবে কী?

—কালকেই আমি প্রেশার চেক করিয়ে এসেছি। ওষুধও আছে সঙ্গে।

—থাকুক। রন্টু আমাকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে, বাবা যেন নুনজলে না নামে।

—বললেই হল। রন্টু কি আমার গার্জেন? তপোধীরের গলায় ঝাঁঝ ফিরে এল।

—দেখাশুনো যখন করে, তখন গার্জেন তো বটে।

—এই করে করে তো ছেলেকে মাথায় তুলেছ। বাপকে আর কেয়ার করে না।

—অমানি্যটা কী করেছে?

—করেনি! ওইটুকু ছেলেকে পই পই করে হস্টেলে পাঠাতে বারণ করলাম......। হস্টেলে না পাঠালে কি ছেলে মানুষ হয় না?

—তা ওদের ছেলে, ওরা যা খুশি তাই করেছে। তোমার কী?

—আমার শরীর নিয়েও আমি যা খুশি করব। জলে নামব।

—নেমে দেখো। আমি পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাব।

অসহায় ক্ষোভে দাঁত কিড়মিড় করলেন তপোধীর। করুণা সব পারেন। বপুতেই শুধু গন্ধমাদন নয়, তাঁর মতটিও নড়ানো বড় কঠিন কাজ। এক সময়ে, তখন রিন্টি কোলে, রন্টু বছর চারেকের, খুব ব্রিজ খেলার নেশা হয়েছিল তপোধীরের। কলেজ থেকে চলে যেতেন তাসের আড্ডায়, ফিরতেন সেই সাড়ে দশটা এগারোটায়। করুণা খুব রাগারাগি করতেন, বাপের বাড়ি চলে যাবেন বলে ভয় দেখাতেন। তপোধীর আমল দেননি। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে দেখলেন ঘর শুনশান, ছেলেমেয়ে নিয়ে সত্যি সত্যি কোন্নগরে চলে গেছেন করুণা। পাঁচ-সাতদিন মাথা ঘামাননি তপোধীর,

হাত পুড়িয়ে রেঁধে বেড়ে কলেজ করেছেন। তারপর এক সময়ে টনক নড়ল। কোন্নগরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আরও বিপত্তি। করুণার এক গোঁ। ছেলেমেয়ের মাথায় হাত রেখে দিব্যি গালতে হবে আর কখনও তাস ছোঁবেন না তপোধীর, তবেই ফিরবেন করুণা। তপোধীরকেই হার মানতে হয়েছিল সেবার। সে নিয়ে অবশ্য এখন আর কোনো খেদ নেই তপোধীরের, তাস ছেড়ে ছেলেমেয়ের পিছনে সময় ব্যয় করা আখেরে ভালোই ফল দিয়েছে। দুজনেই কৃতী হয়েছে লেখাপড়ায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে তপোধীরের। বাপ-মাকে যথেষ্ট মান্যিগন্যিই করে ছেলে মেয়ে।

তবে এই মুহূর্তে সে কথা স্মরণে আনতে রাজি নন তপোধীর। গাল ঝুলিয়ে বসে আছেন। প্রচণ্ড গতিতে একটা ছোট্ট ব্রিজ টপকে গেল ট্রেন। জানালার দিকে তাকালেন না তপোধীর।

করুণা হাঁটু চেপে উঠে দাঁড়ালেন। বাথরুমে যাচ্ছেন। দুই সন্ন্যাসিনীর মাঝে কোথ্থেকে এসে বসেছে এক দাড়িওলা সাধু, ঝালমুড়ি খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। টিটিকে কাছে আসতে দেখে শুট করে উঠে দাঁড়াল, গেরুয়া সামলে কেটে পড়ছে দরজার দিকে। তিন যুবক ডুবে আছে রামিতে, কাগজে হিসেব লিখছে বার বার।

খেলার পত্রিকাটা উলটোলেন তপোধীর। অসংলগ্নভাবে। দু-চারটে পাতা দেখে রেখে দিলেন ম্যাগাজিনটা।

করুণা ফিরে এসে বললেন,—ম্যাগোঃ, বাথরুম কী নোংরা।

তপোধীর উত্তর দিলেন না।

করুণা মুখ টিপে হাসলেন,—রাগ করো কেন? আমি যা বলি, ভালোর জন্যই বলি।

তপোধীরের কথা বলার ইচ্ছে হল না। করুণা এক দৃষ্টে দেখছেন স্বামীকে — ঠিক আছে বাবা, নেমো সমুদ্রে। বেশিক্ষণ থেকো না।

—আর তুমি? তপোধীরের ঘাড় শক্ত।

—গিয়ে দেখা যাবেখন। করুণার হাসি ছড়িয়ে গেল,—এবার টিফিন কেরিয়ারটা পেড়ে দাও দিকি। নটা বাজে, খাওয়াটা আগে সেরে নাও।

তপোধীরের রাগ নিবে এল। নিঃশব্দে উঠে চার থাকের কৌটোখানা নামালেন,

—মেনু কী?

—তোমার জন্য মালাই চমচম আছে। নরম পাকের সন্দেশও। তোমার মেয়ে এনেছিল।

—বউমা দুপুরে আলুর দম বানাচ্ছিল না! গন্ধ পাচ্ছিলাম!

—আছে গো আছে। তোমার আলুর দমও আছে। দু পিস মাছভাজাও।

—তুমি মাছভাজা ভালোবাসো, ও দুটো তুমিই খাও। আমাকে খালি লুচি আলুর

দম দিলেই হবে।

—লুচি কোথায় পাব?

—পাবে মানে! রিন্টি আর বউমা যে তখন লুচি ভাজছিল!

—সে তো ওদের জন্য। আমাদের জন্য ওরা নরম করে রুটি বানিয়ে দিয়েছে।

লুচি দেয়নি! তপোধীর প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

—অমন করো কেন? তোমার না ভাজাভুজি খাওয়া বারণ। ঠাণ্ডা লুচি খেলে তুমি হজম করতে পারতে? টিফিন কৌটোর ঢাকনা খুললেন করুণা,

—বউমা দিতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।

তপোধীর রাগ করতেই ভুলে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন,

—শিরে হইল সর্পাঘাত, তাগা বান্ধি কোথা! বউই যদি শত্রু হয়.....। দুধ নেই, কিছু নেই, আমি রুটি চিবোতে পারব না।

—তোমার জন্য সেই আচারটা এনেছি গো। করুণা যেন শিশুকে ভোলোচ্ছেন,—সেই যে গো মিক্সড পিক্‌ল। তুমি ভালোবাসো বলে সেলস্‌ গার্লের কাছ থেকে কিনেছিলাম।

ট্রেনের গতি কমছে। খড়্গপুর এসে গেল। ভেন্ডাররা জানালায় খাবার হাঁকছে। ছেলে তিনটে তাস বন্ধ করে পুরি তরকারির হুকুম ছুড়ল। ওপরের বার্থের লোকটা তরতরিয়ে নেমে চলে গেল প্ল্যাটফর্মে। দুই সন্ন্যাসিনী উদাসীন স্বরে ডিমওলাকে ডাকছে।

তপোধীরও উঠে জানালায় গেলেন,—অ্যাই আমাকে দুটো বয়েলড এগ দাও তো।

টিফিন কেরিয়ার পাশে রেখে বাবু হয়ে বসেছেন করুণা। ঝুলি থেকে প্লেট বার করেছেন, গ্লাস বার করেছেন, আলুর দম তুলছেন চামচ দিয়ে। অবাক মুখে বললেন,

—তুমি এখন ডিম খাবে?

খাব। অ্যাই, দুটো ডিমের দাম কত?

—আমি কিন্তু খাব না।

—খেয়ো না। আমি একাই খাব।

আর সারা রাত বেলুনের মতো ফুলব! করুণার চোখ থমথমে,—নুন ছাড়া খাবে কিন্তু।

—সব ব্যাপারে হুকুম ফলাবে না। আমি দুটোই খাব। উইথ সল্ট।

কচকচ ডিমসেদ্ধ চিবোচ্ছেন তপোধীর। নুন মাখিয়ে। করুণাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন করুণা, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

ট্রেন ছাড়ল। তিন যুবক খাওয়া সেরে মৌজ করে সিগারেট ধরিয়েছে, ধোঁয়া পাক খাচ্ছে কূপে। মাঝবয়সি লোকটা আধ ডজন কলা হাতে পাকা মাদারির মতো

টঙে উঠে গেল। ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনীরাও রাতঘুমের নিরাসক্ত তোড়জোড় চালাচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব বেড়েছে সামান্য। এমন কিছু বেশি নয়।

বাথরুম সেরে ধুতি বদলে লুঙ্গি পরে এলেন তপোধীর। করুণা ইতিমধ্যেই তিন যুবকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন, তাদের হাঁড়ির খবর বার করছেন টেনে টেনে।

তপোধীর গিন্নির মেজাজটা পড়ার চেষ্টা করলেন। একটু খোশামোদের সুরে বললেন,—তোমার চাদর বার করে দিই?

করুণা শুনেও শুনলেন না।

তপোধীর আবার বললেন, —সুতীর চাদরটা বার করব?

—না।

—বাপস্ কী তেজ গলায়! তপোধীর মুখ হাসি হাসি রাখারই চেষ্টা করলেন, —জানালাটা বন্ধ করে দাও না।

—কেন?

—কেন আবার কী? তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—জানালা বন্ধ করলে আমার গরম লাগবে।

এরই নাম বাতিক। ইনি আবার অন্যের পিছনে লাগেন! তপোধীর গার্জেনের গলায় বললেন,—রাতের ট্রেনে কারুর গরম লাগে না।

—আমার লাগে।

—শুনলে পাগলেও হাসবে। স্ত্রীকে টপকে ঝুপ করে কাচ নামিয়ে দিলেন তপোধীর। দুটো জানালারই। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন,—একটু গরম লাগুক। কদিন আগেই গলা ব্যথা হয়েছিল, সে খেয়াল আছে?

করুণা বিশেষ পাত্তা দিলেন না, আবার গল্প জুড়েছেন সামনের ছেলেটির সঙ্গে। ভাঁজ করা ধুতি কিটব্যাগের ওপর রেখে পাশের চেন খুললেন তপোধীর। হাতড়াচ্ছেন,—আমার প্রেশারের বাড়িগুলো গেল কোথায়?

—যেখানে রেখেছিলে সেখানেই আছে। করুণার উদাস জবাব।

—সেখানে নেই।

—তা হলে ওখানে রাখোনি।

—বললেই হল! আমি নিজে হাতে কিট ব্যাগে তুলেছি।

—এটা তা হলে কী? কোলের হ্যান্ডব্যাগ থেকে ওষুধের পাতা বার করলেন করুণা।

—লুকিয়ে রেখেছিলে!

—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার ওষুধ লুকোব! টেবিলে ফেলে এসেছিলে, আমি মনে করে নিয়ে নিয়েছি। বলতে বলতে ছেলে তিনটেকে সালিশি মানছেন করুণা,—দেখেছ তো, কী বেখেয়ালি মানুষ নিয়ে আমার ঘর করা?

তোলো হাঁড়ির মতো মুখ করে ট্যাবলেট গিললেন তপোধীর। ঢকঢক খানিকটা জল খেলেন। বেডিং খুলতে গিয়ে কী যেন মনে পড়ে গেল। হঠাৎই থামলেন,—তোমার মালিশটা নিয়েছ?

—আমার তোমার মতো ভুলো মন নয়। বালতিব্যাগে আছে।

—বটেই তো, বটেই তো। খোলা কিট ব্যাগের পকেট থেকে একখানা টিউব বার করলেন তপোধীর। করুণার নাকের সামনে নাচাচ্ছেন,—এটা তা হলে কী?

খপ করে ওষুধটা কেড়ে নিলেন করুণা, নিজের হ্যান্ডব্যাগে পুরে ফেললেন,—ও, এটা তোমার কাজ! তাই আমি বেরনোর সময়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না!

—আমার কাজ নয়, তোমারই বেআক্কেলেপনা।

—কেউ যদি সরিয়ে রাখে কী করব?

—সরাইনি, মনে করে সঙ্গে নিয়েছি। বলেই ছেলে তিনটের দিকে ফিরলেন তপোধীর,

—দ্যাখো দ্যাখো, কী চিজ নিয়ে ঘর করি আমি।

মজা পেয়ে হাসছে তিন যুবক। হাসতে হাসতেই টপটপ মাঝের বার্থ নামিয়ে ফেলল, ফুঁ দিয়ে দিয়ে বালিশ ফোলাচ্ছে, পেশাদারি ভঙ্গিতে আয়োজন করছে শোওয়ার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডান কাত ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজন।

তপোধীর বসে বসে হাই তুলছেন,—এবার তো আমাদেরও শুতে হয়।

—সারা রাত জাগবে বলেছিলে না? করুণার কণ্ঠে উপহাস।

—ঘুম পাচ্ছে যে।

—তবে শোও। দাঁড়াও, বিছানা করে দিই।

—এখানে কেন? আমি মাঝের বার্থে যাচ্ছি।

—উঁহু, ওটা এখন নামাবে না।

—কেন?

—কারণ আমি ঘুমোব না, তাই। ওটা নামালে আমার বসতে অসুবিধে হবে।

তপোধীর কথা বাড়ালেন না। বাধ্য ছেলের মতো নীচের বার্থেই শুয়ে পড়লেন। করুণাকে আলগা ছুঁয়ে।

তপোধীরের মাথার কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছেন করুণা, আনমনা চোখে দেখছেন পৃথিবীটাকে। বন্ধ কাচের এপার থেকে।

রাত নিঝুম হয়ে এল। কামরায় জেগে আছে নীলচে রাতবাতিরা, জেগে আছেন করুণা। স্বপ্ন স্বপ্ন বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে এ কুপে সে কুপে। আঁধার ছিঁড়ে ছুটছে রেলগাড়ি, ঝমঝম ঝমাঝম। থামছে, ছুটছে, থামছে, ছুটছে। পার হচ্ছে নদী, পার হচ্ছে প্রান্তর, পার হচ্ছে একটার পর একটা সেতু।

গভীর রাতে তপোধীরের ঘুম ভেঙে গেল। করুণা ঠেলছেন জোরে জোরে,

—আই শুনছ?

—উঁ?

—বাপ্, কী ঘুম রে! কামরা যে একেবারে মাত করে দিলে। পাশ ফিরে শোও।

ঘুম চটকে গেল। চোখ বড় করে উঠে বসলেন তপোধীর,

—চিল্লাচ্ছ কেন? হলটা কী?

—সিংহের মতো নাক ডাকাচ্ছ কেন?

—তোমার তাতে কী?

—আমার ঘুম আসছে না। ট্রেনে আমার ঘুম আসবে না।

—শুলেই আসত। বললাম ওপরে উঠে যাচ্ছি।

—না। ওপরে উঠলে তোমাকে আর ঠেলা যাবে না। অভ্যেস তো জানি, না ডাকলে তোমার গর্জন থামে না।

—সঙ্গে একটা পাখা আনলে পারতে। ডাঁটি দিয়ে খোঁচাতে মনের সুখে।

—তাই উচিত ছিল। কী লোকের সঙ্গেই না বেড়াতে বেরিয়েছি। কুম্ভকর্ণ একটা।

করুণার যেন গলা কাঁপল একটু! তপোধীর অপাঙ্গে তাকালেন। হঠাৎ কোথ্‌থেকে এক ঝলক বাতাস এসে ঝাপটা মারে উনসত্তর বছরের মনটায়। বাতাসটা এত বেশি দূরের, যে চিনেও চিনতে পারলেন না তপোধীর।

এবার একটা নদী পার হচ্ছে রাতের গাড়ি। ধীরে, অতি ধীরে। বৈতরণী নদী। এ নদী পার হলে নাকি এ পারের টান কমে যায়।

তপোধীর চুপটি করে বসে আছেন। করুণাও নীরব। বয়ে যাচ্ছে এক মৌন মুহূর্ত।

এক সময়ে তপোধীর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন,—ওয়াটার বটলটা দাও তো।

করুণা জানালার কাছে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, নিজে উঠে নাও।

মুহূর্ত মিলিয়ে গেল। তপোধীর অসহিষ্ণু হলেন, নিয়ম মতোই। বললেন,

—তোমার সামনে ঝুলছে বলেই বলা। থাক্, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে নয় মরেই যাব।

—কী কথার ছিরি! হাত বাড়িয়ে জলের বোতল পাড়লেন করুণা,

—সবটা শেষ কোরো না। আমিও খাব।

এক ঢোক খেয়েই প্লাস্টিকের বোতল এগিয়ে দিলেন তপোধীর,

—খাও, নিজে আগে প্রাণ ভরে খাও।

—ইঁইহ, মেজাজে একবারে চাঁদি ফাটে দেখি।

উত্তরে কিছু একটা বললেন তপোধীর। তার উত্তরে করুণা। তার উত্তরে

তপোধীর। চলছে, কলহ চলছে। বিনবিন ঝগড়া বন্ধ কাচ ফুঁড়ে চলে গেল বাইরে। নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে।

রাত এখন বড় মায়াময়। চাঁদের বুড়ি রুপোলি সুতো কেটে চলেছে চরকায়। সেই সুতোয় বোনা মসলিন এখন ভাসছে চরাচরে। রুপোলি সর মেখে ছুটছে অলৌকিক গাছপালা, ছুটছে, মাঠ, ছুটছে, নদী, ছুটছে বালির চর।

বৃদ্ধ পৃথিবী ছুটছে সমুদ্রের পানে। জ্যোৎস্না মেখে। জ্যোৎস্না হয়ে। সেই জ্যোৎস্নায় একাকার হয়ে গেল কলহরাজি। জ্যোৎস্না চলেছে সমুদ্রের পানে। বড় বাঙময় জ্যোৎস্না। হানিমুনে চলেছেন উনসত্তর আর তেষট্টি। তপোধীর আর করুণা।

সাত বছর এগারো মাস আট দিন

শব্দগুলো যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেঁথে যাচ্ছে যন্ত্রটার গায়ে। টকটক...টকটক...টক। পাশে বসা যুবকটি কী অবলীলায় খেলা করে চলেছে প্রতিটি কথাকে নিয়ে? বাজাচ্ছে, নাচাচ্ছে, আঙুলের মৃদু চাপে দ্রুত তাদের বসিয়ে দিচ্ছে যন্ত্র-অক্ষরগুলোর বুকে।

ভদ্রলোক ভরাট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। চাবিতে আঙুল রেখেই যুবক মুখ তুলল—পড়ব?

—পড়ো।

টাইপরাইটারের রোলার পাক খেল কয়েকবার। যুবক ঝুঁকল যন্ত্রস্থ কাগজটার দিকে—টু দা কোর্ট অফ দা ডিসট্রিক্ট জাজ, আলিপুর, চব্বিশ পরগনা সাউথ। ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নাম্বার নশো পঁয়ত্রিশ অফ নাইনটিন এইট্টিনাইন।

—হুঁ। ভদ্রলোক রিভলভিং চেয়ার ঘোরালেন। গর্বিত মোরগের মতো ঘাড় ফুলে উঠল সামান্য—বুঝলেন, এ বছর এই নশো পঁয়ত্রিশটা কেসের একশো বাইশটা আমিই করলাম। হা হা। বারে আজকাল আমার নামই হয়ে গেছে বিচ্ছেদ উকিল।

নিজের রসিকতায় একাই হাসছেন ভদ্রলোক। চন্দন নকল হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল ঠোঁটে। হাসি ঠিক ফুটল না। সিগারেটে বড় টান দিয়ে মাথা রাখল চেয়ারের পিঠে। ভুল করে একবার তাকিয়েও ফেলল সুদেষ্ণার দিকে। টেবিলের কাচে একভাবে আঙুল বুলিয়ে চলেছে। কোনো টেনশন চাপার চেষ্টা করলে চিরকালই আঙুলগুলোকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না সুদেষ্ণা। ফর্সা চঞ্চল আঙুলগুলোর ওপর থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে নিল চন্দন।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করছেন দুজনকেই। চন্দনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চালশে চশমাখানা এঁটে নিলেন চোখে। যুবকের দিকে ফিরলেন—এবার তাহলে পিটিশনারদের ডিটেইলস্ টাইপ করে ফেল। ওকে?

—করে ফেলেছি স্যার। যুবকটির গলায় চোরা উৎসাহ যেন। উৎসাহ, না কৌতূহল? আড়চোখে একবার দেখেও নিল সুদেষ্ণাকে,—এই যে স্যার। পিটিশনার নাম্বার ওয়ান শ্রীচন্দন মুখার্জি, বাবা লেট হরশংকর মুখার্জি, বাই ফেথ হিন্দু, বর্তমান ঠিকানা আটত্রিশ-জে মহারাজা ঠাকুর রোড, পি-এস—যাদবপুর, কলকাতা, সাত লক্ষ একত্রিশ। পিটিশনার নাম্বার টু শ্রীমতী সুদেষ্ণা মুখার্জি, স্বামী শ্রীচন্দন মুখার্জি,

বাবা লেট আনন্দমোহন চ্যাটার্জি, বাই ফেথ হিন্দু, বর্তমান ঠিকানা একুশের দুই লেক প্লেস, পি-এস—টালিগঞ্জ, কলকাতা, সাত লক্ষ উনত্রিশ।

—রাইট। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। আরাম করে শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলেন দশাসই চেয়ারটায়। দু আঙুলে ডট পেন ঘোরাতে লাগলেন বনবন—এবার তা হলে হেডিং লিখে ফেল। লেখো অ্যাপ্লিকেশন ফর ডিভোর্স অন মিউচুয়াল কনসেন্ট আন্ডার সেকশন তেরোর বি অফ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, উনিশশো ছাপ্পান্ন।...হয়েছে? পরের লাইন—দি হাম্বল পিটিশন অফ পিটিশনার নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড পিটিশনার নাম্বার টু...।

তীব্র শব্দ তুলে যান্ত্রিক গতিতে বাক্যরা পরপর দাঁড়িয়ে পড়ছে স্ট্যাম্প পেপারের গায়ে। টাইপরাইটারের চাবি নয়, যেন বৃদ্ধ বিধাতার শীর্ণ আঙুল বিধিলিপি লিখে চলেছে।

সুদেষ্ণা চোখ বুজে ফেলল। আহ্। কেন এ সময়ে ওই ছবিটাই বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। একটা পরিপূর্ণ আলোকময় সন্ধ্যা। চারদিকে উজ্জ্বল মানুষের মুখ, হাসি কোলাহল আর সানাইয়ের বুক তোলপাড় করা সুর। অমন একটা খুশির ছবিতে কে ওই মেয়েটা রাজেন্দ্রাণী হয়ে বসে? চোখভর্তি লজ্জা। বুক জুড়ে তিরতির সুখ। সে কি এই সুদেষ্ণাই।

পুরুতমশাই বললেন—কন্যাকে পশ্চিমমুখে বসান। জামাইকে পুবমুখে।

বেনারসি আর গয়নায় জরদ্গব সুদেষ্ণাকে দুই বৌদি চন্দনের মুখোমুখি বসিয়ে দিল।

পুরুতমশাই বাবার দিকে তাকালেন—এবার আপনি কন্যা ও বরের পরস্পরের মুখ অবলোকন করান।

শাঁখ বেজে উঠল। উলুধ্বনিতে কান তোলপাড়। বাবা চন্দনের হাঁটুতে হাত রেখেছেন। সারাদিনের উপোস করা চোখেমুখে একটু শুকনো ভাব। তবু গরদের কাপড়ে কী সৌম্য সেদিন! খালি গায়ে ধবধবে সাদা পৈতে। হাতের কোশে তিল, কুশ, যব।...ভরদ্বাজ গোত্রস্য স্বর্গীয় হরশংকর দেবশর্মণঃ পুত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রায় চন্দন দেবশর্মণে...কাশ্যপ গোত্রস্য আনন্দমোহন দেবশর্মণঃ পুত্রীং, কাশ্যপ গোত্রাং সুদেষ্ণা দেবীং এনাং—সবস্ত্রাচ্ছাদিতালঙ্কৃতাং কন্যাং...

গাঁটছড়া বাঁধার আগে কে যেন বলে উঠল,—এ হল জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন, বুঝলি।

মিথ্যে। সব ভাঁওতা। ভাবের ঘরে চুরি। মনকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। বন্ধন কোথাওই কোনোদিন তৈরি হয় না। কারও সঙ্গেই না। যা হয় সবটাই এক ধরনের মায়া মাত্র।

সুদেষ্ণা চোখ খুলল। চন্দন ঠিক কোন দিকে মুখ করে বসে এই মুহূর্তে? সেই

বা কোন মুখে? জীবনের মুখ কখন যে কোথায় কীভাবে বদলে যায়। এই ঘরের ভেতরে বসে দিকনির্ণয় করা এখন অসম্ভব। গেট ঠেলে, উঠোন মাড়িয়ে, লম্বা একটা করিডোর পেরিয়ে এ ঘরে এসেছে। এসেছে বললে ভুল হয়। তাকে নিয়ে এসেছে। চন্দনই।

কাল সন্ধেবেলা হঠাৎই চন্দনের ফোন। লেক প্লেসে।

—কাল একবার সময় করতে পারবে? দশটা নাগাদ?

—কেন?

—ল-ইয়ার কাল সকালে বাড়িতে ড্রাফটটা ফাইনাল করে ফেলতে চাইছেন। তুমি এলে সুবিধে হয়।

এক পলকের জন্যও হলেও কেঁপে উঠেছিল সুদেষ্ণা। কেন যে কেঁপেছিল। কী হতে চলেছে, কী হবে, সবই তো জানা। জানা শুধু নয়, পূর্ণ সম্মতিও রয়েছে তার। তবুও...

চন্দন ওপ্রান্ত থেকে বলেছিল,—তুমি যদি বলো তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারি।

—জায়গাটা কোথায়?

—ভবানীপুরে। ভারতী সিনেমার পেছনে।

—ঠিক আছে। আমি ভবানীপুর থানার সামনে থাকব। ঠিক দশটায়।

সুদেষ্ণা আলগোছে চোখ বোলাল ঘরের চারদিকে। চতুর্দিকের দেওয়াল জুড়ে কাচের আলমারিতে শুধু মোটা মোটা আইনের বই। একটুও ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভদ্রলোকের মাথার পেছনদিকে একটা শুধু খোলা জানালা। এমন একটা বদ্ধ ঘরে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্বাস নেয় কীভাবে। সুদেষ্ণা মুখ ওপরে তুলে ফ্যানের হাওয়া থেকে কিছু বাতাস টেনে নিল বুকে।

—আমার একটা কথা বলার ছিল।

—বলুন। সবিনয়ে ঝুঁকলেন ভদ্রলোক।

—আমার নাম ঠিকানা মেনশন করার সময়ে প্রথমেই মেনশন করলেন আমি কার স্ত্রী। ইজ ইট নেসেসারি? বাবার নামই কি যথেষ্ট নয়?

—না ম্যাডাম, ইট ইজ কাস্টমারি। খুব কায়দা করে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিচ্ছেন ভদ্রলোক—দেখুন, আপনাদের মিউচুয়াল পিটিশনের বেসিসে এখন ছ মাসের জন্য জুডিশিয়াল সেপারেশন পাবেন আপনারা। রাইট? এর মধ্যে আপনাদের ভেতর রিকন্‌সিলিএশনও হয়ে যেতে পারে। রাইট? আই মীন মিটমাট যদি না হয় তবে ছমাস পরে আপনারা জয়েন্টলি কোর্টে যেতে পারেন টু গেট এ ডিক্রি অফ ডিভোর্স। ওকে? ভদ্রলোক এবার চোখ ফেললেন চন্দনের দিকে, টিল দেন মিস্টার মুখার্জিই কিন্তু আপনার লিগাল হাজব্যান্ড। আপনি এটা অস্বীকার

করতে পারেন না। নয় কি? বলতে বলতে এক ছিটে বাঁকা হাসিও যেন ফুটল মুখে, আপনি কী বলেন মিস্টার মুখার্জি?

—আমার কিছু বলার নেই। চন্দন এক ঝটকায় ঘুরে বসেছে সঙ্গে সঙ্গে। গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ। বিরক্তি। পোড়া সিগারেটের টুকরো অকারণে বেশি চেপে নেভাচ্ছে অ্যাশট্রেতে, আমার মনে হয় এখন কাজের কথাগুলো শুরু করা উচিত।

—বেশ। ভদ্রলোক ঘুরন-চেয়ারে পুরো এক পাক ঘুরে নিলেন। কিন্তু মুখে চাপা কৌতুক,—আমি বরং ফাইনাল টাইপিং-এর আগে আরেকবার পয়েন্টগুলো শুনিয়ে দিই, কেমন? কারুর যদি কোনো অবজেকশন থাকে এখনও ক্লিয়ার করে নেওয়া যাবে। রাইট?

ভদ্রলোক 'রাইট' শব্দটা বড় বেশি ব্যবহার করেন। সবসময় 'রং' নিয়ে কারবার করেন বলেই কি? কথাটা এমনি এমনি মনে হল সুদেষ্ণার। শেষ 'রাইটে'র সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিলের যুবক পিঠ সোজা করে বসেছে। হাত বাড়িয়ে ব্রিফটাকে এগিয়েও দিয়েছে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলে। ভদ্রলোক নতুন করে চশমা এঁটেছেন নাকে।

...পয়েন্ট নম্বর দুই। বিগত উনিশশো আশি সালের পনেরোই জুলাই পিটিশনার নাম্বার ওয়ান, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, তিনি তখনও অবিবাহিতা পিটিশনার নাম্বার টুকে একুশের দুই লেক প্লেস, থানা টালিগঞ্জ, কলকাতা সাত লক্ষ উনত্রিশ, থেকে হিন্দুমতে বিবাহ করেন।

সুদেষ্ণা কপাল থেকে ঝুরো চুল সরাল। চন্দন তাকিয়ে আছে কাচের গায়ে পড়া নিজেরই আবছা ছায়ার দিকে। ভদ্রলোক দুজনের মুখের ওপরই কয়েক পলক দৃষ্টি ফেলে চোখ রাখলেন কাগজে।

...পয়েন্ট তিন। সেই বিবাহের পর থেকে দুই পার্টি একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আটত্রিশ-জে মহারাজ ঠাকুর রোড, থানা যাদবপুর, কলকাতা সাত লক্ষ একত্রিশে বসবাস করে আসছেন। এবং এই ঠিকানায়...

এতবার করে থানা আর পিন কোড় আবৃত্তি করছেন কেন ভদ্রলোক? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রমাণ করার জন্য এগুলো কি এতই বেশি জরুরি? কে জানে!

সুদেষ্ণার দুই ভুরু যখন জড়ো পল্‌কা চিন্তায়, ঠিক তখনই চন্দনের প্রতিবাদ শোনা গেল, তিন নম্বর পয়েন্টে ওটা বোধ হয় ঠিক বলা হল না। বসবাস করে আসছেন সেন্টেন্সটা ভুল। কারণ ও আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে লাস্ট ইয়ারের জুনে।

—আহা ইম্‌পেশেন্ট হচ্ছেন কেন? সে পয়েন্টও আছে। ভদ্রলোক বরাভয়ের হাসি হাসলেন, চার নম্বরটা শুনুন। এই তো।...দুজন পিটিশনারই মানসিক

অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাবের দরুন গত চব্বিশে জুন উনিশশো অষ্টআশি সাল থেকে আর একত্রে বসবাস করতে পারেননি। তাঁরা শেষ দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন উনিশশো অষ্টআশি সালের তেইশে জুন।

ব্যস, এই টুকুনই। বলতে গিয়েও শব্দ দুটোকে গিলে নিল সুদেষ্ণা। আশি থেকে অষ্টআশির জুন, ঠিক ঠিক হিসেব করলে পুরো সাত বছর এগারো মাস আট দিন। এতখানি লম্বা সময়টাকে কি নিপুণ দক্ষতায় দুটো মাত্র লাইনে বেঁধে ফেলল আইন! যেন এতগুলো বছর ছিল শুধুই একত্রে বসবাস করা, আর কিছুই না। কোনো ঘটনা নেই, অঘটনও নেই কোনো! অথচ এই বছরগুলোর প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা, পল, অনুপল এখনও পর পর ধরা আছে স্মৃতির পর্দায়। ঘটনাময় দীর্ঘ ভিডিও ক্যাসেট যেমন। পর পর দৃশ্যগুলো যেখানে মধুর থেকে বীভৎস, আরও বীভৎস। আরও বীভৎস, অথচ তাদেরও কি সুন্দর একটা ছোট্ট বাক্যে বন্দি করে ফেলা গেল—মানসিক অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব! সুদেষ্ণা বাঁ হাতে কপাল চেপে ধরল।

উকিল ভদ্রলোক পরিষ্কার উচ্চারণে পাঁচ নম্বর পড়ে চলেছেন—এই বিবাহের ফলস্বরূপ সায়ন্তনী মুখার্জি নামে একটি কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে আঠাশে ডিসেম্বর উনিশশো একাশি সালে। রাইট?

রাইট! রাইট! দৃশ্যটা আজও অমলিন যে। একটুও রং জ্বলেনি কোথাও। সুদেষ্ণা নিজের মনে মাথা নাড়ল। মনে আছে। সব স্পষ্ট মনে আছে। ওই তো নার্সিংহোমের দরজা ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চন্দন। মুখ জুড়ে আনন্দ, লজ্জা আর নতুন পিতৃত্বের গৌরবমাখা এক অপূর্ব নির্মল হাসি।

—থ্যাংকস সুদেষ্ণা। মেনি থ্যাংকস।

বুকের গভীরে জ্যান্ত পুতুলটার শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে তখন কেমন যেন লজ্জা পাচ্ছে সুদেষ্ণাও। চোখ ছাপিয়ে থিরথির খুশি,—কিসের ধন্যবাদ?

—থ্যাংকস ফর দা সুইট ডটার।

—তবে তো ধন্যবাদ তোমারও প্রাপ্য। আমার তরফ থেকে। মেয়ে তোমারই।

দৃশ্য বদল হয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। রং পালটে গেল। চন্দনের স্বর এখন রুক্ষ, কঠিন।

—তুমি আজ মেয়ে ফেলে কিছুতেই কাজে যেতে পারবে না।

—কেন? ঝিমলি তো আজ ভালোই আছে। বেশ খেলা করছে।

—তবু তুমি বেরোবে না।

—অসম্ভব। আমাকে আজ একবার যেতেই হবে। তুমি তো জানো আমার কনফার্মেশন হয়নি এখনও।

—চুলোয় যাক তোমার চাকরি। মেয়ে ফেলে...

—আশ্চর্য! বাড়িতে এতগুলো লোক রয়েছে...তোমার মা, তোমার বোন—

—তারা কেউ তোমার মেয়ের আয়া নয়।

—এভাবে বলছ কেন? আমি তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য...বেশ তো, তুমিই তাহলে আজকের দিনটা বাড়িতে থাকো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি...

—চমৎকার! তোমার জন্য আমি অফিস কামাই করব?

—আমার জন্য কেন? নিজের মেয়ের জন্য করবে। ঝিমলি তোমার মেয়ে নয়? একটা দিন তুমি থাকতে পারো না বাড়িতে? মেয়ের কাছে?

ভিডিও টেপে তুফান গতিতে আবার ফাস্ট ফরোয়ার্ড। দৃশ্য ছুটে চলেছে পরিণতির দিকে। এবার ছবিতে উদ্দাম চিৎকার। পরস্পরকে আক্রমণ ভয়ংকর ভাবে। সুদেষ্ণা ফুঁসছে রাগী বেড়ালের মতো।

—আমি আর এক সেকেন্ডও তোমাদের বাড়িতে থাকব না। আনকালচারড, অশিক্ষিত ফ্যামিলি একটা। কী ভাবো আমাকে তোমরা? তোমাদের কেনা বাঁদী?

—দ্যাখো, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমার বাড়ির কাউকে তুলে তুমি কোনোরকম...

—বেশ করব বলব। ইতর ছোটলোকের দল সব...

—আর একটা বাজে কথা বললে তোমাকে আমি...

—কী করবে? মারবে?

—ঘাড় ধরে বার করে দেব বাড়ি থেকে।

—তার দরকার নেই। আমি আজই চলে যাচ্ছি। ঝিম—ঝিমলি...

—খবরদার, ঝিমলিকে ডাকবে না।

—ওকে আমি নিয়ে যাব।

প্রচণ্ড শব্দে ঠাস করে গালে চড় পড়ল একটা। ছিটকে গেল সুদেষ্ণা। মুহূর্তে ঘরভর্তি লোকজন। চন্দনের মা, বোন, বাড়ির ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত। কী লজ্জা! কী লজ্জা! সবার গলা ছাপিয়ে তখন সাড়ে ছ'বছরের মেয়েটার কান্না ডুকরে ডুকরে উঠছে—ওমা আমি তোমার সঙ্গে যাব! মা আমি তোমার সঙ্গে যাব!

উকিল ভদ্রলোক গলা ঝাড়লেন ভালো ভরে—এবার ছ নম্বর। কাস্টডির পয়েন্ট।

সুদেষ্ণা টান টান হয়ে বসল। চন্দন দাঁতে আঙুল কামড়াচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য গোটা ঘর স্তব্ধ যেন। তারপরই ভদ্রলোকের ভারী গলা...

—যদিও আইনের চোখে পিটিশনার নাম্বার ওয়ানই প্রেফারেনশিয়াল অ্যান্ড ন্যাচারাল গার্জেন অফ দ্য মাইনর ডটার, তবু তার শিশুবয়স অর্থাৎ বর্তমান টেন্ডার এজ-এর কথা বিবেচনা করে পিটিশনার নাম্বার টুকেই তার কাস্টডিয়ান ধরা হবে।

এতদিন ধরে জমে ওঠা দুশ্চিন্তা, আশংকা যেন এক লহমায় উঠে যাচ্ছে। বুক কাঁপিয়ে গড়িয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস। সুদেষ্ণা বহুকাল পর চুরি করে তাকিয়ে ফেলল

চন্দনের দিকে। চন্দন তাহলে শেষ পর্যন্ত...। একমনে একটা না-জ্বালানো সিগারেট টেবিলে ঠুকছে চন্দন। মুখটা কি একটু ম্লান? লোকটার ওপর হঠাৎ মায়া আসছে কেন? মায়া, না কৃতজ্ঞতা?

উকিল ভদ্রলোক অল্পক্ষণ চুপ থেকে আবার পড়ছেন...ছয়-এর বি। যদিও সন্তান পিটিশনার টু-এর কাস্টডিতেই থাকবে তবু পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের তার প্রতি ততটাই অধিকার থাকবে, যতটা থাকবে পিটিশনার নাম্বার টু'র। এবং শর্ত মোতাবেক পিটিশনার নাম্বার টু প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের কাছে কন্যাকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

না, এটাও তেমন আপত্তিজনক প্রস্তাব নয়। এ শর্ত চন্দন দিতেই পারে। সুদেষ্ণা ঢোঁক গিলল। মেয়ে তার কাছে আছে ঠিকই তবু এখনও তো মাঝে মাঝে তাকে পাঠিয়ে দিতে হয় ও-বাড়িতে। মেয়েটারই যে হঠাৎ হঠাৎ এক এক দিন বাবার জন্য খুব মন কেমন করে!

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন সুদেষ্ণার দিকে। সুদেষ্ণা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ফেলল। আর তখনই তৃতীয় সাব পয়েন্টা এসে গেল।

—ক্লজ ছ'এর এ-তে যে প্রভিশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কার্যকর থাকবে না, যদি বাচ্চা স্ব-ইচ্ছায় এবং স্ব-বুদ্ধিতে পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের কাস্টডিতেই থাকতে চায়। সেক্ষেত্রে বাচ্চার কাস্টডি এক নম্বর পিটিশনারের কাছেই ফিরে যাবে। অর্থাৎ তিনিই লিগাল কাস্টডিয়ান হবেন।

কথাটায় কেমন প্যাঁচ আছে যেন। এ কেমন শর্ত! সুদেষ্ণার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল।

—মানেটা ঠিক পরিষ্কার হল না।

—অপরিষ্কারের কী আছে? চকিতে কথা বলে উঠেছে চন্দন। গলার স্বরে ঝাঁঝ না থাকলেও ঝাঁঝের আভাস,—এখানে তো না বোঝার কিছু নেই। ঝিমলি যদি আমার কাছে থাকতে চায়, আমার কাছেই থাকবে।

—ইমপসিবল! সুদেষ্ণা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে—আমি কোনো শর্তে ঝিমলির কাস্টডি ছাড়ব না।

—তা হলে তো তোমার সঙ্গে কোনো আপসই করা যায় না।

—কে করতে বলেছে আপস? আমি আমার নিজের উকিল কনসাল্ট করব।

দুজনেরই ধ্বনি উঁচুতে উঠছে ক্রমশ। সামনে বসা অন্য দুটো মানুষের উপস্থিতি যেন ধর্তব্যই নয়। সুদেষ্ণার চোয়াল শক্ত হয়েছে—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। তুমি সব পারো। আমার মেয়ের ব্রেনওয়াশ করতে তোমার দুদিনও লাগবে না।

—হোয়াট ডু ইয়ু মীন টু সে?

—যা বলতে চাইছি খুব বুঝতে পারছ। ঝিমলি আমাকে সব কথা বলে। তুমি ওকে ও-বাড়িতে ভি সি আর কিনে দেবে বলেছ। আগে কখনও দাওনি, হঠাৎ সেদিন ওকে টকিং ডল কিনে দিয়েছ। তোমার মা ওকে নানারকম লোভ দেখিয়ে ও-বাড়িতে থেকে যেতে বলেন।

—ওয়েট ওয়েট ওয়েট! বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ শোনার পর উকিল ভদ্রলোক মাথা গলালেন—আপনারা আমার কথা একটু শুনবেন? একটু শান্ত হয়ে বসবেন ম্যাডাম?

সুদেষ্ণা রীতিমতো রাগের সঙ্গে বসে পড়ল চেয়ারে।

—গুড! শুনুন তাহলে। আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। এত কথার পরও দিব্যি অমায়িক হাসছেন ভদ্রলোক—আমি আইনের বাইরে গিয়েই বলছি, আপনার মেয়ে যদি প্রলুব্ধ হয়েই তার বাবার কাছে গিয়ে থাকতে চায় তাহলে কিন্তু বুঝে নিতে হবে মেয়ের ওপর আপনার নিজের কোনো ইমোশনাল কন্ট্রোলই নেই। আর মেয়েরও আপনার ওপর টান নেই তেমন।

—মানতে পারলাম না। সুদেষ্ণা সজোরে মাথা ঝাঁকাল—যে কোনো শিশুকেই লোভ দেখানো খুব সহজ।

—মানলাম। কিন্তু শিশুরা মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, এটাও তো সত্যি।

—পারবে না কেন? ওখানে বাবা, ঠাকুমা, পিসি সবাইকে পেয়ে যাবে যে।

—এই, এই তো পয়েন্টে এসে গেলেন। ভদ্রলোক হেসে উঠলেন শব্দ করে,—তাহলে স্বীকার করছেন বাচ্চার জীবনে মা ছাড়াও বাবা ঠাকুমা পিসিদের কিছু ভূমিকা থাকে! রাইট?

না, এদের সঙ্গে তর্ক করে পারা যাবে না। রাগে, কষ্টে চোখে জল এসে যাচ্ছে। নিজের উকিলের কাছে ডেকে এনে আপসের নামে, ইচ্ছে করে তাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে চন্দন। এ এক ধরনের চক্রান্ত। কিছুতেই ফাঁদে পা দেবে না সে। গুম হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল সুদেষ্ণা। জিজ্ঞাসু মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। চন্দন ফস করে ধরিয়ে ফেলল হাতের ধরা সিগারেটটাকে। গলায় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ—ওয়েল! ওর যখন নিজের সন্তানের ভালোবাসার ওপরই আস্থা নেই, তখন তো আর কথাই চলে না।

—কেন চলবে না? ভদ্রলোক গলা নরম করে মধ্যস্থতায় নামলেন আবার, আপনি এগ্রি করলে ওই ক্লজটা বদলে ফেলা যায়।

—ঠিক আছে। চন্দন ভেবে নিল একটুখানি—তার বদলে অন্য ক্লজ রাখতে হবে।

—বলুন।

—কাস্টডি ওরই থাকুক। বিজনেস ডিল রদবদল করার সময় যেভাবে কথা

বলে মানুষ, চন্দনের মুখচোখে অবিকল সেই ভঙ্গি,—মেয়ে উইকে দু দিনের জায়গায় অ্যাটলিস্ট তিনদিন আমার কাছে থাকবে। ওর স্কুলের মাইনে আমি দেব। স্কুলের অফিসিয়াল গার্জেন হিসেবেও আমার নাম থাকবে।

উকিল ভদ্রলোক সুদেষ্ণার দিকে তাকালেন,—এনি অবজেকশন ম্যাডাম?

সুদেষ্ণা নীরব। চন্দনের ব্যঙ্গটুকু তীক্ষ্ণ তীর হয়ে বিঁধে গেছে বুকের ঠিক মাঝখানটাতে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঝিমলির ভালোবাসার ওপরও কি সত্যি তবে আস্থা নেই তার? কারুর ভালোবাসার ওপরই কি আছে? একদিন তো মনে হয়েছিল চন্দনের মতো ভালো আর কেউ তাকে বাসে না। আর আজ...

—কী হল ম্যাডাম? কিছু বলুন?

সুদেষ্ণা লম্বা শ্বাস টানল—আমাকে একটু ভাবতে দিন।

—ভাবুন। ততক্ষণে আমি সাত নাম্বারটা শুনিয়ে দিই।

সুদেষ্ণা শুনেও শুনল না। নিজের মনের সঙ্গে অন্য একটা আপসের মামলা চলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সে।

—সাত নম্বর অনুযায়ী, পিটিশনার নাম্বার টু যেহেতু কর্মরতা, সেহেতু তিনি স্বেচ্ছায় ভরণপোষণের দাবি জানাচ্ছেন না। এবং ভবিষ্যতেও তিনি পিটিশনার নম্বার ওয়ানের কাছ থেকে কোনোরকম অ্যালিমনি দাবি করবেন না।...কী হল, শুনছেন না?

—উঁ? সুদেষ্ণা চমকাল সামান্য।

—আপনি মন দিয়ে শুনছেন না। খোরপোষ প্রসঙ্গে বলছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার কোনো দাবি নেই তো?

—নাহ্। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল সুদেষ্ণা। চন্দন তার দিকেই সোজাসুজি তাকিয়ে আছে। চোখে তীব্র শ্লেষ। সেই শ্লেষ ছড়িয়ে পড়ল সুদেষ্ণার ক্লান্ত চোখেও। স্থির তাকিয়ে আছে দুই পিটিশনার। উকিল ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে পাতা ওলটাচ্ছেন ড্রাফটের। টাইপিস্ট যুবকটি টাইপ রাইটার আস্তে সরালেও বেশ জোরে আওয়াজটা বেজে উঠল কানে। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটাও আচমকা মুখর। সেই মুখরতার সঙ্গে তাল রেখে উকিল ভদ্রলোকের গলা গমগম করে উঠল।

—লাস্ট পয়েন্টাও শুনে নেবেন নাকি?

এর পরও পয়েন্ট বাকি থাকে!

থাকে। আট নম্বর পয়েন্ট অনুযায়ী পিটিশনার নাম্বার টু, শুধুমাত্র তাঁর পিতৃগৃহ থেকে পাওনা যাবতীয় ফার্নিচার, গহনা এবং পোশাকাদি ইচ্ছে হলে ফেরত নিয়ে নিতে পারেন। এই সমস্ত জিনিস ডিভোর্সের ডিক্রি পাওয়ার পরই ফেরত নেওয়া যাবে।

পিটিশনার নাম্বার টু দুম করে খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসল একটা।—ডিভোর্সের

ডিক্রি ঠিক ছ' মাস পরেই পাওয়া যাবে তো?

—সারটেনলি। যদি সঙ্গে সঙ্গে আপনারা অ্যাপিয়ার করেন কোর্টে। ভদ্রলোক ফাইল বন্ধ করলেন—এই ছ'মাস কিন্তু আপনারা স্বামী-স্ত্রীই থাকছেন। বলতে বলতে অভিজ্ঞ হাসি হাসছেন ভদ্রলোক,—এর মধ্যে কিন্তু মিটমাটও হয়ে যায় অনেক সময়। হয়তো আপনাদেরও...

—ঠিক আছে। পিটিশনার নাম্বার টু কঠিন মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে—কথা যেভাবে হল, ফাইনাল ড্রাফটটা আপনি সেভাবে করে রাখতে পারেন। আমি কাল পরশু এসে...

—এক মিনিট। পিটিশনার নাম্বার ওয়ানও প্রায় একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে—আট নম্বর পয়েন্টটা নিয়ে কিছু বলার আছে। ওই ওর জিনিসপত্র ফেরত নেওয়ার ব্যাপারটা। মানে আমি বলতে চাইছি ওর সব কিছু ও যত তাড়াতাড়ি ফেরত নিয়ে যায়, আমাদের সুবিধে হয়, এই আর কি।

—বেশ। তাই হবে।

সুদেষ্ণা দরজার দিকে এগোল। চন্দনও বেরিয়ে আসছে পেছন পেছন। গেট পেরিয়ে, স্বামী-স্ত্রী নয়, দুই পিটিশনার জ্বলন্ত রোদ মাথায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন।

নিজের নিজের রাস্তা ধরার আগে পরস্পরের চোখে চোখ রেখেছে আরেকবার। হয়তো এই শেষবার। চোখে চোখে ফেরত দেওয়া-নেওয়ার হিসেবটাকে আপ্রাণ শুষে নিতে চাইছে দুজনে। আপসের শর্তগুলোকে মিলিয়ে নিতে চাইছে।

মিলছে না। কিছুতেই মিলছে না পুরোটা। আগাগোড়া হিসেবটাকে বার বার উলটে পালটে তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে একটা সময়। সাত বছর এগারো মাস আট দিন।

অসময়ে

ওই তো সে এসে গেছে। ওই তো ফুটপাথের কোল ঘেঁষে সুখী রাজপুত্রের মতো দাঁড়িয়ে তার প্রিমিয়ার পদ্মিনী। আকাশ নীল। ঝকঝকে। স্টিয়ারিং-এ বসা যুবকটিকেও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। পুরো নয়, এক ঝলক সাইড প্রোফাইল। ওই তো তার সুঠাম বাহু, চওড়া কাঁধ, রেশমপুরু মাথাভরা চুল থাকে থাকে সাজানো। মানসীর শরীর জুড়ে সহস্র ঝাড়বাতি জ্বলে উঠল যেন। জ্বলেই নিবে গেল। যেমনভাবে পরিত্যক্ত জলসাঘরের তেলবিহীন বাতিরা জ্বালালেও নিবে যায়। নিজেই কি সেরকম একটা ভাঙা জলসাঘর তবে? শুধুই? না হলে এমন হবেই বা কেন? আর একটুও এগোতে ইচ্ছে করছে না। অসংখ্য দ্বিধা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে পা দুটোকে। নিজের গালে ঠাস ঠাস চড় কষাতে ইচ্ছে করছে। কেন এল সে? কেন?

ভাবতে গিয়ে যেটুকু সময়, নিজেকে গুছোতে যে ক'টি মুহূর্ত, তার মধ্যেই অভিজিত দেখে ফেলেছে মানসীকে। নাকি মানসীই চোখ ফেরাতে ভুলেছে। মোমপালিশ করা হালকা বাদামি রঙ দীর্ঘ শরীর নেমে এল ডোরলক খুলে। মানসী নিথর। মানুষ নয়, যেন এক অলৌকিক যাদুকর হাসি ছিটিয়ে সম্মোহিত করে ফেলছে তাকে। কাছে এগিয়ে এল। আরও কাছে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল, আরে, আপনি এসে গেছেন? কতক্ষণ? দেখতে পাইনি তো?

মানসীর ঠোঁটে অবশ হাসি,—এই তো এলাম।

ঋজু দেহ সামনের দিকে ঝুঁকল সামান্য। ম্যাজিক শেষে যাদুকর যেভাবে অভিবাদন কুড়োয় অবিকল সেই ভঙ্গি। একগোছা চুল পালকের মতো কপাল ছুঁল,—আমি কিন্তু অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। বসে বসে শুধু টস করে যাচ্ছিলাম।

—কী?

—এই আপনি আসবেন কি আসবেন না...

—ও। মানসী ত্রস্ত চোখে চারদিকে দেখে নিল একবার। একটু গুছিয়েও নিল নিজেকে,—নাও আসতে পারতাম। সংসার থেকে সময় বার করা যে কী কঠিন...

—রাইট। অভিজিত তার মায়াবি হাসি ছড়িয়ে দিল বাতাসে,—এই তো দেখুন না, সময় থেকে সময় বার করতে গিয়ে গোটা দিনটাকে আজ ছিঁড়ে দিতে হল।

—কী রকম? মানসী ভুরু তুলল।

—কী রকম আবার। আজ অফিসে জরুরি কনফারেন্স। কালই নোটিস পেলাম

এম. ডি. আসছে। এদিকে আমি চোখ বুজে ডুব।

—এমা, আপনার খুব অসুবিধে করলাম তবে।

—তা একটু করলেন বই কি। কথার ফাঁকে হাসির ঝিলিক, কনফারেন্সে থাকাটা আজ দরকার ছিল।

—ইস্, ছি ছি, খুব খারাপ হল। চোখ বন্ধ করে মানসী গোপন করতে চেষ্টা করল হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া খুশিটাকে,—না এলেই পারতেন। মিছিমিছি আমার জন্য আপনার...

—দায়টা একা নিচ্ছেন কেন? যাওয়ার ইচ্ছেটা তো আমারও আছে। আপনাকে তো আমিই একরকম জোর করে...

মানসী এবার সোজাসুজি তাকাল অভিজিতের দিকে। তাকাল না, তাকিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীর তড়িদাহত। উফ্, কী ধারালো চোখ! প্রতি অনুপলে বিদ্যুৎ নেচে উঠছে উজ্জ্বল মণি দুটোতে। নাচছে। খেলছে। ঝিকঝিক হাসছে। এ চোখে চোখ রাখলে চৈতন্য বিবশ হয় আপনা আপনি। সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।

—এত কী ভাবছেন?

—কিছু না। চলুন। মানসী টের পেল তার তিনটে শব্দই কেমন দুলে উঠল। নিজের অজান্তেই। গালের খাঁজে ছড়িয়ে গেল যুবতী-লজ্জা। কেন এমন হচ্ছে। এই বয়সেও! আশ্চর্য! তবে কি ভালোলাগা মুহূর্তগুলোর কোনও বয়স থাকে না। নাকি তারা এরকমই বেহায়া। রীতিনীতিহীন উলটো পালটা স্রোতের মতো! প্রাণপণে নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করল। অনেক হয়েছে। আজই শেষ। আজই ইতি টানতে হবে এই বেয়াড়া পরিচ্ছেদের।

গাড়ি স্টার্ট নেবার পর জানালার বাইরে মুখ বাড়াল মানসী। একটু আগেও বাসন্তি রং মেখে টাটকা ফুটে ছিল সকালটা। এখন ক্রমে ঘন হচ্ছে রোদ। চৈত্রের দুপুর কিছু পরেই ছড়িয়ে পড়বে নিজস্ব দাপটে। বাতাস হবে রুক্ষতর। এলোমেলো। বাটিক-প্রিন্ট সিল্ক শাড়ির আঁচল তুলে মানসী মুখ মুছল ভালো করে। ঝুরো চুল সরাল কপাল থেকে। আড়চোখে বার কয়েক তাকাল পাশে বসা সুদর্শন যুবকটির দিকে। ঘন চেক টিশার্ট আর সাদা ট্রাউজারে ভারি মানিয়েছে তাকে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধোঁয়া ওড়াচ্ছে গর্বিত ভঙ্গিতে।

নিবিষ্ট মনে ট্রাফিক জট থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে অভিজিত। সব সময়ে এই মোড়টা যেন জঙ্গল হয়ে থাকে। মানুষ আর যানবাহনের জঙ্গল। কিন্তু...কিন্তু...ও কি! জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কে ওটা রাস্তা পার হচ্ছে? এক ঝাঁক মেয়ের সঙ্গে? মানসীর হৃৎপিণ্ডটা তড়াক করে লাফ দিয়েই স্থির হয়ে গেল। লায়লি না? কী কাণ্ড! মেয়েটা এখন এখানে এল কী করে? তাড়াতাড়ি পিছনে হেলে নিজেকে

লুকোবার চেষ্টা করল মানসী। সানগ্লাস পরে বাঁ হাতে মুখ আড়াল করল।

মেয়েগুলো কলকল করতে করতে এ দিকেই আসছে। আরেকটু কাছাকাছি আসতেই...হৃৎপিণ্ড চলতে শুরু করল আবার। লায়লি নয়। লায়লির মতো। ওঠানো হাতে এবারে সজোরে ঠোঁট চাপল মানসী। এমন ভুল হল কেন? বেরোবার আগে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লায়লিকে স্কুল বাসে তুলে দিয়ে এসেছে। ছেলে বেরিয়েছে তারও আগে। বাবার স্কুটারে। তবে কি নিজের অপরাধবোধে নিজেই...! ছি ছি, কী লজ্জা। অভিজিতও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে তার হাবভাব। ভীষণ ছোট লাগছে নিজেকে। নিজের কাছেই। কোনও মানে হয় না। মানসী চকিতে মনস্থির করে নিল। অনর্থক বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। সামনে কোথাও নেমে পড়বে। বাইরে চোখ রেখে গলাটাকে যথাসম্ভব সংযত করল,—শুনুন, আজকে যাওয়া হবে না।

কথাগুলো ঠিক ফুটল না বোধহয়। অভিজিত একবার মাত্র ঘুরেই আবার চোখ রেখেছে সামনের রাস্তায়।

—শুনছেন? আজ আর যাব না।

—কেন? এবার অভিজিত চমকেছে।

—এমনিই। ভালো লাগছে না।

—হঠাৎ?

—বললাম তো ভালো লাগছে না। আমাকে সামনে নামিয়ে দিন। মানসীর স্বরে বিরক্তি। বিরক্তি নিজের ওপরেই।

গাড়ি থামল না। উলটে গতি বাড়ল আরও। বাস, মিনি বাস, গাড়ি, ট্যাক্সি সবাইকে টপকে এগিয়ে চলেছে। লম্বা ব্রিজ পার হল।

—কী হল? থামান। মানসী এবার সত্যি সত্যি অস্থির।

অভিজিত ব্রেকে পা রাখল। বেশ কিছুটা এগিয়ে থামল একেবারে।

—সত্যিই যাবেন না? অভিজিতের চোখে বিস্ময়।

ঠোঁট কামড়ে নিশ্বাস চাপল মানসী।

—কী হল হঠাৎ?

মানসী দু দিকে মাথা নাড়ল।

—কোনও অপরাধ করলাম?

আবার দুদিকে মাথা নাড়ল।

—আমার ওপর রাগ করছেন?

—নাহ্।

—আমাকে বলা যায় না কী হয়েছে?

মানসীর চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। না তাকিয়েও টের পাচ্ছে অদৃশ্য যাদুদণ্ডটা আবার তার চেতনাকে অবশ করতে এগিয়ে আসছে। কিছুতেই নিজের

মুঠোয় নিজেকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অভিজিতের স্বরের ধাক্কায় ভেঙে পড়ছে অশক্ত পাঁচিল। দৃষ্টির তাপে পুড়ে যাচ্ছে জাগতিক সংস্কার।...

—স্টার্ট দিই তা হলে? অভিজিত বাঁ হাতে গিয়ার তুলল। চাপ দিল অ্যাক্সিলাটরে, এই রাস্তা দিয়েই সোজা যেতে হবে তো?

—হুঁ। বহু কষ্টে ধ্বনিটুকু বার হল মাত্র।

অভিজিত হাসছে নরম করে, শুধু হুঁ না। কথা বলুন। এতটা লম্বা রাস্তা কথা ছাড়া যাওয়া যায় নাকি?

মানসী চুপ। চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না কিছুতেই। নিজেকে ভয়। নিজের কণ্ঠকে ভয়। কথা বললেই বুঝি ধরা পড়ে যাবে। সে ভারি লজ্জার ব্যাপার। হাত বাড়িয়ে সামনের কাচটা মুছল অকারণে। মনে জোর এনে কেন যে নেমে যেতে পারল না! কাচের গায়ে আবার আঙুল বসাল।

অভিজিত সিগারেট ধরাল, আপনাকে দেখে কিন্তু বোঝাই যায় না আপনি এত মুডি।

মানসী সিটে হেলান দিল।

—দিদির বাড়িতে প্রথম দিন দেখে আপনাকে কিন্তু একদম অন্যরকম মনে হয়েছিল।

অন্যরকম? কী রকম? শত চেষ্টা করেও কিছুতেই প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে পারল না মানসী। গলা জুড়ে চাপ মেঘ জমা হয়ে গেছে কখন। নিজেকে বোঝাতে চাওয়ার থেকেও না বুঝতে দেওয়ার কষ্ট অনেক বেশি। তার জন্য যে কী ভয়ানক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় নিজের সঙ্গে। নিরন্তর জবাবদিহি করতে হয় নিজের কাছেই। কেমন এমন হয়? ভরাট শান্ত দিঘির মতো টলটলে সুখী সংসার তার। নিরীহ স্বামী। প্রাণবন্ত ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়ে মানুষ করা, রান্না, খাওয়া, ঘর গোছানো। মাঝে মাঝে স্বামীসংসর্গ। সকলেরই যেমন থাকে আর কি। এতদিন পর, চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে সে সব কিছুই কেন এত ম্লান লাগে? ম্যাড়মেড়ে? মনে হচ্ছে আরও যেন কিছু পাওয়ার ছিল। কী সেটা? কী? মানসী বড় করে শ্বাস ফেলল। অভিজিত হয়তো নিমিত্ত মাত্র। হয়তো একটা শূন্য জায়গা ভরাট করতেই অভিজিত। মানসীর বুক কেঁপে উঠল। ঠিক তখনই বিশাল এক ট্রাককে জায়গা দিতে সজোরে বাঁ দিকে গাড়ি ঘুরিয়েছে অভিজিত। আচমকাই। মানসী জানালা চেপে ধরে সামাল দিল নিজেকে।

—ইস। কী বিশ্রীভাবে গাড়ি চালায় সব।

—দোষটা পুরো ওর নয়। অভিজিত হাসছে অপ্রস্তুত মুখে, আমিই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

মানসী সোজা হল। অনেকক্ষণ পর স্বাভাবিক হাসি এল ঠোঁটে। জোর ঝাঁকুনিটা

শরীরের সঙ্গে মনের আড়ও যেন ভেঙে দিয়েছে অনেকটা, কী ভাবছিলেন?

—বলব কেন? অভিজিতের হাসি তরল, আপনি আমাকে বলবেন আপনি কেন এতক্ষণ গুম মেরেছিলেন?

—ওমা, গুম ছিলাম কোথায়? আমিও তো ভাবছিলাম।

—কী?

—কতো কথা। ঘর সংসারের কথা। ছেলেমেয়ের কথা। আমার মতো আধবুড়িদের ভাবনার শেষ আছে কোনো?

কথাগুলো বলে ফেলেই আলগোছে লক্ষ করল পাশের যুবকটিকে। একটু কি থমকাল? সঠিক বোঝা গেল না। সিগারেটের নীলচে ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, আপনারা মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যেতে ভালোবাসেন কেন বলুন তো?

—বাহ্, বয়স হচ্ছে, বুড়ি হব না? আমার বয়সে পৌঁছলে আপনিও...

—সরি। মানতে পারলাম না। অভিজিত স্টিয়ারিং সামান্য ঘোরাল, বয়স বাড়ে শরীরের। শরীরের কিছু সেলের। মন ক্যান স্টে এভার ইয়াং। তা ছাড়া আপনি যতটা বলেন, আপনাকে দেখে ততটা মোটেই মনে হয় না। আপনি...আপনি...ইয়ু লুক কোয়াইট ইয়াং।

কথাটায় স্তুতি আছে কি কোনও? নাকি কোনও হারানো রং? অথবা অদৃশ্য ফুলের গন্ধ? অভিজিতের কথার সবটুকু রূপ গন্ধ মনে মেখে নিল মানসী। মুখে অবশ্য বলল, সে আপনার চোখের দোষ। বলেই জানালার বাইরে চোখ ফেলল। তারপর দুম করে অসংলগ্ন প্রশ্ন করে বসল একটা, আমার কর্তাকে আপনার কেমন লাগে?

একটু যেন হোঁচট খেল অভিজিত। সামলে নিল পরক্ষণেই,—ভালই তো। বেশ ভালো। স্মার্ট। ভালো চাকরি বাকরি করেন। অ্যাম্বিশাস। বাড়ির সবার ওপর যথেষ্ট অ্যাফেকশন আছে বলেও মনে হয়।

—হুঁ। রাস্তার দু' ধারে পার্থেনিয়ামের ঝোপ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল মানসী, ওই বয়সের পুরুষেরা মোটামুটি সব একইরকম হয়।

—আপনার ভালো লাগে না?

—কী জানি, লাগে হয়তো। মানসীর স্বর উদাস।

আবার একটা গাড়িকে পাশ দিতে স্পিড কমিয়েছে অভিজিত। তারপর হাওয়ার সঙ্গে গতি বাড়িয়েছে,—একটা কথা বলব? রাগ করবেন না?

—বলুন।

—নিজের ভালো লাগা, না লাগা আপনি বুঝতে পারেন না কেন?

অভিজিতের কথায় কিসের ইঙ্গিত? মানসী টানটান হল। শিকড় থেকে টান পড়ছে

শরীরে। এখন একটা স্পর্শেই ঘটে যেতে পারে ভূমিকম্প। ভালো লাগার। মানসী জানে। জোর করে তবু নিজেকে বাঁধতে চাইল প্রাণপণ। কারণ ছাড়া কথা ঘোরাল,—দেখেছেন দুপাশে কেমন শুধু পার্থেনিয়ামের জঙ্গল। গাছগুলো বিষাক্ত না?

—বিষাক্ত তো বটেই। অভিজিতের উত্তর নির্বিকার।

—তা হলে এগুলো কেটে ফেলা হয় না কেন?

—কত কাটবে! আবার বীজ পড়বে, আবার হবে। মানসীর সঙ্গে এতাল বেতাল বকে যেতে অভিজিত যেন মজা পাচ্ছে খুব।

মানসীও তর্ক চালাল,—বীজ পড়ে কেন?

—কেন আবার। বেখেয়ালে। দুনিয়ার সব কিছুই কি নিয়ম মেনে হয়? অসতর্ক শব্দটা তা হলে ডিক্সনারিতে থাকতই না।

—ঠিক। মানসীর কপালে ভাঁজ পড়ল,—সতর্ক থাকতে চাইলেও সতর্ক থাকা যায় না অনেক সময়ে।

অভিজিত হাত বাড়িয়ে পেছনের গাড়িটাকে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করল,—থাকার দরকারটাই বা কী? কোনো কোনো ইনসিডেন্ট না হয় বেহিসেবিই রইল। ক্ষতি কী?

মানসী জোরে জোরে মাথা নাড়ল,—বাদ দিন। বলতে বলতে ঢোঁক গিলেছে,—আমার খুব জল তেষ্টা পাচ্ছে। একটা চায়ের দোকান-টোকান দেখে একটু দাঁড়ান তো দেখি।

বাধ্য ছেলের মতো অভিজিতও মাথা নেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে।—ওকে ম্যাডাম।

শহর ছাড়িয়ে শহরতলির কাছাকাছি এসে পড়েছে গাড়ি। চারদিক ফাঁকা হয়ে এসেছে কখন। একটা বাস টার্মিনাসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আবার ওরা গাড়িতে উঠল। বড় রাস্তা ফেলে এবার ডানদিকের আধকাঁচা রাস্তাটায় নেমেছে। অনভ্যস্ত উঁচু পথে চমকে চমকে চলেছে গাড়ি। ক্রমশ মিলিয়ে আসছে জনপদ। নির্জন পথে বাড়ছে বৃক্ষমিছিল। প্রান্তর। ধানভূমি। এ ধরনের পরিবেশে অনর্থক শব্দ বড় বেমানান। হয়তো বা সে জন্যই নীরবে গাড়ি চালিয়ে চলেছে অভিজিত। মানসী নিঃশব্দে বুকে ভরে নিচ্ছে প্রকাণ্ড আকাশটাকে। এক সময়ে গাড়ি এক পঞ্চবটীর কাছে এসে পৌঁছতে মানসী নীরবতা ভাঙল। বাচ্চা মেয়েদের মতো উল্লসিত হয়ে উঠল হঠাৎ, এসে গেছি। এসে গেছি। ওই তো ওই বটগাছটা।

অভিজিত ব্রেক চাপল,—সে কি? পৌঁছে গেলাম?

—হ্যাঁ। এখানটাই নামতে হবে।

মহীরুহটাকে পার হয়ে অভিজিত ইনজিন বন্ধ করল,—একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম না?

—তাড়াতাড়ি? না। কতটা রাস্তা চলে এসেছি বলুন তো। মানসী দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে, আর কিন্তু গাড়ি যাবে না। এখান থেকে হাঁটতে হবে।

—সে তো বুঝতেই পারছি। অভিজিতও গাড়ি লক্ষ করে নেমে দাঁড়াল। কোমরে হাত রেখে আড় ভাঙল শরীরের। আকাশের দিকে মুখ তুলল, বাহ্, জায়গাটা দারুণ তো। এখানে ধারেকাছে মানুষ-টানুষ থাকে না?

—থাকে। দুরন্ত বাতাসের হাত থেকে আঁচল টেনে নিল মানসী, ওই দূরে ঝোপ ঝোপ মতন দেখছেন, ওদিকটাতেই জনবসতি।

ঘন ঘাস মাড়িয়ে মন্দিরের রাস্তায় পা বাড়াল অভিজিত। চোখে মুখে গাঢ় মুগ্ধতা,—সত্যি, দারুণ একটা জায়গা চুজ করেছেন।

—আমি চুজ করতে যাব কেন? এবড়ো খেবড়ো পথে সাবধানে পা ফেলছে মানসী, মন্দিরটা এখানেই তৈরি করা হয়েছে।

—রেগুলার পুজো হয় এখানে?

—এক সময়ে হত। এখন আর কিছুই হয় না। চলুন না, গেলেই দেখতে পাবেন। বলতে বলতে মানসী দূরমনস্ক, অথচ ছোটবেলায় যখন আসতাম, তখনও কী রমরমা। সকাল বিকেল পুজো হত মহাকালের। অনেক দূর থেকে ঘন্টার শব্দ শোনা যেত। এখন ভাঙা মন্দিরে পাথরটাই পড়ে আছে শুধু। লোকজন এসে মাঝে মাঝে সিঁদুর মাখিয়ে যায়।

—আর সেই গাছটা কোথায় আছে? যার কথা সেদিন বলছিলেন?

—ইচ্ছের গাছ? হ্যাঁ, ওটাও ওখানেই আছে। গেলেই দেখবেন কত লাখ লাখ ঢিল বাঁধা ডালপালায়।

—কী গাছ?

—কে জানে। অর্জুন-টর্জুন হতে পারে। মানসী সামান্য দম নিল, জানেন গড়িয়া থেকে ছোট বেলায় প্রায়ই চলে আসতাম এখানে। মার সঙ্গে। মা এসে ঢেলা বেঁধে যেত গাছে। মন্দিরে পুজো দিত।

—তারপর?

—তারপর আর কী। তারপর বহুকাল আসা হয়নি। অনেকদিন পর আবার যখন এলাম তখন একেবারে ভাঙাচোরা। ডেজার্টেড। সেও প্রায় বছর দশেক আগে। ছেলেটা হবার আগে। মানসীর বিশ্বাস কেঁপে উঠল।

ছোট্ট মতন এক ডোবার ধারে এসে মানসী দাঁড়িয়ে পড়ল দুম করে। ডোবার গা বেয়ে ঘুরে গেছে সরু পায়ে চলা পথ। ঘুরে ঘুরে ভাঙা চাতালে মিশেছে। দুধারে ঝোপঝাড়, আগাছা! এক আধটা মাটির ঘটের টুকরো। ছোট বড় ইট ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে সেখানে। ধুলো উড়ছে শুকনো বাতাসে। বড় নিশুত, নিঝুম চারদিক। এত নিঝুম যে গা ছমছম করে। সেই গা ছমছম ভাবটুকু কাটাবার জন্য অভিজিতকে

ডেকে ফেলল মানসী,—আসুন।

অভিজিত শুনতে পেল না। উজ্জ্বল রোদে আরও উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল,—আপনাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। সুন্দর নিসর্গের মতো।

মানসীর চোখ স্থির হল ডোবার বন্দি জলে। অভিজিতের কথাগুলো ভেসে ভেসে ছড়িয়ে যাচ্ছে নির্জনতায়। ছড়াতে ছড়াতে পৌঁছে গেল একদম বুকের মাঝখানটাতে। এখানে আর কেউ পৌঁছতে পারে না। রীতি, নিয়ম, সমাজ, সংসার কেউ না। মানসী স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে এই সত্যটুকু। ন্যায় অন্যায় নয়, উচিত অনুচিত নয়, এই মুহূর্তে একটা গভীর স্পর্শ কামনা করছে তার মন। তার দেহ। একটা বলিষ্ঠ হাতকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। রোজই তো সব কিছু নিয়ম মতন হয়। আজ হোক না একটা বেনিয়ম। বলিষ্ঠ সুন্দর হাতটাকে আজ সে বেঁধে দিয়ে যাবে ইচ্ছের ডালে। এর জন্যই তো সব ভুলে, সব ফেলে এতদূর আসা।

কিন্তু হাতটা যে তবু কাছে আসে না! বিশাল মহীরুহের ডাল বেয়ে বৃথাই নিঃসঙ্গ রোদের টুকরোগুলো জাফরি কাটে মুখে, শরীরে। চৈত্র বাতাস ভাসিয়ে নেয় আঁচল।

—আসুন। মানসী আবার ডাকল স্বগতভাবে।

ইচ্ছের ঢেলা এতক্ষণে কাছে আসছে। ধুলো মাড়িয়ে আরও কাছে এল। একেবারে মুখোমুখি। মানসী হাত বাড়াল। দুহাতে দুর্লভ সময়টাকে ছুঁয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সম্বিত ফিরল আচমকাই,—চলুন। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

অভিজিতের ঠোঁটে হাসি ফুটল। অপূর্ব মোহময় এক পুরুষালি হাসি। সেই হাসির মধ্যে দিয়ে সেও যেন ফিরল নিজেব মধ্যে। সহজ ভাবে ভেঙে দিল স্খলিত সময়টুকুকে,—চলুন। ইচ্ছের গাছ ডাকছে আপনাকে।

ভাঙা চাতালে পৌঁছে মানসী অসহায়ভাবে ফিরে তাকাল, কী ইচ্ছে বাঁধি বলুন তো?

—বাহ্, আমি কী করে বলব? বাঁধবেন তো আপনি।

—হুঁ। কিন্তু কী যে বাঁধব বলে এসেছিলাম...

—মনে করে দেখুন।

—হ্যাঁ। মনে পড়েছে। মানসী প্রাচীন গাছটাকে ছুঁয়ে দাঁড়াল। সোজা হয়ে। বলল, মেয়েটার সামনে পরীক্ষা। একদম পড়াশুনা করে না। ওর রেজাল্টের জন্য বাঁধতে হবে একটা।

আর?

—ছেলেটা মাঝে মাঝে বড় ভোগে। সামনে নাকি বড় একটা ফাঁড়াও আছে।

ওর জন্যও...

—আর?

—ওদের বাবার নাম করেও বাঁধতে হবে একটা। অনেকদিন ধরে প্রমোশনটা ডিউ হয়েও...

—আর?

—আর কী? এই তো এখন চাওয়া। মানসীর নিশ্বাস থর থর।

আবার কাছে এল অভিজিত। হাত রাখল মানসীর কাঁধে। নিবিড় স্বরে বলল,—নিজের জন্য বাঁধবেন না?

মানসী উত্তর দিল না। আলতো করে প্রিয় হাতটাকে নামিয়ে দিল কাঁধ থেকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,—এখন আর সে ইচ্ছে বাঁধতে নেই।

মনে মনে বলল,—বেঁধেছি। মৃত্যু।

এমন অসম্ভব সুন্দর মুহূর্তগুলোকে ছুঁয়ে ফেলার পর মরে যাওয়া ছাড়া আর কী চাওয়ার বাকি থাকে? মানুষের?

সামনে সমুদ্র

রাত্রে খাবার টেবিলে কথাটা পাড়ল শ্রাবণী,—তাতারের গরমের ছুটি তো শেষ হয়ে এল, চলো না কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।

ধীমান রুটির সঙ্গে গোগ্রাসে একটা টিভি সিরিয়াল গিলছিল। নায়িকা গুপ্ত প্রেমিকের সঙ্গে অভিসার সেরে বাড়ি ফিরেছে, বাইরে থেকে কলিংবেল বাজিয়ে চলেছে অবিরাম, কেউ দরজা খুলছে না। মরিয়া হয়ে দরজায় জোর ধাক্কা দিতেই দরজা হাট। ড্রয়িংরুমের সোফায় গুলি খেয়ে পড়ে আছে নায়িকার স্বামী। এমন রুদ্ধশ্বাস সময়ে শ্রাবণীর বায়না ধীমানের কানে যাওয়ার কথা নয়।

গেলও না। কিন্তু তাতার ছাড়বার পাত্র নয়। কদিন আগেও তাকে সকাল সকাল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত শ্রাবণী, আজকাল সে বাবা-মার সঙ্গে খাবার টেবিলে বসবেই। আগে খাওয়া হয়ে গেলেও। সে ধীমানের হাত ধরে ঝাঁকাল,—হ্যাঁ বাবা, চলো না।

টিভি থেকে চোখ সরল না ধীমানের,—কোথায় যাবি?

—ওই যে মা বলল কোথাও একটা বেড়িয়ে আসি!

পর্দায় পুলিশ। দৃশ্য স্থির হয়ে গেল। নাম দেখানো চলছে। আজকের মতো কাহিনি শেষ।

ধীমানের চোখ তাতারের দিকে ফিরল এতক্ষণে,—কোথায় যাবি বলছিলি?

তাতারের আগে শ্রাবণীই উত্তর দিল,—কাছাকাছি কোথাও। দু'তিন দিনের জন্যে। অনেক দিন তো বাইরে বেরনো হয়নি।

—আমি কি করে যাব? এখন আমার ছুটি কোথায়?

শ্রাবণী তাতারকে আগেই উস্কে রেখেছিল। এবার ছেলেকে চোখে ইশারা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাতারের ভুরু জড়ো,—কেন বাবা, সামনের সপ্তাহে ফ্রাইডে স্যাটারডে তো ছুটি আছে?

আছে। তবে ওই তিন দিনের জন্য অন্য প্ল্যানও ভাঁজা আছে ধীমানের। সে নরম করে ছেলের মাথায় হাত রাখল,—আমার যে ওই সময় একটা অফিস ট্যুর আছে তাতার।

—নাআআ। তুমি ট্যুরে যাবে না। আমরা বেড়াতে যাব।

—তা হয় না তাতার। জেদ কোরো না।

তাতারের মুখ এইটুকু হয়ে গেল। বাবার সামান্যতম প্রত্যাখ্যানেও চোখে জল এসে যায় তার। ঠোঁট ফুলে ওঠে।

ধীমানও ছেলের সম্পর্কে খুবই স্পর্শকাতর। একটু দুর্বলই হয়ে পড়ল সে। তারই মতো জেদি হয়েছে ছেলেটা। অভিমানী। বাপ কা বেটা। ধীমান কাছে টানল ছেলেকে,—ওমনি চোখ দিয়ে লেবুর জল পড়া শুরু হল তো! আচ্ছা বাবা আচ্ছা, দরকার হলে আমি অফিসট্যুর ক্যানসেল করব।

—ঠিক তো?

—ঠিক। ওয়াদা।

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের ভঙ্গিতে হাতে হাত মেলাল বাপ-ছেলে। শ্রাবণী টেবিল থেকে মাছ-তরকারির বাটি ফ্রিজে ঢোকাচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের বোতল খুলে ঢকঢক জল খেয়ে নিল খানিকটা। তার ঠোঁটের কোণে চাপা বিজয়ের হাসি।

ধীমান বেসিনে হাত ধুয়ে টিভির সামনে এসে দাঁড়াল। ইংরিজি খবর চলছে। নব ঘুরিয়ে কেবলে নাচগানের চ্যানেল বার করল একটা। তারপর সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে,—তাহলে দু দিনের জন্য দীঘা ঘুরে আসা যাক, কী বলো?

শ্রাবণীর হাসিতে হাল্কা ব্যঙ্গ মিশল,—মন্দ কী! তবে দীঘার ভিড়ে না গিয়ে গড়িয়াহাটে গেলেও হয়...শ্যামবাজারেও যেতে পারো। সামান্য নিবল ধীমান,—অ, দীঘা পছন্দ নয়? তা হলে তাতার তুমিই বলো কোথায় যাবে?

তাতার কলকাতার বাইরে যে কোনও জায়গায় যেতে পারলেই খুশি। সব অদেখা জায়গাই তার কল্পনায় দারুণ রোমাঞ্চকর। তা সে দার্জিলিংই হোক, কি লক্ষ্মীকান্তপুর। সে বাবার কোলের কাছে বাবু হয়ে বসল,—বাবা, সুন্দরবন যাবে? আমাদের ক্লাসের স্বপ্নজিৎ গেছিল। লঞ্চে করে।

—গেলে হয়। কীসব কুমির প্রকল্প-টকল্প আছে।

শ্রাবণী রান্নাঘর বন্ধ করে ব্যালকনির দরজা লক করছিল, বলল,—না না, জ্যৈষ্ঠ মাসে সুন্দরবন যেতে হবে না। এলোমেলো ঝড় উঠবে। দ্যাখোনি গত সপ্তাহে একটা নৌকোডুবি হয়েছে!...

—তা হলে মায়াপুর চলো। মায়াপুর, নবদ্বীপ...

শ্রাবণী এমন অদ্ভুতভাবে ধীমানের দিকে তাকাল যেন এমন হাস্যকর কথা পৃথিবীতে কেউ কোনওদিন বলেনি। ধীমান মনে মনে উষ্মা বোধ করছিল। ধীমানের কোনো কথায় কোনো কাজে কখনও পুরোপুরি খুশি হতে দেখল না শ্রাবণীকে। রান্নার প্রশংসা করলেও নয়, বিবাহবার্ষিকীতে বিদেশি পারফিউম এনে দিলেও নয়, পুজোতে দামি শাড়ি কিনে দিলেও নয়। গত পুজোয় একটা শকিং পিঙ্ক কাঞ্জিভরম এনে দিল, তাতেও কোনো খুশির হিল্লোল নেই! বাইশশো টাকা দাম জানা সত্ত্বেও! দিব্যি ঠাণ্ডা গলায় বলে দিল,—এত দামি শাড়ি কিনতে গেলে কেন? আমি আর

বেরোই কোথায়?

অসহ্য! অসহ্য। অসহ্য লাগে ধীমানের। চেপে চেপে অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাল ধীমান।

অন্য দিন এ সময়ে তাতারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে থাকে, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। তাতারকে সোফা থেকে ওঠাল শ্রাবণী,—চলো, শুয়ে পড়বে চলো। মনে রেখো তোমার স্কুলের টাস্ক শেষ হয়নি, কাল আগে আগে ঘুম থেকে উঠে সব সাম্‌স করে নিতে হবে।

তাতার মার সঙ্গে বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। তার যত বায়নাক্কা ধীমানের কাছে। যেতে যেতেও সে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—তা হলে কোথায় যাচ্ছি বাবা?

শ্রাবণী শান্ত স্বরে বলল,—সে যাব একটা কোথাও। নতুন জায়গায়।

মাথাটা টিপটিপ করছিল ধীমানের। ভেঁজে রাখা প্ল্যান পুরো চৌপাট! ভাগ্যিস কিছু ফাইনাল করে ফেলেনি! যাক গে, একবার নয় বউছেলেকে নিয়েই ঘুরে এল।

ছেলে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রাবণী টিভি কমিয়ে দিয়ে গেছে, শব্দ এখন এত কম যে মনে হয় আলগা ভাসছে গানটা। ভাসন্ত সুরে দুলছে লাস্যময়ী যুবতী। ধীমান সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক বার বার। ছুটিটা মারা গেল! ছুটিটা মারা গেল! ছুটিটা মারা গেল!

শোওয়ার ঘরের দরজা আস্তে টেনে শ্রাবণী ফিরেছে ধীমানের কাছে। ধীমান সামান্য অবাক। ছেলেকে শোওয়াতে গিয়ে শ্রাবণী সাধারণত আর ফেরে না, নিজেও শুয়ে পড়ে। আর শুলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছেলে আঁকড়ে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ধীমান প্রশ্ন করল,—কিছু বলবে?

শ্রাবণী সোফায় হেলান দিল,—তাড়া নেই। তোমার নাচগান শেষ হোক।

শব্দহীন বসে আছে দুজনে। এক মিনিট। দু মিনিট। পাঁচ মিনিট। শ্রাবণী বুঝি এভাবেই বসে থাকতে পারবে অনন্তকাল। ধীমান ক্রমশ চাপ অনুভব করছিল। চোরা মানসিক চাপ। অধৈর্য পায়ে নিজেই গিয়ে টিভি বন্ধ করে এল,—বোর কোরো না, বলো কী বলবে!

শ্রাবণী মিটিমিটি হাসছে,—জায়গা ঠিক করে উঠতে পারলে না তো?

—বাজে বোকো না। তোমারই তো কোনো জায়গা পছন্দ নয়।

বিরক্তিটা গায়ে মাখল না শ্রাবণী,—আমার একটা জায়গা ঠিক করা আছে।

—কোথায়?

—উঁহু, নাম বলব না। সাসপেন্স। সে একটা দারুণ সাইট। রঞ্জনা আর রঞ্জনার বর গিয়েছিল।

রঞ্জনাকে ধীমান একদম পছন্দ করে না। শ্রাবণীর কলেজের বন্ধু, গাঁকগাঁক করে চেঁচায়, অশ্লীল রসিকতা করে, সব সময় আলুথালু। বরটা ক্যাবলা দি গ্রেট। ওই বউয়ের ভয়ে সারাক্ষণ জুজু হয়ে থাকে।

ধীমান মুখ বেঁকাল,—তোমার রঞ্জনার টেস্ট! ও তো যেখানে কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার পাবে সে জায়গাই ভালো বলবে। কোন জায়গার কথা বলেছে? দেওঘর মধুপুর বুঝি? পেঁড়া, মুর্গি, আম...

—না গো না। এই গরমে কেউ ওদিকে বেড়াতে যায়।

ধীমান মনে মনে বলল, ওই ধুমসিটা সব পারে। মুখে বলল,—হেহ্, ও যেখানে বলবে সেখানেই যেতে হবে। ওকে বোলো আগে শাড়িজামা ভালো করে পরতে শিখুক, নিজের বপু সামলাতে শিখুক, তার পর লোকজনকে...

—ওভাবে বলছ কেন? থাইরয়েডের প্রবলেম, একটু মোটা হয়ে গেছে। শরীর হাঁসফাঁস করে বলেই না...

—ওর থাইরয়েড পিটুইটারি অ্যাড্রিনালিন সব কিছুর গণ্ডগোল আছে।

—আছে তো আছে। শ্রাবণী উত্তেজিত হতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে, —তুমি এবার বেড়ানোর জায়গা, বুকিং সব কিছুর ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।

—যা ইচ্ছে করো। শুধু মনে রেখো শুক্র শনি রবি—তার বেশি নয়। সোমবার আমাকে অফিস যেতেই হবে।

ধীমান হুমহাম করে বাথরুমে ঢুকে গেল। দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা শোওয়ার ঘর। সব দরজাই হাঁ-হাঁ।

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল শ্রাবণীর বুক থেকে। লোকটা বাথরুমের আলোও নেবায় না। ঘরে ঢোকার আগে শ্রাবণীর কান্না পাচ্ছিল। বেডল্যাম্পের নীলচে আলোয় ঘরটা যেন এক আধোঅন্ধকার গুহা। আদিম। ভয়াল।

বিছানা ছাড়ার পর থেকে নানা ফরমায়েশে মশগুল থাকে ধীমান। মুখ ফুটে বলার দরকার নেই, মনে মনে ভাবলেই যথেষ্ট। হাতের কাছে সব হাজির। অন্তত তিন কাপ চা। হাল্কা কিছু পছন্দসই ব্রেকফাস্ট। বাজার এনে ফেলতে না ফেলতেই সামনে শেভিংসেট। সাড়ে ন'টার মধ্যে ভাত। নিখুঁত নিভাঁজ প্যান্টশার্ট। ঘামের গন্ধহীন মোজা। প্রতিদিন আলাদা আলাদা রুমাল। এত নিঃশব্দে ধীমানের হাতে পৌঁছে যায় সব কিছু যে সেখানে শ্রাবণীর অস্তিত্বটা পৃথক করে টেরই পাওয়া যায় না। বাতাসের মতো শ্রাবণী যেন ছড়িয়ে আছে গোটা সংসারে। অবয়বহীন, কিন্তু আছে। ধীমান ছাড়াও সংসারে তার কাজ কম নয়। ছেলের পড়াশুনো। বইখাতা গোছানো। নটার মধ্যে ছেলেকে স্কুলের জন্য তৈরি করা। ছেলের টিফিন। কাজের লোকের সঙ্গে

ক্রমাগত লেগে থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি সামলানো। রান্নাবান্না। সব মিলিয়ে সংসারটাকে তেলমোবিল খাওয়া এক মসৃণ যন্ত্রের মতো চালানো। দেখলে মনে হয় যন্ত্রটা কেউ চালাচ্ছে না, নিজে-নিজেই চলছে যন্ত্র।

এত হুড়োহুড়ির মধ্যে সকালে কথাটা আর উঠলই না। অফিসে গিয়ে বেড়ানোর প্রসঙ্গটা বেমালুম ভুলে গেল ধীমান। সে একটা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝারি মাপের অফিসার, সকালে যথেষ্ট কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে, বিকেলের দিকে একটু স্বাধীনভাবে হাত-পা মেলার সুযোগ পায়। সেই সময়ে হয়তো মনে পড়ত কিন্তু আজ একটা বিশ্রী ঝামেলায় ফেঁসে গেল। চারটে নাগাদ ফ্যাক্টরি থেকে জরুরি মেসেজ। তারাতলার কারখানায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। জি-এম-এর অর্ডার, ধীমান শুড ট্যাকল দা সিচুয়েশন। ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখল সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। ক্রেনওয়্যার ছিঁড়ে দুজন শ্রমিক প্রচণ্ড আহত। তাদের নিয়ে তক্ষুনি হাসপাতালে দৌড়নো, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পুলিশের হ্যাপা সামলানো সব সেরে বাড়ি ফিরল ন'টার পরে। তখন আর ধীমান ধীমানে নেই।

তাতার ঘরে বসে কমিকস পড়ছিল, বাবাকে দেখে ছুটে এসেছে ড্রয়িংস্পেসে,—সব ঠিক হয়ে গেছে বাবা। ফাইনাল।

ধীমানের শরীর সোফায় এলানো। শ্রান্ত মগজ কোনও শব্দই গ্রহণ করেনি।

শ্রাবণী টেবিলে ঠাণ্ডা জল রাখল,—আহ তাতার, বাবাকে রেস্ট নিতে দাও।

এক চুমুকে জলটুকু শেষ করল ধীমান। বুকের দু'তিনটে বোতাম খুলে দিল। আড়মোড়া ভাঙল,—বাবা আজ এসেছিল?

—হ্যাঁ, বিকেলে। তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলেন।

—আমাকে দিয়ে কী হবে? আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়েছে?

—হয়েছে। সামনের বুধবারের পরের বুধবার। শ্রাবণী সামান্য ইতস্তত করল,—বাবা বোধহয় আরও কিছু বলতে চাইছিলেন।

—কী আর বলবে? ধীমান কাঁধ ঝাঁকাল,—টাকা।...ছোট ছেলের নতুন চাকরি...জমানো টাকা নেই... তুই বড় ভাই... একমাত্র বোনের বিয়ে... আমি বুড়ো মানুষ কত দিক সামলাব...।

—কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। শ্রাবণী টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিল,—আলাদা থাকলেও কিছু দায়দায়িত্ব তো রয়েই যায়।

দায়দায়িত্ব না হাতি! শালা বড় হয়ে ফেঁসে যাওয়া! ধীমান মনে মনে গজগজ করল, মুখে বলল,—রোজগার তো করতে হয় না, বুঝবে কী করে কত ধানে কত চাল!

তাতারের এত কূটকচালি পছন্দ হচ্ছিল না, অস্থির ভাবে বলল,—বাবা, আমার কথা শোনো। বাবা... ও বাবা...

তাতারকে কোলে টানল ধীমান,—কী বাবা?

বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল তাতার,—মা জায়গা ঠিক করে ফেলেছে।

ধীমান চোখ নাচাল,—কোথায়? পৃথিবীর ভিতরে তো?

—উ-ড়িষ্যা।

—দু'দিনের জন্য উড়িষ্যা। তোর মা পারেও বটে। তা উড়িষ্যার কোথায়? সিমলিপাল? কেওনঝাড়? না একদম চিল্কা?

বিদ্রূপটা বুঝল না তাতার। সমান উৎসাহে বলে চলেছে,—হল না। হল না। তুমি ফেল। বলতে বলতে দৌড়ে ঘর থেকে একটা হলুদ কাগজ নিয়ে এসেছে, —এই দ্যাখো হোটেলের বুকিং।

ছেলের হাত থেকে অলস মুখে কাগজটা নিল ধীমান। ভাঁজ খুলতেই সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। সমস্ত স্নায়ু মুহূর্তের জন্য বিকল। নিশ্বাস বন্ধ। লাল লাল লেখাগুলো চোখের সামনে কাঁপছে আগুনের শিখা হয়ে।

ক্যাসুরিনা হলিডে রিসর্ট। চাঁদিপুর।

দুই

প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ। গাঢ় সবুজ। কালচে সবুজ। ফিকে সবুজ। সার সার বেঁটে বেঁটে নারকেল গাছ। আম জাম পেয়ারা কাঁঠাল কাজু। কেয়াঝোপ। ডানদিকে বড় একটা দিঘি। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু খড়েছাওয়া কুঁড়েঘর। লাল মোরাম বিছোনো সরু সরু রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে এক-একটা কুঁড়েঘরের দিকে। গাছ আর আগাছায় গোটা চত্বর জুড়ে হাল্কা অরণ্যের আভাস।

তাতার খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল,—কোন কুঁড়েঘরটায় আমরা থাকব গো বাবা?

ধীমান অটোরিকশার ভাড়া মেটাচ্ছিল, আলগোছে ছেলের চুল ঘেঁটে দিল,— তোর কোন কটেজটা পছন্দ?

কটেজ শব্দটা ঠিক মনঃপূত হল না তাতারের। সে এখানে কুঁড়েঘরেই থাকতে এসেছে। পালক পালক ভুরু তুলে প্রশ্ন করল,—কুঁড়েঘরের ওয়াল তো মাটি দিয়ে তৈরি হয়, না বাবা? ঝাঁপ থাকে? দাওয়া থাকে?

—ওরেব্বাস! তুই এসব কথা শিখলি কোথথেকে! ঝাঁপ! দাওয়া!

—গোপালের মা বলে তো।

শ্রাবণী আলতোভাবে শাড়ির আঁচল-কুঁচি ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল, মৃদু শাসন করল ছেলেকে,—গোপালের মা নয়, সুমতিমাসি বলো।

মায়ের শাসনে তাতারের উচ্ছ্বাস কমল না, ধীমানের হাত চেপে ধরেছে সে,—কুঁড়েঘরে নাকি বাথরুম থাকে না বাবা? মাঠে পটি করতে হয়?

বাইরে থেকে দেখে যেমন লাগে ঘরগুলোর ভিতরটা মোটেই সেরকম নয়। প্রতিটি ঘরই পাকা, রঙটাই যা মেটে। ঘরে লাইট ফ্যান ইংলিশ খাট ওয়ার্ড্রোব ড্রেসিংটেবিল সব নাগরিক সাজসজ্জাই আছে। অ্যাটাচড্ বাথও।

খোলসটাই গ্রাম্য শুধু। শৌখিন গ্রাম্যতা। ধীমান জানে।

যা জানে সব কিছুই কি সবসময় বলে ফেলা যায়? ধীমান আড়চোখে শ্রাবণীকে দেখে নিল। সামান্য তফাতে সরে জংলাঝোপের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র খোঁজার চেষ্টা করছে শ্রাবণী। কটেজগুলোর পিছনে ঝাউবন। তারপরেই সমুদ্র। সমুদ্র এত কাছে তবু তার স্বর স্পষ্ট নয় এখন। খুব ক্ষীণ এক ধ্বনি শুধু কানে আসে। ওটা কি সমুদ্রের স্বর? নাকি ধীমানের নিজেরই নিশ্বাসের আওয়াজ? গাঢ়, কিন্তু চাপা!

রোগা লম্বা এক উর্দিপরা বেয়ারা এগিয়ে আসছে। নকুল।

ধীমান তাড়াতাড়ি নিজেকে সপ্রতিভ করে নিল,—কী গো ভাই, আমার ছেলে জিজ্ঞেস করছে তোমাদের এখানে কটেজে বাথরুম-টাথরুম আছে তো?

নকুলের চকচকে কালো মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ধীমানের ইঙ্গিত সে বুঝে গেছে। দেঁতো হাসিতে ভরিয়ে ফেলল মুখ,—নিশ্চয়ই আছে স্যার। আপনাদের কত নম্বর কটেজ?

—দাঁড়াও, মেমসাহেব জানে। ধীমান ডাকল শ্রাবণীকে,—এই বুকিংস্লিপটা দাও তো, অফিসের এন্ট্রিগুলো সেরে আসি।

অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধীমান আরেকবার পিছন ফিরল। না, শ্রাবণীরা এদিকে আসছে না। তাতার পৌঁছে গেছে মার কাছে, ছেলের হাত ধরে পায়ে পায়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে শ্রাবণী। চড়া রোদ্দুর মাথায় করে। অফিসরুমে ঢুকে ধীমানের দ্বিতীয় বার পা কেঁপে গেল। কাউন্টারে সেই ফর্সা মোটা গোঁফঅলা লোকটা! অরুণ না বরুণ কী যেন নাম। লোকটা মাথা নীচু করে একমনে ক্যালকুলেটার টিপে যাচ্ছে।

ধীমান গলাখাঁকারি দিল,—এক্সকিউজ মি। একটা বুকিং ছিল। ধীমান বাসু অ্যান্ড ফ্যামিলি।

লোকটা মুখ তুলল,—আসুন স্যার আসুন। ওয়েলকাম টু আওয়ার রিসর্ট।

বুকিং স্লিপ দেখার সময় একটু কি চমকে উঠল লোকটা? কপালে ভাঁজ পড়ল? পেশাদার ভঙ্গিতে জাবদা রেজিস্টার এগিয়ে দিয়েছে সামনে,—ফিলআপ করুন স্যার।...এই নকুল, বারো নম্বর রেডি আছে তো? লাগেজ পৌঁছে দিয়ে আয়।

ধীমান বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটা শ্যেনদৃষ্টিতে ধীমানের লেখা দেখছে। ধীমান বাসু, মেল, এজ থার্টি সিক্স। শ্রাবণী বাসু, ফিমেল, এজ থার্টিটু।

অর্চিষ্মান বাসু, চাইল্ড, এজ সিক্স।

কপাল! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত বেড়ানোর জায়গা থাকতে এই চাঁদিপুরই পছন্দ হল শ্রাবণীর। কী কুক্ষণেই যে ওই মুটকি রঞ্জনাটা বর নিয়ে থেকে গেছে এই রিসর্টেই। শুধু কি থাকা! ফিরে গিয়ে এমন ব্রেনওয়াশ করেছে বন্ধুর যে নাচতে নাচতে সে একেবারে টিকিট কেটে ফেলল। ধীমান বাধা দেওয়ার অবকাশটুকুও পেল না। মার মুখে শুনে শুনে ছেলেরও বায়না, কুঁড়েঘরে থাকব বাবা, কুঁড়েঘরে থাকব বাবা! ধীমান করবেটা কী? সে তো আর চিৎকার করে বউ-বাচ্চাকে বলতে পারে না, ওখানে তোমাদের নিয়ে যাওয়া যায় না! ওই সমুদ্রটুকু আমাদের—আমার আর দোলনের!

বেজার মুখে খাতা ঘুরিয়ে দিল ধীমান,—ঘরে দুটো চা পাঠিয়ে দেবেন তো।

—এই গরমে চা খাবেন স্যার? বলেন তো ডাব পাঠিয়ে দিই, কচি দেখে। লোকটা গলা নামাল,—আপনি তো স্যার ডাবই...

—বল্লাম তো চা। ধীমান ঈষৎ রূঢ়।

দোলন চা খায় না। প্রত্যেকবার এখানে এসে প্রথমেই ডাবের অর্ডার করে থাকে ধীমান। লোকটা ভোলেনি। প্রতিটি বোর্ডারের পছন্দ অপছন্দ নিপুণভাবে জমা রেখে দেয় স্মৃতিতে। এদের বেশি পাত্তা না দেওয়াই ভালো। ধীমান গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ছোট্ট একটা মাঠের উপর বারো নম্বর কুটির। সামনে কয়েকটা কাজু গাছ। তার পরে একটু ঢালু জমি। তারপরে তারকাঁটার বেড়া। বেড়ার গায়ে ঝাউগাছের সারি। সেখান থেকে খাড়া নেমে গেছে বালুতট। বড় বড় পাথর ফেলে সীমারেখা টানা আছে বালুতটের। জোয়ার এলে সমুদ্র আছড়ে পড়ে পাথরের উপর, ভাঁটায় চলে যায় প্রায় দৃষ্টিসীমার বাইরে।

নকুল ঘর খুলে দিয়ে গেছে। ভিতরে ঢুকতে একটুও ইচ্ছে করছিল না ধীমানের। তার চোখ ঘুরেফিরে প্রান্তসীমার কুটিরটার দিকে চলে যাচ্ছে বার বার। তেরো নম্বর। তেরো নম্বর। ওখানে সমুদ্রের সামনে কোনও ঝাউয়ের আড়াল নেই। সমুদ্র ওখানে সম্পূর্ণ অবারিত। নগ্ননির্জন।

ধীমান সম্মোহিতের মতো তেরো নম্বরের দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের দরজায় তালা, সম্ভবত কোনও বোর্ডার নেই, তাতে কিছু যায় আসে না ধীমানের। তার কাছে ঘরটা সবসময়ই উন্মুক্ত। ও ঘরের প্রতিটি খাঁজ, দাগ, কোণ অনুকোণ বড় বেশি চেনা। মুখস্থ। দোলনের শরীর—যেমন, দোলনের নির্লোম ফর্সা দুটো পা। দরজার দু'পাশে দুটো সিঙ্গলবেড খাট। ডানদিকের খাটের পায়ের কাছে বাহারি ড্রেসিংটেবিল। ছোট্ট সুন্দর টুল। দোলনের ডান উরুতে কালচে বাদামী জড়ুল। বাঁ দিকের কোণে দেওয়াল আলমারি। বাঁ হাঁটুতে ছোটবেলার কাটা দাগ। মাঝের

দেওয়ালে চেয়ার টেবিল, টেবিলে নীল জগ, কাচের গ্লাস, সোনালি অ্যাশট্রে। দোলনের পিঠে পর পর তিনটে লাল তিল। দু খাটের মধ্যিখানে সরু লম্বা চটের কার্পেট। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা দোলনের শিরদাঁড়ায় রহস্যময় গভীর খাঁজ। চোখ বুজে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করে যেতে পারে ধীমান। দেওয়ালে ফুলহাতে হাস্যময়ী জাপানি তরুণী। বাথরুমের শাওয়ারে গোলাপি ঝাঁঝরি। দোলনের গালের টোল—সব, সব কিছু। দোলনের গালের টোল ইদানীং অনেকটা ভরে এসেছে। সম্প্রতি চশমা নেওয়ার পর মুখটা একটু অন্যরকম। শাওয়ারের ঝাঁঝরির রং কি বদলেছে? গোলাপি থেকে শ্যাওলাসবুজ? অথবা গাঢ় নীল?

মনে হয় না। দু'বছরে এই রিসর্টের কোনো কিছুই তেমন বদলাতে দেখেনি ধীমান। ভিতরে—বাইরেও। সামনের কাঁটাতারের বেড়াটা প্রথম দিনের মতোই ভাঙা ভাঙা। একটা জায়গায় তো পুরো খুলে পড়েছে। ওই কাঁটাতারের ফাঁক দিয়েই প্রথমবার সমুদ্রে নেমেছিল দোলন। লাফিয়ে পাথরে নামতে গিয়ে পা কেটে গিয়েছিল অনেকটা। হয়তো প্রথমবার বলেই।

ধীমান খুব চোটপাট করেছিল ম্যানেজারের ওপর,—তারকাঁটাটা আপনারা সারাতে পারেন না? ওটা ঠিকমতো বাঁধা থাকলে লোকজন ওখান দিয়ে নামতেও পারে না, অ্যাক্সিডেন্টের চান্সও কমে যায়।

লোকটা বলেছিল,—এটা কী বললেন স্যার? সমুদ্রে যাওয়ার গেট তো আছেই। সেখান দিয়ে না গিয়ে বাঁকা পথে যাবেনই বা কেন?

তা সত্যি, একটা গেট আছে বটে। কাঠের। সেই গেট ধরেই এখন দাঁড়িয়ে আছে শ্রাবণী। তার শাড়ির আঁচল প্রমত্ত হাওয়ায় পতাকার মতো উড়ছে। শ্রাবণীর পাশে তাতার। তাতারের গা ঘেঁষে একটা সাদাকালো নেড়ি কুকুর। কুকুরটা লেজ নাড়ছিল। জ্যৈষ্ঠের খুনে রোদ্দুরে ঝলসানো ছবির মতো লাগছে দৃশ্যটা।

ধীমান ফিরল। এই ঝাঁঝাঁ রোদে ছেলেটাকে ওভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে! অসুখবিসুখ করে যাবে না! এতটুকু যদি বোধগম্যি থাকে শ্রাবণীর! বারো নম্বরের সামনের ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে গলা চড়াল ধীমান,—তাতার, অ্যাই তাতার, আর রোদ্দুর নয়, চলে এসো।

সমুদ্র বেশ দূরে সরে গেছে। ঢেউয়ের শব্দ প্রায় নেই। আশপাশে মানুষজনও চোখে পড়ে না। বিজন রোদ্দুর পেরিয়ে ধীমানের ডাক সহজেই পৌঁছে গেছে ঝলসানো ছবিটার কাছে। রোদ মাড়িয়ে ফিরছে তাতার। লাফিয়ে লাফিয়ে। পিছনে শ্রাবণী। ধীর।

ধীমানের কাছে এসে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল তাতার। বার বার ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে সমুদ্রের দিকে,—বাবা, আমরা এই সমুদ্রে চান করব?

খড়েছাওয়া বারান্দায় খান-দুই বেতের চেয়ার। একটা ইজিচেয়ারও। ধীমান

ইজিচেয়ারে বসল,—হ্যাঁ, তবে আজ নয়, কাল সকালে।

—কেন? আজ নয় কেন?

—দেখছ না এখন সমুদ্র চলে যাচ্ছে! কাল সকালে বড় বড় পা ফেলে আমাদের কাছে চলে আসবে, তখন নামব আমরা।

—এমা, সমুদ্রের আবার পা থাকে নাকি!

—থাকেই তো। ঢেউগুলোই তো পা।

—তা এখন চলে যাচ্ছে কেন?

—ইচ্ছে। যখন ইচ্ছে কাছে আসবে, যখন ইচ্ছে চলে যাবে।

—কেন? সমুদ্র এরকম কেন?

—বললাম যে ইচ্ছে। মুড।

—তবে যে মা বলল সমুদ্রটা এখানে একটা খাঁড়ির মতো। পাড় ভেঙে ভিতরে চলে এসেছে। জোয়ারে জল বাড়লে এগিয়ে আসে—ভাঁটায় চলে যায়।

খাঁড়ি... জোয়ার ভাঁটা— এভাবে সমুদ্রকে দেখতে অভ্যস্ত নয় ধীমান। তার কাছে সমুদ্র সমুদ্রই। অনন্ত বিশাল আনন্দ। একটা কল্পনা। পায়ের উপমাটা অবশ্য দোলনের। দোলন ধীমানের চেয়েও বেশি কল্পনাপ্রবণ। শ্রাবণীর এতটুকু কল্পনাশক্তি নেই। সব রঙিন কল্পনাকেই শ্রাবণী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তির পাতায় নিয়ে আসতে চায়। বিরস মুখে ছেলেকে কোলে টানল ধীমান,—তোমার মা যা বলেছে সেটাই ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের উৎসাহ বেড়ে গেছে তাতারের,—সমুদ্রের রং এখানে এমন ঘোলা কেন বাবা? সমুদ্রের রং তো নীল হয়?

—এখানেও নীল হয়। শীতকালে। বলতে গিয়েও হোঁচট খেল ধীমান। শ্রাবণী পাশের চেয়ারে বসে আঁচলে ঘাম মুছছে। ধীমান কথাটা ঘুরিয়ে নিল,—সমুদ্র সব জায়গাতেই শীতকালে বেশি নীল।

শ্রাবণী বলল,—আমার কিন্তু বাপু এই সমুদ্রটাই বেশি ভালো লাগছে। নীল সমুদ্র যেন বড় বেশি ছবি-ছবি।

ধীমান সাবধান হয়ে গেছে। খানিকটা তেল দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,—তোমার রঞ্জনার এই একটা টেস্টেরই তারিফ করা যায়। জায়গাটা মার্ভেলাস। বাঁধাধরা হোটেল বিল্ডিং-এ না থেকে সুন্দর আলাদাভাবে থাকা, গিজগিজে ভিড় নেই দীঘা-পুরীর মতো...কী আরাম!

শ্রাবণী ঘরে যাচ্ছিল, দরজায় দাঁড়াল। তরল স্বরে বলল,—না এলে এমন স্বর্গ তুমি মিস করতে তো!

চা এসে গেছে। নকুল নয়, ট্যারা মেঘনাদ পট থেকে চা ঢেলে দিল দুজনকে,—আপনাদের মিলটা বলে দেবেন স্যার?

মেঘনাদের মুখের দিকে তাকাল না ধীমান,—কী পাওয়া যাবে?

—ফিশ, চিকেন...

—আমি চিকেন খাব বাবা।

—তা হলে তিনটে চিকেনই বলে দিই, কী বলো?

শ্রাবণী কাপ হাতে বাইরে এল,—আমি মুর্গি খাব না—মাছ।

জানা কথা। শ্রাবণীর সঙ্গে ছোটখাটো পছন্দগুলোও আর মিলতে চায় না আজকাল। ধীমান যদি মাখন চায়, শ্রাবণী চাইবে জ্যামজেলি। শ্রাবণী দেওয়ালে ক্রিম রং চাইলে, হালকা নীল ভালো লাগতে থাকে ধীমানের। একমাত্র ছেলের সঙ্গেই ধীমানের যা মতের মিল। ওই ছেলের টানেই না শ্রাবণীর সঙ্গে সম্পর্কটা জিইয়ে রাখা।

মেঘনাদ অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল,—খাবার কি রুমেই দিয়ে যাব স্যার?

—কেন? রুমে কেন? তোমাদের ডাইনিং হল আছে না?

—সে তো আছেই। মেঘনাদের মুখ হাসি-হাসি,—অনেকে তো রুমে খাওয়া পছন্দ করে, তাই বলছিলাম।

মেঘনাদের হাসিতে কি বিদ্রূপ? ধীমানের কান-মাথা ঝাঁঝাঁ করে উঠল। শেষে বেয়ারা-বাবুর্চিদের খোঁচাও হজম করতে হবে তাকে! অকারণে রুক্ষ হল ধীমান,

—অনেকে পছন্দ করে পারে, আমরা করি না—বুঝেছ?

মেঘনাদ কথাটা বুঝল, রুক্ষতাটা নয়। একই ভাবে হাসছে,—ক'টা নাগাদ খেতে আসছেন স্যার?

শ্রাবণীর চোখে কৌতুক,— কেন গো? সেই জেনে তবে রান্না বসাবে? আমরা ছাড়া আর কোনো বোর্ডার নেই বুঝি?

—তেমন আর কই? গত হপ্তাতেও সব ফুল ছিল। আজ তিন পাঁচ সাত আট এগারো ছাড়া সব ফাঁকা। কাল অনেকে আসবে।

গুম গুম করে পর পর কয়েকটা চাপা আওয়াজ হল। তাতারের চোখ পলকে গোল গোল,—কীসের শব্দ বাবা? সমুদ্র পাড় ভাঙছে?

—দূর বোকা! শ্রাবণী হেসে ফেলল,—এখানে মিলিটারির গুলিগোলা টেস্ট হয়। ফাঁকা জায়গায় পরীক্ষা করে দেখা হয় কোন গোলা কত দূর যায়!

—আগুন জ্বলে?

—কে জানে! হয়তো জ্বলে—হয়তো জ্বলে না।

শ্রাবণী ঘরে চলে গেল।

তাতার ঢাল বেয়ে নেমে গেছে কাঁটাতারের কাছে। তেরো নম্বরের সামনে। দু'হাতে লগবগে খুঁটিটা ধরে নাড়াচ্ছে প্রাণপণ। একটা কাঠঠোকরা অনেকক্ষণ ধরে একটানা শব্দ বাজিয়ে চলেছে। পাশের ঝাঁকড়া গাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে

পাখিটা। দেখা যায় না তাকে, শুধু শব্দ শোনা যায়—ঠক ঠক ঠক ঠক।

শ্রাবণী ঘরে টুকটাক গোছানোর কাজ সারছে। সাবান শ্যাম্পু তোয়ালে চিরুনি রাখল জায়গামতো। ধীমানের পাজামা-পাঞ্জাবি বিছানার উপর। তাতারের জামাপ্যান্টও। শাড়ি জামা কাঁধে ঝুলিয়ে বারান্দায় এল,—তাতার, চান করবে এসো।

বাবা থাকলে তাতার মা'র কথা কানেই তোলে না।

শ্রাবণী আবার ডাকল,—তাতার....তাতাআর...একটা বাজে, আর হুড়োহুড়ি নয়।

ধীমান ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখছিল। সমুদ্র এখন খুব দ্রুত পিছোচ্ছে। মধ্যাহ্নসূর্যের দাপটে চতুর্দিক কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া। একটানা তাকিয়ে থাকলে ঘোর লেগে যায়। সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোরটা কাটাল ধীমান,—যাও না, নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে এসো না। কাঁটায় হাত-পা কাটবে যে। এই ক'দিন অগে কাচে পা কেটে এল...

—ওমা, তোমার মনে আছে? শ্রাবণী হঠাৎই যেন থমকেছে।

ধীমান চুপ করে গেল। ছেলের কিছু হলে শ্রাবণীকে একাই ছোটাছুটি করতে হয়। সে স্কুলেই হোক আর ডাক্তারখানায়। সে কথাটা আকার ইঙ্গিতে মাঝে মাঝেই ধীমানকে স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রাবণী। ধীমান গায়ে মাখে না। কিন্তু এই মুহূর্তে কথাটা বুঝি একটু বিঁধল তাকে।

পিছনের আট আর সাত কটেজ দুটোতে এক দঙ্গল লোক ফিরেছে কোথ্থেকে। হঠাৎ হইহই কোলাহলে পাশের গাছের কাঠঠোকরাটা চমকে থামল। এতক্ষণের নির্জনতা ছিঁড়ে গেছে।

শ্রাবণী তাতারকে ধরে এনে দাঁড়িয়েছে সামনে,—ওই কটেজটা কী দারুণ, তাই না গো? সামনেটা পুরো ফাঁকা, ঘর আর সমুদ্র, মাঝখানে আর কিছু নেই!

ধীমান প্রাণপণ চেষ্টায় তেরো নম্বরের দিকে উদাস তাকাল,—হুঁ, তবে একটু বেশি ফাঁকা।

—ওটা তো খালি আছে, দ্যাখো না ম্যানেজারকে বলে ওখানে শিফট করা যায় কিনা। রাত্তিরবেলা ভীষণ ভালো লাগবে।

দূরে আবার গোলা পতনের শব্দ। ধীমানের গলা কেঁপে গেল,—না। অত ফাঁকা ভালো না। রাতে সাপখোপ বেরোতে পারে।

·

তিন

দোলনের সঙ্গে ধীমানের পরিচয় তেমন নতুন নয়; আবার খুব পুরনোও নয়। ধীমানদের অফিসের ফ্লোরেই এল আই সি-র একটা ব্রাঞ্চ আছে। সেখানে প্রায়ই আসত দোলন। বছর তিনেক আগে। লিফটে করিডোরে গেটে বেশ কয়েকবার

চোখে পড়েছিল ধীমানের। চোখে পড়ার মতোই চেহারা। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে কিন্তু ভরাট স্বাস্থ্য, স্নিগ্ধ মুখশ্রী, টানা টানা চোখ, মসৃণ ত্বক। বয়স বড়জোর চব্বিশ পঁচিশ। একবার তাকালে দ্বিতীয়বার চোখ চলে যাবেই।

সুযোগ বুঝে একদিন আলাপও করে ফেলল ধীমান,—কিছু মনে করবেন না, আপনাকে প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আপনার কি কোনো পলিসি-টলিসি আটকে আছে?

সুন্দরী মেয়েরা সাধারণত নিজেদের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকে। রাস্তাঘাটের আগ্রহী পুরুষদের সম্পর্কেও। কিন্তু দোলন সেদিন বড় বিষণ্ণ ছিল। অন্যমনস্ক। আপনার মনেই বলে ফেলেছিল,—রোজই এসে ফিরে যাচ্ছি। রোজই কিছু না কিছু নতুন কাগজ চায়।

—ম্যাচিওরড পলিসি?

—না, অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাইল, দিলাম। হসপিটালের কাগজপত্র নিল। এখন বলছে ওসবে হবে না, ওরা নিজেরা মেডিক্যাল বোর্ড বসাবে।

দোলনের স্বরে এমন কান্নার আভাস, নাড়া খেয়ে গিয়েছিল ধীমান। উদ্বিগ্ন মুখে বলেছিল,—আমার এখানে দু'তিনজন চেনা আছে, বলেন তো কথা বলে দেখতে পারি।

—কাজ হবে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত বোধহয় বাবাকে আবার টানাটানি করতেই হবে।

—আপনার বাবা...?

—স্পাইনাল কর্ড ভেঙে গেছে। বাস থেকে পড়ে। দোলনের চোখের কোলে অশ্রুবিন্দু টলটল,—আর কোনোদিন বাবা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

তরঙ্গহীন বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে উদাস তাকাল ধীমান। কেন যে সেদিন সেই অশ্রুবিন্দু দেখে ফেলেছিল সে! না দেখলে হয়তো জীবনের ধারাটা একই খাতে বয়ে যেত। অফিস সংসার স্ত্রী পুত্র একঘেয়ে। ভ্যাদভ্যাদে।

বিকেলে সমুদ্র বহু বহু দূরে সরে গেছে, পড়ে আছে শুধু একটা শান্ত জলস্তর। এখন অগভীর। কোথাও পায়ের চেটোটুকু ডোবে, কোথাও গোড়ালি, কোথাও হাঁটু। দিকহীন বাতাসে জলস্তর কাঁপছে মৃদু মৃদু। ভেজা বালি কখনও পাথরের মতো কঠিন, কখনও বা পিছল কাদা। কিনারার কাছে পর পর কয়েকটা কালো খুঁটি। জলে আধডোবা। খুঁটিতে বসে সমুদ্রকে পাহারা দিচ্ছে গোটাকয়েক স্থির বক। তাদের ডানায় পড়ন্ত সূর্যের আলো। তাতার আর শ্রাবণী হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাতার মাঝে মাঝে লাফিয়ে জলে চলে যাচ্ছে, দৌড়তে দৌড়তে ফিরছে বালিতে। শ্রাবণী কোমর নুইয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছে ক্রমাগত। অসংখ্য ঝিনুক ছড়িয়ে আছে সিক্ত বেলায়।

বড়সড় একটা কালচে কাঁটার কঙ্কাল কুড়িয়ে তাতার দৌড়ে এল,—এটা কী বাবা?

ধীমান ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল,—বোধহয় শঙ্কর মাছ।

—শঙ্কর মাছের তো লম্বা লেজ থাকে, চাবুক হয়?

ধীমান হাসল—চাবুকটা খসে গেছে।

—আমি এটা বাড়ি নিয়ে যাব বাবা।

—ইশশ! ধীমান নাক কোঁচকাল,—পচা গন্ধ বেরোচ্ছে! কটেজে নিয়ে গেলেই পিঁপড়ে লেগে যাবে।

—না, আমি এটা নিয়ে যাব। রোদ্দুরে শুকিয়ে নেব।

কঙ্কালে লেগে থাকা পচাগলা অবশেষ শুধু শুকিয়ে নিলেই শুদ্ধ হয় না, পচা অংশ নির্মম হাতে চেঁছে ফেলে দিতে হয়।

—এটা নিয়ে তুই কী করবি?

—এটা আমা-আর কালেকশান। আমি এটা রং করে একটা ডায়নোসর বানাব। গোল গোল দুটো চোখ, ধারালো মাঝখানটা নাক... তাতার বকবক করে চলেছে তো চলেছেই। ধীমান শুনছিল না। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগছিল ধীমানের। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাতার আর শ্রাবণী ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে এখন তরতাজা। ধীমানই শুতে পারল না একফোঁটা। চোখ বুজলেই সামনে দোলন। তেরো নম্বর ঘর।

ধীমান দাঁড়িয়ে পড়ল,—অ্যাই, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর তো আর কদ্দূর হাঁটতে হবে? ঠ্যাং তো ছিঁড়ে গেল!

তাতার দৌড়তে গিয়ে থমকে গেল। ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে একপাল গোরু নেমে আসছে জনমানবহীন সৈকতে। তাদের গলার ঘন্টি এলোমেলো বেজে উঠল টুংটুং। গোরুগুলোকে সন্তর্পণে পার হল তাতার। মার কাছে পৌঁছেছে। সেখান থেকেই চেঁচাল,—মা বলছে আরও যাবে। মোহনা পর্যন্ত।

রাগে ধীমানের ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সেই চারটে থেকে হাঁটা শুরু হয়েছে, এখন পাঁচটা দশ, কত দূরে মোহনা তার ঠিক নেই, তবু হাঁটতেই হবে! কোথায় এখন সে সমুদ্রের ধারে দোলনের কাঁধে মাথা রেখে বসে থাকবে, তা নয়, এই ট্যাঙোশ ট্যাঙোশ হাঁটা! দোলনের অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল, এবার জঙ্গলে যাওয়ার। কাঁকড়াঝোড়। শাল-মহুয়ার বনে হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাবে দোলন, বড় বড় পাতার ফাঁক দিয়ে শোঁ শোঁ হাওয়া বইবে, শুকনো পাতা মাড়িয়ে শব্দ করে দৌড়বে ধীমান, গাছের আড়াল থেকে তাই দেখে ঝর্না হয়ে দোলন হাসিতে ভেঙে পড়বে। ভাবতেই শরীর জুড়ে রোমাঞ্চ। ওই যে উদ্দেশ্যহীন বাধাবন্ধনহীন দৌড়, তার উত্তেজনা কী তীব্র তা শ্রাবণী কোনোদিনই বুঝবে না।

শ্রাবণী না হয় নেহাতই উত্তাপহীন। মামুলি। এ উত্তেজনার অর্থ ধীমানই কি ছাই পুরোপুরি বোঝে? বুঝলে কি পরিণতিহীন সম্পর্ক টিকে থাকে এতদিন? না, ধীমান নিজেই নিজের চিন্তাটাকে মানতে পারল না। পরিণতি না থাক, সুখ আছে, রহস্য আছে। রহস্যই তো অদৃশ্য তন্তুতে বেঁধে রাখে সম্পর্ককে। রহস্য ছিঁড়ে গেলে পুরুষের কাছে নারী ম্যাড়মেড়ে। জোলো। সেই রহস্য এখনও টিকিয়ে রাখতে পেরেছে দোলন। শ্রাবণী পারেনি। তা ছাড়া দোলনের সংশয়হীন নির্ভরতাকে ধীমান অস্বীকার করবেই বা কী করে? পঙ্গু বাবা, আধপাগলা মা, ছোট ভাইবোন নিয়ে দোলন যখন অকূল পাথারে তখন কে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল? ধীমান—ধীমানই তো! কোনোরকম প্রত্যাশা ছাড়াই। নিজের অফিসের কন্ট্রাক্টরদের ধরে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে দোলনের। ছোট চাকরি তবু পা ফেলে দাঁড়ানোর মাটি তো বটে। দোলনের বাবার নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, ছোটাছুটি করে জীবনবিমার টাকা উদ্ধার করেছে, ভাইবোনেদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে, এসব কি কম কথা! বিনিময়ে সে দোলনের কাছে কিছুই চায়নি। একটু সঙ্গ, একটু বন্ধুত্ব, একচিলতে নীল আকাশ, ব্যস।

ধীমান দোলনকে প্রথম চুমু খেয়েছিল আলাপের ছ'মাস পরে। দোলনদেরই বেহালার বাড়িতে। আগ্রাসী পুরুষের মতো নয়, ভীরু প্রেমিকের মতো। তারও অনেক পরে, প্রায় বছর দেড়েকের মাথায় দোলন বলেছিল,—আমাকে ক'দিনের জন্য একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে? খোলা হাওয়ায়? কোনও ফাঁকা জায়গায়? এই দমবন্ধ পরিবেশে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

ধীমানের শরীরে মাদল বেজে উঠেছিল। তাতার হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে শ্রাবণী তখন শুধুই অভ্যাস। বর্ণহীন স্বাদহীন পানীয় জলের মতো। ছোট ছোট কামনাবাসনাগুলোই বা শ্রাবণীর কাছ থেকে সেভাবে মেটে কই। তবু ধীমান মাথা হারায়নি,—আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিণাম জানো?

—জানি। দোলন জোরে শ্বাস নিয়েছিল,—তুমি আমাকে গপ করে খেয়ে ফেলবে।

—তার পর? ধীমানের রক্তে লক্ষ পিঁপড়ের ওঠানামা।

—তার আর পর নেই। আমি অত ভাবতে পারি না। ভাবতে হয় তুমি ভাবো।

—তোমার বাবা-মা কী মনে করবে? ভাইবোনেরা?

—তাদের তো তুমি কবেই গিলে বসে আছ। তুমি তাদের কাছে ভগবানের মানুষ এডিশান। অবতার নাম্বার এগারো।

তখনই চাঁদিপুর। প্রথমবার। শরীর শরীরের স্বাদ পেলে আর কি তাকে বেঁধে রাখা যায়? দু'একবার লুকিয়েচুরিয়ে ডায়মন্ডহারবার, ফুলেশ্বরের বাংলো। অথবা কলকাতারই কোনও হোটেলের নিভৃতি। আর বার বার এই চাঁদিপুর। ওই বাঁধাধরা

তেরো নম্বর কটেজ। একটু সময় কুড়িয়ে পেলেই শান্ত নির্জন ওই একটেরে কুটিরটা কী যে ভয়ঙ্করভাবে টানে ধীমানকে। রাত বাড়লেই ওই কুটির ক্রমশ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মায়াবী হয়ে ওঠে। একটানা সমুদ্রের ডাক, ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ আর নোনতা বাষ্প চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে উড়তে থাকে কুটিরের চারপাশে।

দোলন বলে,—তুমি কিন্তু এই কটেজটাতে অবসেসড হয়ে যাচ্ছ।

দোলনের আর্দ্র মুখ থেকে নুনটুকু মুছে নেয় ধীমান,—তুমি এখানে জোরে নিশ্বাস নাও, একটা অন্য পৃথিবীর গন্ধ পাবে।

দোলন খিলখিল হাসে, শ্বাস টানে জোর জোর,—পাচ্ছি। আঁশটে গন্ধ।

—আরও জোরে নিশ্বাস নাও।

—পাচ্ছি। ঘামের গন্ধ।

—আরও জোরে।

শ্বাস টানতে গিয়ে দোলনের শরীর বেলুনের মতো ফুলে ওঠে,—পাচ্ছি। বিপদের গন্ধ।

—বিপদ কীসের?

—কটেজ নাম্বারটা মনে রেখো মশাই, আনলাকি থার্টিন।

শ্রাবণী দূর থেকে হাত নেড়ে ডাকছে ধীমানকে।

ধীমান গলা ফাটিয়ে চেঁচাল,—কীইই?

হু-হু বাতাস ছুটে আসছে সাগর থেকে। বাঁ দিকের ঝাউবনে আছড়ে পড়ে ঢেউয়ের মতো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। ভাঙা বাতাস টলমল করছে পাড়ে। বাতাসের ওপার থেকে শ্রাবণীর গলা শুনতে পেল না ধীমান। শ্রাবণী-তাতার একটা বাঁকের আড়ালে উধাও। দীর্ঘ পথ ফুরিয়ে এল। সমুদ্রকে পাশে রেখে সামনে এখন বিশাল চওড়া এক চর। অন্য ধারে ছোট ছোট বালিয়াড়ি। ঝাউবন দূরে সরে গেছে। আরও সামনে চরের বুকে রুপোলি পাতের মতো শুয়ে আছে বুড়িবালাম।

এদিকটা ধীমান আগে কোনোবার আসেনি। আসার সময়ই হয়নি। যখন বাইরে সমুদ্র, ঘরে সমুদ্র তখন কে ছোটে মোহনা খুঁজতে? আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁকটুকু পেরোতেই ধীমান সম্পূর্ণ স্থাণুবৎ। বালির বুকে যত দূর চোখ যায় শুধু লাল ফুলের বাগিচা। ফুল নয়, কাঁকড়া। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে লাল কাঁকড়া ফুল হয়ে ফুটে আছে বালির বুকে।

ধীমান মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। এত হেঁটেও তাতারের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়নি, সে এক বিচিত্র খেলায় মেতে উঠেছে। কাঁকড়াগুলোর দিকে এক পা এগোয়, সামনের এক রাশ লাল ফুল বালিতে মিলিয়ে যায়। আবার এক পা এগোল, আরেকটা ঝাঁক নেই। আরেক পা এগোতে পিছনের ফুলেরা আবার ফুট ফুট ফুটেছে বালিতে, সামনের লাল ফুল মুখ লুকোল। তাতার যেদিকে ছোটে মিলিয়ে যায়

রক্তকুসুম, অন্যদিকে জেগে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে।

পলকের জন্য ধীমানের বুক কেঁপে উঠল। কাদের ওভাবে তাড়া করে বেড়ায় তাতার? কাঁকড়া? নাকি মনেরই কয়েকশো কোটি সুপ্ত কামনা বাসনা? সামান্য বিপদের গন্ধ পেয়েই আড়ালে লুকোয়? সুযোগ পেলেই আচ্ছন্ন করে রাখে গোটা মনকে?

দূর দূর! কামনা-বাসনা যদি না-ই থাকে তবে এই জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মানে কী! এক জায়গায় বাসনারা চাপা পড়ে গেলে অন্যত্র তো ফুটে বেরোবেই। এত ভয়, এত বুক-ধুকপুকুনিই বা কীসের! একজনকেই সারাজীবন ভালোবেসে যেতে হবে এমন দাসখত কোথাও লিখে দেয়নি ধীমান। মানুষের মনকে অত নিয়মে বাঁধাও যায় না। শ্রাবণীকে সে বঞ্চিত করেনি। পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে, সামাজিক অঙ্গীকার পালন করে চলেছে। তার পরেও যদি তার মনে আরেক নারীকে ভালোবাসার মতো জায়গা থাকে, সেটা তার অপরাধ নয়, হৃদয়ের বিশালতা। দু'হাত ছড়িয়ে ধীমান শরীরের আড় ভাঙল। মনেরও। ক্লান্ত পা দুটোকে সতেজ করতে থেবড়ে বসে পড়ল বালিতে।

শ্রাবণী ছেলেকে ডাকল,—আর গায়ে বালি মাখতে হবে না, এসো, এবার ফিরব।

ধীমান অসহিষ্ণু মুখে বলে উঠল,—আমার আর ক্ষমতা নেই, আমি হেঁটে ফিরতে পারব না।

শ্রাবণীও অবসন্ন। ধীমানের কথা লুফে নিল সে,—ওই পাশে তো আলো দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে রিকশা-টিকশা পাওয়া যাবে না?

—শখ করে এসেছ, এবার ঠেলাটা বোঝো। শ্রাবণীর অসহায় স্বরে ধীমান একটু মজাই পেল। সে জানে পিছনে একটা বাজার আছে। মাছের আড়তও। একবার সন্ধেবেলা দোলনকে নিয়ে অটোরিকশা করে বাজারটায় এসেছিল চিংড়িমাছ কিনতে। নিজে থেকেই একটু বেপরোয়া হল ধীমান,—চলো, ওই বাজারে অটো পাওয়া যাবে। পরক্ষণেই ঢোঁক গিলেছে,—ম্যানেজার বলছিল।

ফেরার পথে বাবা-মা'র মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে তাতার। অন্ধকারে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে টলতে টলতে যাচ্ছে অটোরিকশা, হেডলাইটের আলোয় যেটুকু আলোকিত হয় সেটুকু রাস্তাই দেখতে পাচ্ছিল ধীমান। দু' ধারে ঘন কালো কেয়াঝোপ। বাজারের আঁশটে গন্ধ এখনও তাড়া করে আসছে গাড়িটাকে। দূরে বড় বরফ কারখানাটার আলো ঝলমল করে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করল ধীমান। পারছে না। দমকা হাওয়ায় আগুন জ্বলেই নিভে যায়। পর পর কয়েকটা কাঠি নষ্ট হল। তবু চেষ্টা করছে ধীমান।

সিটে মাথা ঠেকিয়ে শ্রাবণী চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ বলে উঠল,—তোমার

সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

ধীমানের হাত থেকে দেশলাইটা খসে পড়ে গেল। শ্রাবণী দেখেও দেখল না। তার চোখ বাইরে স্থির। রুপোলি নদী অন্ধকারে আবার ফিরে এসেছে পাশে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে। মাঝে মাঝে নদীতে আলোর বিচ্ছুরণ। নদীজলে থইথই রুপোলি পাত এখন দুঃখী। ছলছল।

শ্রাবণী নদী দেখছিল।

চার

সাত নম্বর কটেজের সামনে রাতের আসর জমজমাট। দুই মেয়েজামাই বাপ-মা দু'তিনটে গুঁড়ি গুঁড়ি বাচ্চা কিচমিচ করে চলেছে সমানে। তাদের সঙ্গে শ্রাবণীও। শ্রাবণীকে পাকড়াও করে বয়স্ক ভদ্রলোক হাত-পা নেড়ে কীসব বলছে, সকলে হেসে খুন। মত্ত বাতাস ঝিম মেরেছে সহসা। সঙ্গে সঙ্গে একটা সামুদ্রিক গরম ঝাঁঝিয়ে উঠেছে। ভ্যাপসা। চিটচিটে।

ধীমান বারান্দায় বসে ঘামছিল। যতটা না গরমে তার চেয়েও বেশি পরিশ্রমে। তাতার একবার ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগায় কার সাধ্যি। ওই ছেলেকে কোলে করে ঘরে ফেরা, টানতে টানতে তাকে ডাইনিংহলে নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে কাঁধে করে এনে বিছানায় ফেলা—বাপ্‌স! তাতার কি আর আগের মতো ছোট্টটি আছে যে ধীমান তাকে নিয়ে অবলীলায় ঘুরে বেড়াবে।

ধীমান সামনের ঘাসে ইজিচেয়ারটা নামিয়ে নিল। অদূরে কালিমাখা ভূতের মতো নিঝুম দাঁড়িয়ে তেরো নম্বর কুটির। সেদিক থেকে জোর করে মুখ ফেরাল ধীমান। একটা সিগারেট ধরাল। শরীরমন সহজ করতে চাইছে। আবার শ্রাবণীর হাসি। বেশ জোরে। এত জোরে শ্রাবণীর হাসি বহুকাল শোনেনি ধীমান। কী এত আড্ডা হচ্ছে। ধীমানকে ছেলের পাহারায় বসিয়ে সেই যে কাটল আর কোনও হুঁশই নেই!

নতুন করে বুকের কাঁটাটা খচখচ করে উঠল ধীমানের। তখন শ্রাবণী কী বলতে চাইছিল! একবার যখন বলতে গিয়ে থেমে গেছে, তখন ধীমান যেচে জিজ্ঞাসা না করলে কথাটা আর বলবেই না। শ্রাবণীর স্বভাবটাই এরকম। ভয়ানক চাপা। এত চাপা যে ধীমানের কখনও কখনও ভীষণ অস্বস্তি হয়। ধীমানের সঙ্গে বিয়েটা শ্রাবণীর বাবা-মা প্রথমদিকে মেনে নেয়নি। বলতে গেলে প্রায় এক কাপড়েই চলে এসেছিল শ্রাবণী। তবু কোনোদিন বাবা-মার জন্য তাকে মনখারাপ করতে দেখেনি ধীমান। হয়তো বা করেছে, ধীমানের সামনে নয়। অথচ শ্রাবণী ছিল বাবা-অন্ত প্রাণ। সেই বাবার সঙ্গে সে দেখা করতে গেল বিয়ের দেড় বছর পরে। বাবার

হার্ট-অ্যাটাকের খবর শুনে। এটাকে কি চাপা স্বভাব বলে? না জেদ? ধীমানের ঠিক মাথায় ঢোকে না।

নকুল জগে রাতের জল দিতে আসছে। ধীমানকে দেখে ঝুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধীমান আড়ে তাকাল,—কিছু বলবে?

—লাগবে নাকি স্যার? নকুল মাথা চুলকোল,—ছোট আছে একটা। ফরেন।

নকুলকে ধমকাতে গিয়েও সংযত হল ধীমান। সে নিয়মিত মদ খায় না, কিন্তু এখানে এলে ওটা তার চাইই। দোলনও চুমুক দেয় তার গ্লাস থেকে। নেশায় দুজনেরই চোখ অল্প অল্প জড়িয়ে আসে। বিবেক সাফ হয়ে যায়। স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় নেশা আরও জেঁকে বসলে বাইরের কাঁটাতার মৃদু দোল খেতে থাকে। সমুদ্র আকাশ পৃথিবী অলৌকিক মায়ায় ভরে যায়। যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কোনও শোক নেই, সমস্যা নেই, দুশ্চিন্তা নেই, জটিলতা নেই—আছে এক ছেদহীন অপার্থিব আনন্দ। সেতার-সরোদের ঝালা। বাঁশি-নূপুরের অনুরণন। কামনায় টন্‌কো দুটো শরীর। সে নেশা কি এখন চলে! ছেলেবউ নিয়ে গেরস্থর মতো বেড়াতে এসে!

নকুলের প্রাপ্য বকশিশটা চুকিয়ে দিল ধীমান। চাপা গলায় বলল—না। তুমি যাও। যাওয়ার সময় মেমসাহেবকে ডেকে দিয়ে যেও।

শ্রাবণী মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরেছে। ঘরে উঁকি মারল একবার,—বাহ, তাতারবাবু একেবারে ন্যাতা!

ধীমান গোমড়া,—কী এত হাহা-হিহি হচ্ছিল এতক্ষণ?

শ্রাবণী চেয়ার টেনে ধীমানের মুখোমুখি বসল,—ভদ্রলোক একটা মজার গল্প বলছিলেন।

—ভদ্রলোক? মানে ওই কেঠো বুড়োটা?

—হ্যাঁগো, ওই বুড়োটাই। খুব রসিক। চল্লিশ বছর আগে এখানে হানিমুন করতে এসেছিলেন, সেই গল্প...

—মেয়ে-জামাইদের সামনে তোমার সঙ্গে হানিমুনের গল্প? ছিঃ!

—সর্বদা কথার এমন বাজে মানে করো কেন বলো তো? নাতিনাতনি হয়ে গেলে মেয়েজামাই বন্ধুর মতো হয়ে যায়। শ্রাবণী আলতো পা দোলাচ্ছে,—দারুণ ইন্টারেস্টিং গল্প—গল্প কেন, ফ্যাক্ট। ওঁদের হানিমুনের এক্সপিরিয়েন্স।

—আমার শোনার দরকার নেই।

—শোনোই না। ওঁরা যখন এসেছিলেন তখন নাকি এসব হোটেল রিসর্ট কিছু ছিল না। ওই ওদিকে দূরে একটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো ছিল আর সব জঙ্গল-জঙ্গল। তো হয়েছে কী, নতুন স্বামী-স্ত্রী পূর্ণিমায় সমুদ্র দেখবেন বলে এসেছেন। সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে একবার ঘরে ঢুকেছেন কি ঢোকেননি, বেরোতে

গিয়ে দেখেন দরজায় বাইরে থেকে তালা। চিৎকার ডাকাডাকি দরজাধাক্কা কিছুতেই কেউ দরজা খোলে না। থেকে থেকে খালি মাতাল চৌকিদারটার হুঙ্কার শোনা যায়,—খবরদার! হুঁশিয়ার! নতুন বউ তো কেঁদেকেটে একসা। এই বুঝি ঘরে ডাকাত পড়ে! এই বুঝি কেউ খুন করতে আসে! কোনো হিংস্র জানোয়ার দরজা ভাঙে! ভদ্রলোকও বউকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন। একবার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারেন, একবার স্ত্রীর মাথায় হাত বোলান,—আমি আছি না? ভয় কীসের? তা ভয়ে ভয়ে রাত তো কোনোমতে কাটল। শেষে ভোর হতে সব ভয়ের অবসান করে তালা খুলে গেছে। চৌকিদার চাবি হাতে দাঁত বার করে হাসছে,—বকশিশটা দিন বাবু। এবারকার মতো আপনাদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিলাম।

ধীমান ব্যঙ্গ না ছুড়ে পারল না,—কেন? সমুদ্র থেকে বাঘ উঠেছিল নাকি?

—ভদ্রলোকও তো ভেবেছিলেন ওরকমই কিছু অঘটন ঘটেছে। পরে শোনেন অন্য কথা। কী? না, পূর্ণিমার রাতে সমুদ্র নাকি এত অপরূপ হয়ে ওঠে, মানুষ সেই সৌন্দর্য সহ্য করতে পারে না, পাগল হয়ে যায়। জলে নেমে আত্মহত্যাও করে অনেকে। ভাবো অবস্থা! সেই জন্যই চৌকিদার বাইরে থেকে সব্বাইকে তালাবন্ধ করে...! ইশশ্‌, যে সৌন্দর্যর জন্য আসা তারই ভয়ে দুজনকে...

ধীমান বলল,—ছাড়ো তো! যত সব গুলগল্প!

শ্রাবণী বলল,—গুলই হোক আর গল্পই হোক, ব্যাপারটা কী আয়রনিক্যাল না? তা ছাড়া একটা মজাও আছে, তাই শুনেই তো হাসছিলাম।

—মজা? এর পরেও?

—হ্যাঁ মজা। ভদ্রলোকের তখন নাকি তাগড়াই গোঁফ ছিল একটা। সেই গোঁফের ভয়ে নতুন বউ ঠকঠক করে কাঁপত, সহজে কাছে ঘেঁষত না। হানিমুনে এসেও জড়োসড়ো ছিল ভয়ে। তা সেই যে সে রাতে আরও বেশি ভয় পেয়ে বরের হাত চেপে ধরল, ওমনি বর সম্পর্কে ভয় ভ্যানিশ। আর ভদ্রলোকেরও নাকি সেদিন থেকে দুর্দশার শুরু। ওই চেপে ধরা হাত এক চুলও কোথাও নড়তে দেয় না স্বামীকে। ভদ্রলোক মজা করে বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুখ চোখে কী স্যাটিসফ্যাকশান! সুখ!

চাঁদ নেই। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট ছোট বিদ্যুতের ঝিলিক। হঠাৎ হঠাৎ আলো হয়ে উঠছে ঝাউবন। তারপর যে আঁধার সেই আঁধার।

ধীমান সহসা প্রশ্ন করল—তখন তুমি কী যেন বলবে বলছিলে?

—হুঁ। উচ্ছল শ্রাবণী দুম করে চুপ মেরে গেল। অন্যমনস্ক হঠাৎ।

ধীমান অধীর হয়ে উঠছিল—কী হল, বলবে তো?

শ্রাবণী সময় নিচ্ছে। উঠে ঘর থেকে জল খেয়ে এল—আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

বড় পাথরটা সরে গেল ধীমানের বুক থেকে। না, চতুরতায় কোনো ফাঁক নেই তার। নিশ্চিন্ত মুখে বিস্ময় ফুটল—চাকরি! কী চাকরি?

—বিরাট কিছু নয়। একটা স্কুলে। প্রাইমারি স্কুল।

—হঠাৎ চাকরির কী দরকার পড়ল? আশঙ্কা সরে যেতেই ধীমানের অধিকারবোধ চাঙা—তোমার হাতখরচে কম পড়েছে?

উত্তর দিতে গিয়ে শ্রাবণী ভাবল সামান্য—তা নয়, নিজের তো একটা রোজগার থাকা ভালো। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম, জুটে গেল একজনের ব্যাকিংএ। সামনের মাসে জয়েনিং।

—অ। তা অ্যাদ্দিন পর চাকরি করতে দৌড়লে সংসারের কী হবে, অ্যাঁ? তাতার?

—ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হয়েছে কোনোদিন? ভাবনা তো আমার।

ধীমান এবার যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ—স্ট্রেট বলে দিচ্ছি, আমার মত নেই। এর পর তুমি যা ভালো বোঝো।

দু'এক সেকেন্ড পর ধীমান আবার প্রশ্ন করল—মাইনে কত দেবে?

অন্ধকারে ভুরু কোঁচকালো ধীমান, উত্তর দিল না—সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক। শ্রাবণী চোখ তুলল—খুব কম?

ধীমান স্বপ্ন দেখছিল।

একটা মথ কীভাবে যেন ঢুকে পড়েছে তার ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে। এলোপাথাড়ি উড়ছে। ঠোক্কর খাচ্ছে এ দেওয়ালে সে দেওয়ালে। থেকে থাকা পাখায়, সিলিংএ। ওইটুকু মথের ডানায় কী জোর! দেওয়াল কেঁপে উঠল, জানালায় শব্দ ঝনঝন! তীব্র থেকে তীব্রতর। এত উচ্চগ্রামে শব্দ পৌঁছেছে যে কানে তালা লাগার জোগাড়। ধীমান মথটাকে তাড়াতে চাইছিল, পারল না। হঠাৎ কোথা থেকে কনকনে বাতাস এসে কুঁকড়ে দিল শরীর। শীত করছে। ভীষণ শীত।

শব্দ আর শীতের অভিঘাতে ধীমানের ঘুম ছিঁড়ে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে, চোখ খুলেও প্রথমটা বুঝতে পারল না সে এখন ঠিক কোথায়। চাদিপুরের বারো নম্বর ঘরটাকে চিনতে দু'এক মুহূর্ত সময় লেগে গেল। বাইরে উন্মত্ত ঝোড়োবাতাস বইছে। সেই বাতাসই শব্দ করে ঝাঁকাচ্ছে দরজা-জানালা, শীতলতা ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার হাড়পাঁজরায়। কখন এমন ঝড় উঠল, বাইরের আলোগুলো সব নিভে গেছে। অন্ধকারে ধীমান পাশের খাটের দিকে তাকাল। কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। রাত কত এখন?

অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে ঘরের আলো জ্বালল ধীমান।

তাতার অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দরজা খোলা। শ্রাবণী ঘরে নেই।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধীমান ঘড়ি দেখল। দুটো কুড়ি। গেল কোথায় শ্রাবণী! বাথরুমে নেই বোঝা যাচ্ছে, বাথরুম অন্ধকার। ঘুমচোখে ধীমান দরজায় এল। বারান্দার এক কোণে চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে শ্রাবণী। শ্রাবণীকে ঘিরে অন্ধকারের আস্তরণ।

ধীমান জড়ানো গলায় ডাকল—বাইরে বসে কী করছ? এত রাত্তিরে?

অন্ধকার নড়ল না।

—ওভাবে বসে থেকো না। ঘরে এসো। ঝড় উঠেছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

অন্ধকার নিঃসাড়।

ধীমান অন্ধকারের কাছে গেল—হল কী তোমার? কী ভাবছ কী বসে?

অন্ধকার সামান্য কেঁপে উঠল—কিছু না এমনিই।

ধীমান অন্ধকারে শরীর ছুঁল। হাত বোলাল মুখে গলায় হাতে,—ইশশ, গা হাত পা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

ধীমানের উত্তাপ একটুও নিল না শ্রাবণী,—তুমি শোও গিয়ে। আমার ঘুম আসছে না।

আরও নিবিড় হল ধীমান,—কী ভাবছ আমাকে বলবে না?

—ভদ্রলোকের গল্পটা ভাবছিলাম। শ্রাবণীর কণ্ঠ বরফ যেন,—কালই তো পূর্ণিমা, তাই না?

পাঁচ

বড়সড় এক ঢেউ ধেয়ে আসছিল তাতারের দিকে। তাতার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল। পাড়ের দিকে ছুটতে গিয়ে সামনে মাকে পেয়ে গেছে। দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে মার কোমর। চকিত ধাক্কায় শ্রাবণী চিতপটাং ছেলে সমেত। মা-ছেলের মুখের উপর আছড়ে পড়ল ঢেউটা। দুতিনটে ঘুরপাক খেয়ে দুজনেরই দিশেহারা হাল। তাতার খাবি খেয়ে খকখক কাশছে। চোখ টুকটুকে লাল। শ্রাবণী দম নিতে দু'দিকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সজোরে। থুথু করে মুখের লবণাক্ত জল বার করছে।

নিরাপদ দূরত্ব থেকে ধীমান হো হো করে হেসে উঠল। তাতারের জলে নামার উৎসাহ যত বেশি জলকে ভয়ও ততটাই। শ্রাবণীকে চেপে ধরে তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে আবারও। আকাশ আজ চকচকে নীল। রাত্রে ঝড়টা হয়ে যাওয়ার পর কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই। সকালের গাঢ় সোনালি রোদ্দুর মন খুলে হাসছে। পূর্ণিমার টানে সমুদ্রও উত্তাল এখন। একেবারে কাছে এসে ফুঁসছে। রাগী যুবক ঢেউরা এসে হাতপা ছুড়ছে পাড়ে, বোল্ডারে আছাড় খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

স্নানার্থীদের ভিড়ও হয়েছে বেশ। আশপাশের হোটেলের বাসিন্দারা নেমে এসেছে

সমুদ্রে। সবাই যে সমুদ্রস্নানে উৎসাহী তা নয়, কারও কারও জল ছুঁয়েই আনন্দ। ধীমানের মতো। ধীমান কখনও তেমন করে জলে নামে না। দোলন ডাকলেও নয়। মাঝে মাঝে ঢেউয়ে নেমে একটু জলের স্পর্শ নিয়ে আসা, ব্যস! তারপর জলে পা ডুবিয়ে বসে ভেজা গায়ে অস্থির হুটোপুটি দেখা দোলনের। এই মুহূর্তে শ্রাবণীর। তাতারকে রেখে শ্রাবণী আড়াআড়িভাবে প্রবেশ করছে সমুদ্রে। শাড়ির আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়ানো, ছোট ছোট ঢেউ আলতো চাপড়ে সরিয়ে দিচ্ছে, টপকে পার হচ্ছে মাঝারি ঢেউ, বড় ঢেউ দেখলে ডুব দিচ্ছে জলের নীচে। দূর থেকে মনে হয় ও যেন শ্রাবণী নয়, অন্য কোনও নারী, যাকে ধীমান চেনে না, আগে কখনও দেখেনি ভালো করে। শাড়িজামা লেপ্টে আছে নারীদেহে। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ আলাদা আলাদা ভাবে স্পষ্ট—বুক। কোমর। উরু। নিতম্ব। চেনা শরীর অচেনা হয়ে কতকাল পর টানছে ধীমানকে! অভ্যাসের টান নয়, সম্মোহনের টান।

ধীমান উঠে জলে নামল। তাতার বাবাকে নামতে দেখে হইহই করে উঠেছে। হাঁটুজলে শ্রাবণীর পাশে দাঁড়াল ধীমান। শ্রাবণীর খোলা কোমর, ঘাড়, গলা জলে ভিজে চিকচিক।

শ্রাবণী অবাক চোখে ধীমানকে দেখছে। ধীমান শ্রাবণীর কোমর বেড় দিয়ে ধরল,—চলো, একটু ভিতরে যাই।

শ্রাবণী সরতে চাইল,—না না, বেশি জলে জামাকাপড় সামলানো যায় না।

একটা ছোট্ট ঢেউ আলগা পেরোল ধীমান। চাপ্ দিল শ্রাবণীর কোমরে। অন্য হাত শ্রাবণীর কাঁধে রেখেছে,—কিচ্ছু হবে না, চলো তো!

শ্রাবণী পিছলে গেল,—না, আমি যাব না। তুমি তাতারকে নিয়ে যাও।

শ্রাবণীর চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি। দৃষ্টিতে ভয়ও না, প্রত্যাখ্যানও না, ঘৃণা না, প্রেমও না। তবে যে কী! কথা বলতে বলতে পিছনে সরছে শ্রাবণী,—বেশি দূরে যেও না। ভিতরে চোরা টান আছে।

ধীমানের জলে নামার আসক্তিটাই মরে গেল। তাতার ধীমানকে জাপটে ধরেছে,—চলো না বাবা! চলো না বাবা!

ছেলের বায়না মেটাতে কিছুটা এগোতেই হল ধীমানকে!

—আপনার তো আজকেই লাস্ট?

ধীমান ঘাড় ফেরাল। সাত নম্বরের বড় জামাই জলে নামছে। ঘাড়েগর্দানে পেটানো বক্সারের মতো চেহারা। হ্যা হ্যা করে হাসছে। ধীমান চোয়াল ফাঁক করল,—শুধু লাস্ট নয়, ফার্স্টও।

লোকটা কথা বাড়ানোর অছিলা পেয়ে গেল,—একটু সময় নিয়ে আসবেন তো। নীলগিরি পাহাড়টা ঘুরে আসতে পারতেন। পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, রাজবাড়ি... কন্ডাক্টেড ট্যুর আছে।

—তাই?

—পাহাড়ের মাথায় কী সিনিক বিউটি। ঝরনা, জঙ্গল....!

জঙ্গল শব্দটাতে রক্ত চড়ে গেল ধীমানের। দাঁত খিঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, তুই যা না শালা! তোর শ্বশুরকে নিয়ে ঘোর না। আমাকে জঙ্গল শোনাচ্ছিস কেন? তার আগেই এক অতিকায় ঢেউ পাগলা হাতির মতো সামনে এসে গেছে। ধীমান তাতারকে চেপে ধরে মরিয়া ডুব দিল। তবু সামলানো গেল না, ধীমানের হাত ছিটকে তাতার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। ডিগবাজি আর ঘষা খেতে লুটিয়ে পড়ল পাড়ে।

মুহূর্তে শ্রাবণী লাফিয়ে এসেছে। ঢেউ তাতারকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগেই ছেলেকে আঁকড়ে ধরল। তার চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ।

ধীমান জল থেকে বেরিয়ে এল,—কীরে, লেগেছে?

তাতারের মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল। চোখ নাক মুখ জলে বালিতে পরিপূর্ণ। শ্রাবণীর চোখে ঝাঁঝ,—ছেলের হাতই ধরে রাখতে পারো না, আবার আমাকে নামাতে চাইছিলে।

একটু আগের রাগটা দপদপিয়ে উঠল ধীমানের। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল,—আমি কি ইচ্ছে করে...?

—থাক, সাফাই গাইতে হবে না। আমি বুঝে গেছি।

তটের প্রান্তে ঝাউগাছের সারি। শ্রাবণী তাতারকে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসল। তোয়ালেতে ছেলের গা-মাথা মুছছে যত্ন করে।

ধীমান দাপাতে দাপাতে সামনে এসে দাঁড়াল, তার শর্টপ্যান্টের পকেট বালিতে বোঝাই। খামচে খামচে ভিজে বালি বার করল কিছুটা, তাতারের হাত ধরে টানল,—আয়, আরেকবার যাই।

শ্রাবণী কঠিন,—নাআ, তাতার আর যাবে না।

—এঁএহহ, যাবে না? ধীমান ভেংচে উঠল,—আমার ছেলেকে নিয়ে আমি যেখানে খুশি যাব। চল তো তাতার।

শ্রাবণী কঠিনতর,—ননআআ। আমি বলছি যাবে না, তাতার যাবে না।

ধীমান রাগে স্তম্ভিত। ছেলে তার এত ন্যাওটা তবু সেই ছেলে মাকে ছেড়ে একটুও নড়ছে না। এ যেন ছেলেকে সামনে রেখে শ্রাবণীরই কোনো অঘোষিত যুদ্ধ।

হেরে যাচ্ছিল—ভীষণ ভাবে হেরে যাচ্ছিল ধীমান, এই মুহূর্তে যদি বালিতে মুখ গুঁজতে পারত। ধীমান বিড়বিড় করে উঠল,—বাড়াবাড়ি। সব সময়ে বেশি বাড়াবাড়ি।

পলকে শ্রাবণী ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে,—আমরা কটেজে ফিরছি।

কাঠের গেট দিয়ে শ্রাবণী ঢুকে যাওয়ার পরও ধীমান কটমট করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। হিংস্র রাগ ফণা তুলছে শরীরের কোষে কোষে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে

হঠাৎই খ্যাপা মোষের মতো ছুটল সমুদ্রের দিকে। উন্মাদের মতো লাফালাফি করছে জলে। একা-একাই। আশপাশের মানুষজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, শুধু নিষ্ফল আক্রোশে ঘুষি চালাচ্ছে ঢেউয়ের গায়ে। যেন ঘুষির জোরেই সমুদ্রকে চুরমার করে দেবে। নাকে মুখে জল ঢুকে গেল তবু লড়ে যাচ্ছে ধীমান। লড়ছে। ধীমান হাঁফিয়ে উঠল একসময়। এ এক অসম যুদ্ধ। ঢেউরা আসছে তো আসছেই। অসংখ্য। দুর্নিবার।

পরাজিত ধীমান ফিরছে এবার। মাথা নীচু করে। যেতে যেতে ফিরে তাকাচ্ছে অশান্ত সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রকে এত নির্মম আগে কখনও মনে হয়নি ধীমানের।

ছয়

পূর্ণিমার চাঁদ ওঠেনি এখনও। গহিন আঁধারে ডুবে আছে বিশ্বচরাচর। সমুদ্রের স্বর ধীরে ধীরে গর্জন হয়ে উঠছে। বাতাস চঞ্চল। সমুদ্র কাছে আসছে। জল বাড়ছে। ধীমান টর্চ ফেলে শ্রাবণীকে খুঁজছিল। আলো থেকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এসে হঠাৎ পৃথিবী লুপ্ত যেন। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, মনে হয় সামনে শুধু এক অনন্ত মহাগহ্বর। কী বিশাল তার হাঁ।

কাঠের গেট ধরে ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধীমান। নুনেখাওয়া বাঁধানো সিঁড়ি বোল্ডার ছুঁয়ে হারিয়ে গেছে। ভাঙা ধাপিতে এই রিসর্টেরই কয়েকজন ট্যুরিস্ট অশরীরী ছায়ার মতো এখানে সেখানে বসে। চাঁদের প্রতীক্ষায়। ধীমান সেখানে শ্রাবণীকে দেখতে পেল না।

বিকেলবেলা তাতারকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল ধীমান। সারা দুপুর সে গোঁজ হয়ে ছিল। শ্রাবণীও বিশেষ কথাবার্তা বলেনি। বেড়াতেও বেরোল না বিকেলে। ছেলের টানাটানিতেও না। মাথা ধরেছে। মরুক গে, ধীমানের অত যেচে মান ভাঙানোর দায় নেই। তাতার খুশি থাকলেই যথেষ্ট। তাতারকে নিয়ে গোটা জনপদ টোটো করে চষেছে ধীমান। খাঁচার হরিণ দেখিয়ে ছেলেকে আহ্লাদে আটখানা করে দিয়েছে। ছেলের পছন্দসই আইসক্রিম জোগাড় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ছেলেকে। এখন শুধু রাতটুকু পার হলেই...। বুক ভরে নিশ্বাস টানল ধীমান। আহ, বন্দিদশা থেকে মুক্তি! আবার কলকাতা। আবার দোলন।

তাতার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে। বোল্ডারের পিছনে বসে আট নম্বর ঘরের বাচ্চাটার সঙ্গে গল্প জুড়েছে। ধীমান আরেকবার টর্চের আলো ঘোরাল। ওই তো শ্রাবণী। ওই তো ডানদিকের বোল্ডারে বসে আছে। সাবধানে পাথর টপকে সেখানে পৌঁছল ধীমান,—কটেজের চাবিটা দাও তো?

শ্রাবণী চমকে ফিরেছে,—ও! তুমি!

—কটেজ বন্ধ করে এখানে এসে বসে আছ! আমি কাঁহাকাঁহা খুঁজে বেড়াচ্ছি!

—চাবি তো কাউন্টারে রাখা আছে। ম্যানেজার বলেনি?

ধীমান ফিরতে যাচ্ছিল, শ্রাবণী আচমকা ডেকেছে,—শোনো।

—রাতের মিল তো? বলা হয়ে গেছে। ভোরের অটোরিকশা ফিট করে এসেছি, কটেজে এসে ডাকবে।

—ওসব না। একটু বোসো না এখানে। শ্রাবণীর স্বর গভীর। এত গভীর যে ধীমান ফিরতে পারল না। পাশের পাথরে বসল। শ্রাবণী হাঁটুতে থুতনি ঠেকাল,—কাল তোমাকে পুরো কথাটা বলিনি। আমার আরও কিছু কথা ছিল।

ধীমান একটা গন্ধ পাচ্ছিল। কটু নোনা ঘ্রাণ। শ্রাবণী লম্বা শ্বাস ফেলল,—আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না।

কথাটা এতই আকস্মিক, এত অপ্রত্যাশিত—ধীমান প্রথমটা হৃদয়ঙ্গমই করতে পারল না। লঘু গলায় বলে ফেলেছে,—কেন? এত কী রাগ হল হঠাৎ?

—রাগও নয়। হঠাৎও নয়। শ্রাবণী হাঁটু থেকে থুতনি তুলল না,—অনেক ভেবেচিন্তেই ডিসিশান নিয়েছি। তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

এবার বিস্ময়ে ছিটকে এল,—কেন?

—যদি বলি তোমাকে আমার আর ভালো লাগছে না?

ধীমানকে ফুটল কথাটা। সামান্য তপ্ত হল সে,—কারণটা জানতে পারি?

—ইচ্ছে। একজনকেই সারাজীবন ভালো লাগতে হবে তার কোনও মানে আছে?

—হেঁয়ালি কোরো না। ধীমানের গলা একটু চড়েছে,—খোলসা করে বলো।

শ্রাবণী একই রকম অচঞ্চল,—বললাম তো, ভালো লাগছে না—তোমার কাছ থেকে আমি আর কিছু পাই না। এত সাধারণ তুমি—এত একঘেয়ে!

ধীমান সপাটে চড় খেল একটা। মুখ থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে এল,—আমি সাধারণ! আমি...

—কী তোমার আছে বলো? ঘুম থেকে উঠে হাঁইহাঁই কিছু হুকুম। লাখ লাখ ভেড়াছাগলদের মতো অফিস অফিস ট্যুর, অফিসের চিন্তা! বাড়ি ফিরে ছেলে নিয়ে আহ্লাদিপনা, নয়তো টিভিতে চোখ রেখে বসে থাকা! মাঝে মাঝে রাতবিরেতে আমার শরীরের উপর হামলানো! সেটাও এত যান্ত্রিক, এত রহস্যহীন—তুমি একটা নেহাত কেজো মানুষ। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি আজকাল আর সহ্য করতে পারি না।

ধীমান অপমানে বিমূঢ় প্রায়। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল,—থামো। নাটুকে কথা বোলো না। আমি কি মেয়েছেলে যে রহস্য করে বেড়াব!

—রহস্য সকলেরই থাকে গো। পুরুষেরও থাকে। শ্রাবণী বাতাসের মতো ফিসফিস করল,—তোমার নেই।

আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ হচ্ছিল ধীমান। পালটা অস্ত্র ছুড়ল,—সেরকম রহস্যময়

পুরুষের সন্ধান পেয়েছ বুঝি?

শ্রাবণী সহসা বোবা। সমুদ্রের ওপারে, আকাশের ঢালে খুব আস্তে আস্তে একটা আলোর সঞ্চার হচ্ছে। অলস পায়ে সমুদ্র থেকে উঠে আসছে পূর্ণ চাঁদ। হঠাৎই লাফিয়ে উঠে পুরো মেলে দিল নিজেকে।

প্রতিটি নিঃশব্দ পল অনুপল লক্ষ অর্বুদ বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল ধীমানের। কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—উত্তর দিচ্ছ না যে? তারই ব্যাকিং-এ চাকরি জুটেছে, তাই তো?

গোপন বিষাদ যেন শীতল আলো হয়ে ছড়িয়ে গেছে সমুদ্রে। অন্ধকার এক নীলচে মোহ এখন। শ্রাবণীর স্বরেও আলোছায়া,—কী হবে জেনে?

—আমার জানার রাইট আছে। তুমি আমার স্ত্রী।

—ধরো জানলে, কী করবে তুমি?

নীল জ্যোৎস্নায় একরাশ কাঁকড়া চরতে বেরিয়েছে বালিতে, ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে ভেসে আছড়ে পড়ছে বোল্ডারে, ঢেউ সরলেই আবার কিলবিল কিলবিল গর্তের খোঁজে।

ধীমান গর্জে উঠল,—আই উইল সি দ্যাট বাগার! দেখে নেব! এত সহজে ছাড়ব না—তোমারও স্ক্রু টাইট দিচ্ছি আমি। তাতারকে দিয়ে।

—তাতার! তাতার তো আমার সঙ্গে চলে যাবে!

এমন অবলীলায় কথাটা বলল শ্রাবণী, ধীমানের স্নায়ু ঝাঁকি খেয়ে গেল,—তাতার আমার—মাই সান, আমাকে ছেড়ে তাতার থাকতেই পারে না।

এতক্ষণ পর শ্রাবণী মুখ তুলল,—ছেলেকে তুমি কিছুই চেনোনি। তুমি হচ্ছো ওর আব্দার। বায়নাক্কা। আমি হচ্ছি ওর প্রয়োজন। তুমি কি বোঝ না, তুমি শুধুই ওর রিলিফ? যেমন তোমার দোলন?

সমুদ্র নিমেষে স্থির। বাতাস নিস্পন্দ।

ধীমান অসাড়,—কে দোলন?

শ্রাবণী মুঠোয় ধরা তিন-চারটে কাগজ এগিয়ে দিল ধীমানের দিকে। সমুদ্রগর্জন চতুর্গুণ হয়ে ফেটে পড়ছে। ধীমান হাত বাড়াল না, পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করল,—কী ওগুলো?

—তোমারই জিনিস। এই রিসর্টের বিল। অক্টোবরের আছে, ডিসেম্বরের আছে, মার্চের আছে... লাস্ট এপ্রিলেরও।

চাঁদ স্পটলাইট হয়ে আলো ফেলেছে ধীমানের মুখে। ধীমান চাঁদটাকে সহ্য করতে পারছিল না। মুখ নামিয়ে নিল,—কোথায় পেলে?

শ্রাবণীর চোখে চাঁদের কিরণ,—তুমি বড় অসাবধান। প্যান্টের পকেটে রেখে প্যান্ট কাচতে দাও, শার্টের বুকপকেটে অবহেলায় ফেলে রাখো, ব্রিফকেসে রেখে

সেখান থেকে টাকা বার করতে বলো আমাকে। ভুল তো তোমার একবার নয়—বার বার!

পূর্ণিমার ঢেউ বোল্ডারে মাথা কুটছে। উৎক্ষিপ্ত জলকণায় ভরে গেল ধীমানের মুখ।

শ্রাবণী উঠে দাঁড়াল,—কাকে তুমি ঠকাতে চাও ধীমান? আমাকে? দোলনকে? না নিজেকেই?

দু'ধারে দুই খাটের মাঝে হাতকয়েকের ব্যবধান। ও পাশের খাটে শ্রাবণীর গায়ে হাত রেখেছে মধ্যরাতের জ্যোৎস্না। দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে আছে শ্রাবণী। তাতারকে বুকে জড়িয়ে। শুয়েই আছে শুধু, ঘুমোয়নি। চোরের মতো শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে গেল একটা হাত। হাতটা শ্রাবণীকে ছুঁতে চাইছে—পারল না। দু'খাটের মধ্যিখানে দূরত্ব বেড়ে গেছে কয়েকশো যোজন। এত বেড়েছে যেন ওই খাটে আর কখনও পৌঁছতে পারবে না ধীমান।

আজ যদি কোনো চৌকিদার থাকত। বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে যেত ঘরটাকে। হায় রে!

ধীমান নিঃশব্দে বাইরে এসে সিগারেট ধরাল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ বড় প্রকট এখন। অশালীন জ্যোৎস্না ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে অন্ধকারের সমস্ত মুখোশ। সমুদ্র আকাশ মাঠ ঝাউবন কারও আজ রেহাই নেই চাঁদের হাত থেকে। ধীমানেরও না।

ভিখিরির মতো ধীমান তেরো নম্বর কটেজটার দিকে তাকাল।

শুনশান মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে নীল চাঁদ।

কুটিরটা নেই।

কোথায় যে এখন মুখ লুকোয় ধীমান।

উপসংহার

আলো ফুটছিল। সমুদ্র দূরে এখন। তরঙ্গহীন। দূর দিয়ে একদম একা একটা লোক হাঁটুজল ভেঙে হেঁটে চলেছে। তীরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। আবার এ-প্রান্তে। অবিরাম। লোকটার কাঁধে একটা ভারী কালো জাল। অস্ফুট আলোয় প্রায়নগ্ন মানুষটা এক চলন্ত সিল্যুট।

নিঃস্ব চোখে চলমান লোকটাকে দেখছিল ধীমান। মরা কোটালে মাছ আসে না, তবু কী নির্বোধের মতো হাঁটে লোকটা।

এ কী নির্বুদ্ধিতা? নাকি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা?

ধীমান জানে না। তার সামনে এখন শুধুই বিবর্ণ সমুদ্র।

আঁধার বৃত্ত

তখনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল ব্রততীর। প্রতিদিন এ সময়ে তীর্থের কাকের মতো মা'র প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে মেয়ে, দূর থেকে মাকে দেখলেই লাফালাফি নাচানাচি শুরু করে দেয়, আজ ব্রততী বাড়ি ফিরে বেল বাজানোর পরও সে মেয়ের দর্শন নেই।

ভুরু কুঁচকে মা'র দিকে তাকাল ব্রততী,—ওরা এসেছিল বুঝি?

মমতা ত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মৃদু ঘাড় নাড়লেন।

তীক্ষ্ণ স্বরে ব্রততী বলল,—ওরা নিতে এল, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছেড়ে দিলে!

—আমি কী করব? তোর মেয়েই যাওয়ার জন্য খুব কান্নাকাটি করছিল যে।

পলকের জন্য ব্রততীর বুকটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। শূন্য ধু-ধু ঘাসহীন মাঠের মতো। পরক্ষণে একটা অসহায় রাগ ফুঁসে উঠেছে ভেতরে। চটাস চটাস চটি খুলে ছুড়ে দিল জুতো রাখার র‍্যাকে। থমথমে মুখে বলল,—কথাটা আমায় একবার অফিসে ফোন করে জানাতে পারতে।

—করেছিলাম। তুই তখন অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিস।

—কখন এসেছিল ওরা?

—এই তো খানিক আগে। এক ঘণ্টা....না না, আরও কম। মমতা সাহস সঞ্চয় করে হাসলেন একটু,—তাড়াতাড়ি দিয়ে যাবে বলেছে। আটটার মধ্যে

—তাহলে আর কী! ধেই ধেই নাচি।

ব্রততী দুপদাপ ঢুকে গেল ঘরে। কাঁধের ব্যাগ আছড়ে ফেলে দিল টেবিলে। দু'হাতে মুখ ঢেকে খাটে বসে পড়েছে। আজই প্রথম দিন নয়, এই নিয়ে দু'মাসে তিন তিন বার তুতুনকে নিয়ে গেল ওরা, একটা না একটা বাহানা দেখিয়ে। হুঁহ্, বাড়িতে সত্যনারায়ণ হচ্ছে! পুজোর দিনে বাবা-মা একবারটি তুতুনকে দেখতে চায়। তার আগের বারও কি একটা বলে যেন নিয়ে গেল না? সীমার ছেলের জন্মদিন না ছাতার মাথা কী যেন? অছিলা অছিলা, সবটাই অছিলা। ব্রততী কি বোঝে না কিছু! সমস্ত ওই অতনুর কারসাজি। কোর্টে মেয়ের কাস্টডি নিয়ে লড়তে গিয়ে হেরে গেছে অতনু, মুখে চুনকালি পড়েছে, তাই এখন অন্যভাবে কলকাঠি নাড়ছে। তুচ্ছতম ছুতো ধরে মেয়ের ওপর দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। আশা কত!

মমতা দরজায় এসেছেন,—মুখ হাত পা ধুলি না? যা, বাথরুম ঘুরে আয়। চায়ের জল বসাচ্ছি।

দু'মিনিট আগেও প্রবল ক্ষিধেতে নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছিল ব্রততীর। অফিসের ক্যান্টিনটা আজ বন্ধ ছিল, কোন দুপুরে বাইরে থেকে এক ঠোঙা মুড়ি-বাদাম এনে খেয়েছে, সে কি এতক্ষণ পেটে থাকে! চার্টার্ড বাস থেকে নেমে মোড়ের দোকান থেকে গোটা চারেক গরম প্যাটিস্ কিনেছিল ব্রততী, সঙ্গে তুতুনের জন্য তার প্রিয় লাড্ডু। বাক্সটা ব্যাগেই পড়ে আছে। থাক, পড়েই থাক।

ব্রততী মুখ থেকে হাত সরাল,—আজ ক'জনের বাহিনী এসেছিল?

—তুতুনকে নিতে? বললাম তো তোর ছোট দেওর আর ননদ। মমতা পায়ে পায়ে ভেতরে এলেন,—বিশ্বাস কর্, আমি আপত্তি করেছিলাম। বলেছিলাম, তুই নেই, তোকে না জিজ্ঞেস করে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তা তোর দেওর-ননদ দু'জনেই এত করে বলতে লাগল.....তোর যে ভাসুর দুবাইতে থাকে সে নাকি এসেছে, আজ খাওয়া-দাওয়া করবে তোদের বাড়িতে.....

দেওর ননদ ভাসুর তোদের বাড়ি শব্দগুলো খটাং খটাং লাগছে কানে। ব্রততী কড়া গলায় বলল,—বার বার দেওর ননদ ভাসুর বলছ কেন? তোমাকে কতদিন না বলেছি ওরা আমার কেউ নয়। ও বাড়িও আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি এইটাই।

—সে তুই যা বলিস। মমতা মাথা দোলাচ্ছেন,—তোর সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে বলে তারা তুতুনের কাকা-পিসি রইল না এমনও তো নয়।

—তাহলে তুতুনের কাকা-পিসিই বলবে।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। তাই বলব। ব্রততীর আরেকটু কাছে এগিয়ে এলেন মমতা,—ওদের দেখে মেয়েটা কেমন ছটফট করছিল তা যদি দেখতিস!

ঝাঁ করে আরও তেতে গেল ব্রততী। প্রায় বিকৃত করে ভেংচে উঠেছে,

—দেখে তুমিও গলে জল হয়ে গেলে, তাই তো?

মমতা থমকেছেন। স্থির চোখে দেখছেন মেয়েকে।

ব্রততী আরও হিংস্র হলো,—তুমি কী চাও বলো তো মা? মেয়ে নিয়ে আমি এখানে না থাকি?

—ওমা, সেকী কথা! আমি ও কথা কখন বললাম?

—সব কথা কি বলতে হয়, হাবে-ভাবে বোঝা যায়। ব্রততী ঘাড় নাড়ছে জোর জোর,—ঠিক আছে, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিচ্ছি।

মমতার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল,—ওরকম করছিস কেন খুকু? অন্যায়টা কী বললাম?

—নিজেই ভেবে দ্যাখো।

—না, আমি কিচ্ছু খারাপ বলিনি। মমতার স্বর দৃঢ় শোনাল,—শুধু একটা কথাই আমি মনে করিয়ে দিয়েছি, ওদের সঙ্গে তুতুনের সম্পর্ক অত সহজে ছেঁড়া যাবে না। তুই জোর ফলালেও পারবি না।

মা হয়েও কী নিষ্ঠুরের মতো কথা। হয়তো বা মা বলেই। ব্রততী ঝুম হয়ে গেল। তুতুন যখন এই পৃথিবীতে অতনুর মেয়ে হয়ে জন্মেই গেছে, অতনুর মেয়ে হয়েই থাকবে, এই সত্যিটা ব্রততীর থেকে বেশি আর কে জানে। আর এর বিরুদ্ধেই তো ব্রততীর যত লড়াই-ঝগড়া আইন-আদালত মামলা-মোকদ্দমা। ডিভোর্সের ডিক্রি তো কবেই জুটে যেত, শুধু যদি এই কাস্টডির ফ্যাকড়াটা না থাকত। কত দড়ি টানাটানি, কত থুতু ছেটাছিটি, কত কাদা ছোঁড়াছুড়ি, সবই তো ওই মেয়েকে পাওয়ার জন্যই। কী সিন্ না কোর্টে করেছে অতনু! মেয়েকে নিয়ে চলে আসছে ব্রততী, ছিনিয়ে নিতে চাইছে অতনু। এক পাশ থেকে বাবা টানে, এক পাশ থেকে মা! প্রকাশ্য আদালতে সে কী লজ্জাকর দৃশ্য!

ব্রততীর শরীর শক্ত হয়ে এল,—জোর ফলানোর প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে মা? কোর্ট বলে দিয়েছে মেয়ের বাপ সপ্তাহে একদিন দেখতে পাবে, তাতে আমি কখনও বাধা দিই? তার বেশি ওরা নিয়ে যায় কোন রাইটে? বলতে বলতে মার দিকে টেরচা চোখে তাকিয়েছে,—এর পর থেকে দেখছি মেয়েকে আর এখানেও রেখে যাওয়া চলবে না, ঠিক আছে, এবার থেকে ট্যাকে করে অফিসেই নিয়ে যাব।

মমতার মুখ কালো হয়ে গেল,—বেশ তো, এবার থেকে ওরা নিতে এলে দূর দূর করেই নয় তাড়িয়ে দেব। তাতে তোর মেয়ে কাঁদুক, চেঁচাক.....

মমতা চলে গেলেন। ভারী মুখে।

ব্রততীর এবার খারাপ লাগছিল একটু একটু। মমতা নাতনি অন্ত প্রাণ, তাঁর সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহারটা না করলেই হতো। কী করবে ব্রততী? মাথার ঠিক থাকে না যে।

অফিসের শাড়ি-জামা না বদলেই ব্রততী শুয়ে পড়ল। আলো নিবিয়ে। আঁধার ঘরে মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। কার্তিক শেষ হয়ে এল, পাখার হাওয়ায় শীত শীত করে বেশ। উঠে একটু কমিয়ে দিলে হয়, নড়তে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল ও ঘরে টিভিতে বাংলা খবর শুরু হয়েছে। এর পর একের পর এক সিরিয়াল আরম্ভ হবে, গোগ্রাসে গিলবে মা, অভিমান থিতিয়ে যাবে, দিব্যি কেটে যাবে মার সন্ধেটা। কিন্তু ব্রততীর? মেয়েকে যে পক্ষিনীর মতো আগলে রাখে, যতক্ষণ বাড়ি থাকে ততক্ষণ যে তুতুনকে চোখের আড়াল করে না, অফিস থেকে ফিরেই এমন একটা দুঃসংবাদ শুনলে তার মনের যে কী অবস্থা হয়!

একা ঘরে গলা বুজে আসছিল ব্রততীর। নাহ্, যে যাই বলুক, ব্রততীকে কঠিন হতে হবে। দরকার হলে জোরই ফলাবে ব্রততী। অতনু যদি গায়ের জোরে একটা

সম্পর্ক ছিঁড়ে দিতে পারে, তবে যুদ্ধে জিতেও ব্রততী কেন পারবে না মেয়েকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে। সম্পর্ক তো এমনি এমনি গাঢ় হয় না, তাকে ক্রমাগত লালন-পালন করতে হয়। জ্বাল দিতে হয়। সে সুযোগ যদি আদৌ না দেয় ব্রততী। ও বাড়ি না যেতে দিলে, ও বাড়ির কারুর সঙ্গে তুতুনকে দেখা করতে না দিলে, ক'দিন আর তাদের জন্য পা ছড়িয়ে কাঁদবে তুতুন! সে কান্নাও নয় ব্রততী ভুলিয়ে দেবে। তুতুনকে শুধু নিজের মেয়ে করে গড়ে তুলবে। পারবে না? অতনুর অস্তিত্ব কি কোনোভাবেই মুছে দেওয়া যায় না তুতুনের জীবন থেকে।

খুট করে শব্দ হলো একটা। টিউবলাইটের সাদাটে দ্যুতিতে ভরে গেছে ঘর। চোখ কুঁচকে আলোর চাপটা সামলাল ব্রততী। বাবা এসেছে ঘরে।

ব্রততী কাপড় গুছিয়ে উঠে বসল,—কিছু বলবে?

—শুয়ে আছিস যে বড়? শরীর খারাপ?

—উঁহু। ব্রততী হাসার চেষ্টা করল।

—মন খারাপ? মার ওপর রাগ হয়েছে?

ও, শোনাও হয়ে গেছে! মা যে কী, বাবা বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই.....।

কেমিক্যালসের ছোট্ট বিজনেস আছে বিমলের। হাক্লান্ত হয়ে ফেরেন সন্ধেবেলা।

একমাত্র মেয়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় মধ্য পঞ্চাশেই তাঁকে প্রায় বৃদ্ধ করে দিয়েছে। মার ওপর তাও হম্বিতম্বি চলে, এই বাবাকে মেজাজ দেখানো যায় না। ব্রততীর ভারী মায়া হয় বাবার মুখখানা দেখে।

চুপ করে থাকা মেয়ের পাশটিতে এসে বসলেন বিমল,—তুই এত অবুঝপনা করিস কেন বল্ তো খুকু?

—কী করলাম আমি? ব্রততী সহজ হতে চাইল।

—মেয়ে এক-দু'ঘণ্টার জন্য গেছে, এখনই ফিরে আসবে। এতে এত উতলা হওয়ার কী আছে?

—উতলা আমি হইনি বাবা। কিন্তু যা আমার পছন্দ নয় তা তো আমি বলবই।

—একটু মানিয়ে নিয়ে চল্ মা। যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। পাস্ট ইজ পাস্ট। নতুন করে আর তিক্ততা বাড়িয়ে কী লাভ!

অনেক কথা মুখে চলে আসছিল ব্রততীর। বলতে পারত, তিক্ততা তো আমি বাড়াই না বাবা, বরং ওরাই.....। তুমি জানো, তুতুনের কানে ওরা কেমন বিষমন্তর দেয়। না হলে আগে যে মেয়ে বাবার কাছে ঘেঁষত না, মা ছাড়া জগতের কিচ্ছু চিনত না, সেই মেয়ে ড্যাঙডেঙিয়ে নাচতে নাচতে ও বাড়ি চলে যায়! আর সেটা কোন বাড়ি, না যে বাড়িতে দিনের পর দিন অপমানিত হতে হয়েছে মাকে! অতনুর ভাই-বোন সবাই তো শাগরেদ ছিল অতনুর, একটি দিনের তরেও দাদার ক্রূর

আচরণের প্রতিবাদ করেনি কেউ। এখন তারা বাচ্চার মন ভোলাতে আহ্লাদিপনা শুরু করেছে, এও তো শয়তানি। ব্রততীর মা-বাবাকে নিয়েও এক সময়ে কম কথা শুনিয়েছে ও বাড়ির লোক। কোনো কারণ ছাড়াই। সবই তো জানে মা-বাবা। তবু কী করে বলে.....! এ বাড়ির কারও কোনো মানসম্মানবোধ নেই। থাকলে বুঝত ওই চার বছরের মেয়েকে দিয়েই প্রতিশোধের জমি তৈরি করছে ওরা।

ব্রততী কিছুই বলল না। কাকে বলবে? বাবাকে? যে বাবা আগাগোড়া ডিভোর্সের বিপক্ষে ছিল? কাকে বোঝাবে? মাকে? যে মা দিনরাত মিটমাট করে নে, তুতুনকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করিস না বলে বলে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে, তাকে?

ছোট্ট শ্বাস পড়ল ব্রততীর। অজান্তেই। ও বাড়িতেও সে একা ছিল, এ বাড়িতেও একা। ঘোরতর নিঃসঙ্গ।

মেয়ের শ্বাসটা বুঝি অনুভব করলেন বিমল। উঠে দাঁড়িয়েছেন। নরম গলায় বললেন,—মন খারাপ করিস্ না। আয়, ও ঘরে আয়। অফিস থেকে এসে চা টাও তো খাস্‌নি শুনলাম। ....আয় আয়।

বিমল চলে যাওয়ার পর বিছানা ছাড়ল ব্রততী। সিন্‌ক্রিয়েট করে লাভ নেই। এ বাড়িতে থাকলে এরকমই চলবে। তাকেই উদ্যোগী হয়ে হেস্তনেস্ত করতে হবে কিছু। ব্যাগ থেকে প্যাটিসগুলো বার করল ব্রততী। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তেলতেল করছে বাক্সটা। লাড্ডুগুলোও থেঁতলে গেছে। থেঁতলানো লাড্ডু ফ্রিজে রেখে ব্রততী রান্নাঘরে এল। গ্যাস জ্বালিয়ে চাটুতে প্যাটিস চারটে গরম করে নিয়ে এসেছে বাইরের ঘরে।

টিভির সামনে বসে আছে ব্রততী। কামড় দিচ্ছে প্যাটিসে। বিস্বাদ লাগছে, তবুও। সামনে পর্দায় অর্থহীন কি এক হাসির প্রোগ্রাম চলছে, ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হচ্ছে বাবা-মার মুখ। দেখলেই চোখ করকর করে উঠছে ব্রততীর, তবু সে দৃষ্টি রেখেছে টিভির পর্দায়। হাস্যকৌতুকের পর্ব শেষ হয়ে সিনেমার গান শুরু হল। নির্বোধ প্রেমের লম্ফঝম্পে ভরে যাচ্ছে বোকাবাক্স, ব্রততী দেখছে না কিছুই, শুধু তাকিয়েই আছে। সামনে এখন অসংখ্য রং ঝিলমিল ঝিলমিল, ব্রততীর চোখে সবই যেন বর্ণহীন। সবই যেন নীরস।

কেটে যাচ্ছে সময়। চায়ের কাপ শূন্য হল, প্যাটিসের প্লেট ফাঁকা হল..., কাটছে সময়। সহসা দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই ব্রততী চমকে উঠেছে। নটা দশ।

—মা, সময়টা দেখেছ?

—হুঁ, নটা তো বেজে গেল।

—তুমি কিন্তু বলেছিলে আটটার মধ্যে দিয়ে যাবে।

—তাই তো বলে গেল।

—আমি জানতাম এটা ঘটবে।

ব্রততী উঠে পড়ল। চঞ্চল পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তার পরে বড় রাস্তা, তাদের তিনতলা থেকে অনেকটা দূর অবধি দেখা যায়। পথে লোক চলাচল কমে এসেছে, বড় রাস্তার হ্যালোজেনের আলো আবছা হয়ে আছে কুয়াশায়। হঠাৎ হঠাৎ গর্জন তুলে ছুটে যায় বাস-মিনিবাস, তারা মিলিয়ে গেলেই আবার নির্জন চারদিক।

কার্তিকের কুয়াশামাখা ওই পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্রততীর বুকটা ছলছল করে উঠল। যদি আর না ফেরে তুতুন! যদি অতনু ওকে রেখে দেয়! শয়তানের বেহদ্দ, সব পারে। কথায় মিছরি ঢেলে ঢেলে হয়তো এমন করে ফেলেছে, মেয়েই আর আসতে চাইছে না। যদি তাই হয়, কী করে বাঁচবে ব্রততী।

ব্রততীর শরীরের রোম পলকে খাড়া। মাথা ঝিমঝিম করছে। হঠাৎই শীত করে উঠল খুব। মেয়ে যদি না ফেরে কী করে নিয়ে আসবে মেয়েকে? এক্ষুনি ছুটবে ও বাড়ি? যদি ওরা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়? থানায় যাবে? পুলিশ ডাকবে? বড়বাবুর নাকের সামনে গিয়ে নাড়াবে কোর্টের অর্ডারটা? পুলিশরা তো এ সবই চায়, খুব মজা পাবে যা হোক। হয়তো দাঁত ছিরকুটে হেসে বলবে, এসব সিলি ব্যাপারে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা যাবে না ম্যাডাম!

পিছন ঘুরে বসার ঘরের দিকে একবার তাকাল ব্রততী। মা দিব্যি নির্বিকার। বাবা ফিরে ফিরে দেখছে এদিকে। চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে নিল।

কী ভেবে ব্রততী ফিরল বসার ঘরে। অস্ফুটে বলল,—এবার তো আমাদের কিছু করতে হয় বাবা।

বিমল আরেক বার ঘড়ি দেখলেন,—খুব রাত তো হয়নি, আর কিছুক্ষণ দেখি।

—আমার কিন্তু ভালো লাগছে না বাবা।

—তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আলগা ঝেঁঝে উঠলেন মমতা,—সে তো কোনো চোর-ছেলেধরার সঙ্গে যায়নি। ডাকাত-গুণ্ডার আড্ডাতেও গিয়ে পড়েনি। অত ভাবছিস কেন?

—হুঁহ্, তুমি যদি বুঝতে। ব্রততীর স্বর তপ্ত থেকে করুণ হয়ে গেল,—বাবা, তুমি একটা কিছু করো।

—কী করি বল্ তো? ফোন করব?

—করে দ্যাখো।

ডায়ালের বোতাম টিপছেন বিমল, পাঁজরে খচখচ শব্দ বিঁধছে ব্রততীর। গলফ্গ্রিন থেকে ভবানীপুর কি এমন দূর, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন লক্ষ যোজন। বুঝি বা আকাশের ছায়াপথেরও ওপারে।

ফোন এনগেজড্। একবার নয় পর পর বেশ কয়েক বার চেষ্টা করলেন বিমল। মেয়ের কানেও ধরিয়ে দিলেন রিসিভার, দূরাগত ধ্বনি বধির করে দিল ব্রততীকে।

কম্পিত গলায় ব্রততী বলল,—কী হবে বাবা?

—তুইই বল্।

—যাবে সঙ্গে? দু'জনে মিলে গিয়ে দেখব.....?

ঠোঁট টিপে এক সেকেন্ড ভাবলেন বিমল। বললেন,—যাবি? চল্.....আমার পার্সটা এনে দাও তো। আর একটা পাতলা চাদর।

অপ্রসন্ন মুখে মমতা চাদর আর পার্স এনে দিয়েছেন স্বামীকে। গজগজ করছেন আপন মনে,—যেমন বাপ, তেমন মেয়ে। কারুরই এতটুকু ধৈর্য নেই।

মার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে বাবার পিছু পিছু বেরিয়ে এল ব্রততী। নামছে সিঁড়ি দিয়ে, ধকধক করছে বুক। একই সঙ্গে ঘাম হচ্ছে, শীত করছে, এ এক বিচিত্র অনুভূতি।

রাস্তায় এসে বিমলকে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কুয়াশা ভেদ করে খুঁজছেন কাউকে। নার্ভাস গলায় বললেন,—ট্যাক্সি ধরব?

—ধরো না। ধরছ না কেন?

—এদিকে এ সময়ে ট্যাক্সি পাওয়াও তো মুশকিল রে। এগিয়ে আনোয়ার শাহ্ রোডের দিকে যাই চল্।

—চলো। দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে!

পিতা-পুত্রী দশ পাও এগোয়নি, উলটো দিক থেকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা ট্যাক্সি শব্দ করে ব্রেক কষল। দরজা খুলে গেল। নেমে এসেছে তুতুন। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে হাত নাড়ছে অতনু। মেয়েও ফিরে ফিরে টা-টা করছে বাবাকে।

স্টার্ট নিল ট্যাক্সি। হুশ করে হারিয়ে গেল কুয়াশায়।

মেয়েকে প্রায় খামচে ধরেছে ব্রততী,—এত দেরি করলি কেন?

বাবা-মার বিচ্ছেদ তুতুনকে চার বছর বয়সেই অনেক সেয়ানা করে দিয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে বুদ্ধিমতীর মতো উত্তর দিল সে,—সরি মা। কারুর দোষ নেই। আমিই বুবলু-টুকুনের সঙ্গে খুব খেলা করছিলাম।

কাকে আড়াল করে তুতুন? বাবাকে? বাবার ওপর টানটাকে? নাকি নিজেকেই? সান্ত্বনা দিচ্ছে তুতুন, না কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছে?

মনে মনে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল ব্রততী। রাতে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল,—হ্যাঁ রে তুতুন, আমি আর তুই যদি দূরে কোথাও চলে যাই, কেমন হবে বল্ তো?

—কোথায় মা?

—দূরে কোথাও। দার্জিলিং-দিল্লি যেখানে হোক।

—বেড়াতে যাবে? কত দিন থাকব?

—ধর্ সারা জীবন। তুই যদ্দিন না বড় হোস।

—আর তোমার অফিস?

—সেখানেও একটা কাজ জুটিয়ে নেব।

অন্ধকারে চুপ করে রইল তুতুন। তারপর বলল,—কেন মা?

—এমনি। এখানে আমার ভাল্লাগছে না। সেখানে গিয়ে শুধু তুই আর আমি থাকব।...খুব মজা হবে, না?

আবার চুপ করে আছে মেয়ে। অনেকক্ষণ।

—কী রে, কিছু বলছিস না যে?

—আমরা চলে গেলে দাদু-দিম্মার কষ্ট হবে না?

—হবে। কী করা যাবে!

—তোমার দাদু-দিম্মার জন্য মন কেমন করবে না?

—করবে।

—কার জন্য বেশি মন কেমন করবে? দাদু, না দিম্মা?

—ওমা সেকি কথা। দু'জনের জন্যই মন কেমন করবে।

তুতুন একদম চুপ করে গেল। এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। যেন নিশ্বাসও নিচ্ছে না, এমনই নীরব।

নিজের কথাগুলোই কোনো অদৃশ্য পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঝনঝন করে উঠল ব্রততীর কানে। মেয়ের প্রশ্নে কিসের ইঙ্গিত? কী উত্তর দিল ব্রততী? বাবা-মা দু'জনের জন্যই সমান কষ্ট পাবে ব্রততী, অথচ মেয়ে শুধু মাকে নিয়ে ঝলমল করবে খুশিতে, এ ব্রততীর কেমন ধারার প্রত্যাশা?

এই আঁধারে সবই গোপন তবু তার মধ্যেও নিজের মনের লুকোনো চেহারাটা কী বিশ্রী কদর্য লাগছে। কেন এত হীন হয়ে যাচ্ছে ব্রততী। ঈর্ষা? প্রতিহিংসোপরায়ণতা? ক্ষোভ? পুঞ্জীভূত অভিমান? কার কাছ থেকে দূরে পালাতে চায় ব্রততী।

অসাড়ে চোখ দিয়ে জল ঝরছিল ব্রততীর। সে নিজেই যাকে ভুলতে পারেনি, মেয়ে তাকে ভুলবে কেমন করে!

বাজি

দিবানাথ ছিলেন আমার স্বামী। ছিলেন বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। ছিলেন শব্দটি বড় বেশি নেতিবাচক, এর মধ্যে বড় বেশি নেই নেই গন্ধ। এমনও হতে পারে দিবানাথ হয়তো এখনও বেঁচে আছেন। অবশ্য তাঁর মারা যাওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়। আমি তাঁর বাঁচা-মরার সঠিক সংবাদ জানি না।

আমার সঙ্গে দিবানাথের বিয়ে হয় আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে।

দিনটার তেমন কোনো বিশেষত্ব ছিল না, শুধু মনে আছে অঘ্রানের সেই দিনটিতে সকালের দিকে খানিকটা বৃষ্টি হয়েছিল। কাকভোরে যখন আমাকে দধিকর্মার জন্য ডেকে তোলা হয়, তখন কে যেন, বোধহয় আমার কোনো মাসি-টাসি হবে, বলেছিল এই অঘ্রানে হঠাৎ মেঘ এল কোত্থেকে! তা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল একদম, কাজেকর্মে সেদিন কোনো বিঘ্নই ঘটেনি।

কিন্তু আমার মনে যে মেঘ ছিল, সেটি সরল না। কারণ একটাই। এই বিয়েতে আমার একটুও মত ছিল না।

বিষয়টা তবে একটু বিশদ করা যাক। আমার বিয়ের ঠিক হয় আমি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর পরই। বিবাহ স্বামী প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে ততদিনে আমার একটা নিজস্ব কল্পজগৎ গড়ে উঠেছে। আমার কল্পনার স্বামী হবেন ফরাসি ধরনের দুরন্ত প্রেমিক, তাঁর রূপটি হবে গ্রিক দেবতার মতো, অথচ তাঁর বুকের মধ্যে থাকবে এক নিখাদ বাঙালি হৃদয়। রুচি সংস্কৃতি রসিকতাবোধ সব মিলিয়ে একটা দারুণ কিছু। যেমনটি আগে কেউ কখনও দেখেনি। দিবানাথের ছবি আমাকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল, সেটি দেখামাত্র আমার স্বপ্ন চৌচির হয়ে যায়। ওমা, এ যে এক গাঁট্টাগোট্টা কেজো মানুষ! একেবারে রসকষহীন দোকানদার দোকানদার চেহারা! তার ওপর কানে এল লোকটির লেখাপড়াও বেশি দূর নয়, স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর পরই মন দিয়েছেন পৈতৃক ব্যবসায়। বয়সেও তিনি আমার থেকে অন্তত বারো বছরের বড়।

তখনকার দিনে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের মতামত জানানোর রেওয়াজ ছিল না, তবে আমাদের বাড়ির হাওয়াটি ছিল একটু অন্যরকম। অনেকটাই খোলামেলা। বাবা শিক্ষকতা করতেন, আমার লেখাপড়ায় ছিল তাঁর ভীষণ উৎসাহ। গল্প লেখার একটা ভুতুড়ে শখ ছিল আমার, তাকেও তিনি খুব তারিফ করতেন। আমার স্বাধীন

চলাফেরাতেও বাধার সৃষ্টি করেননি কখনও। বাবা মানুষটি ছিলেনও ভারি আমুদে ধরনের। শক্তপোক্ত নয়, একটু ঢিলেঢালা স্বভাবের লোক, পড়াশুনা ছাড়া বাকি সময়টা তাঁর কাটত গানবাজনায়। কোথায় ফৈয়াজ খাঁ আসবেন, কোথায় আলাউদ্দিন খাঁ বাজনা বাজাবেন, কোথায় সারাফৎ হোসেন খাঁর গান হবে, এই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। নিজেও বাজাতেন তিনি। এস্রাজ। আমি তাঁকে একটুও ভয় পেতাম না। দিবানাথের ছবি দেখার পর তাঁকেই বলতে পেরেছিলাম, বাবা, আমি কি তোমার খুব বোঝা হয়ে গেছি?

মনে আছে সেই সন্ধ্যায় বাবা গুনগুন করে একটা বন্দেশ ভাঁজছিলেন। গোরি সুরৎ মন ভইরে হাঁরেমোরে। থমকে গিয়ে বললেন, কেন রে, কী হল?

—আমি এম. এ.-টা পড়ব ভাবছিলাম...

বাবাকে মুহূর্তের জন্য চিন্তিত দেখাল, বিয়ে তো আজ হোক কাল হোক করতেই হবে রে।

—তা বলে এক্ষুনি?

—এত ভালো ঘর, দেনাপাওনা নেই, ছেলেটার তোকে এত পছন্দ, এসব কি বারবার পাব?

পূর্ব ঘটনাটা আমি জানতাম। আমারই এক পিসতুতো দিদির বিয়েতে দিবানাথ নাকি দেখেছিলেন আমাকে। দেখেই মুগ্ধ। পরদিনই সম্বন্ধ নিয়ে তাঁদের বাড়ির লোক হাজির। কুটোটি দিতে হবে না, শাঁখাসিঁদুরে মেয়ে নিয়ে যাব আমরা।

আমি ঠোঁট ফুলিয়ে বাবাকে বললাম—বারে, আমার বুঝি একটা পছন্দ অপছন্দ নেই?

এতক্ষণে বাবার মুখে হাসি ফুটেছে,—দিবানাথ খারাপটা কী? ওদের অবস্থা এখন পড়তি, তাও তো আমাদের থেকে অনেক ভালো। কলকাতায় অত বড় একটা বাড়ি, ছেলেটাও খুব পরিশ্রমী, ব্যবসা ভালো চালাচ্ছে, বাড়িতে শাশুড়ি নেই, দেওর ননদ নেই, শ্বশুর অথর্ব, তুই তো রানি হয়ে থাকবি রে।

লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, তুমি চেহারাটা দেখেছ বাবা? লেখাপড়াও শেখেনি...

—ছি খুকি, মানুষের রূপ নিয়ে কখনও নিন্দা করতে নেই। সৌন্দর্য চামড়ায় থাকে না, থাকে অন্তরে। আর লেখাপড়ার কথাই যদি বলো, সে যা ব্যবসা করছে তাতে বি. এ., এম. এ. পাস করে তার কী এমন মোক্ষলাভ হত? ডিগ্রির মাপকাঠিতে শিক্ষাকে মাপতে যাওয়া সব সময়ে ঠিকও নয়।

বাবার আকস্মিক রূঢ়তায় আমি স্তব্ধ। এ যেন আমার নিত্যদিনের বাবা নয়, এক অচেনা মানুষ। পরে জেনেছি এই বিয়ে নিয়ে বাবারও প্রথমটা খুঁতখুঁতুনি ছিল, কিন্তু মা-ঠাকুমার চাপে তাঁর আপত্তি ধোপে টেকেনি। হয়তো নিজের ওপর

ক্ষোভটাই ফেটে পড়েছিল আমার ওপর। কে না জানে বাবাদের থেকে মায়েরাই মেয়েদের বিদায় করার জন্য বেশি উতলা হয়ে থাকে। তখনও। এখনও।

বিয়েতে আর প্রতিবাদ করিনি, কিন্তু একটা মেঘ উড়ে এসে বাসা বাঁধল বুকে। সজল মনে বিয়েটাও ঘটে গেল।

শুভদৃষ্টির সময়ে দিবানাথের দিকে তাকাইনি। তাকানোর ইচ্ছেও হয়নি। তবু নিজের অজান্তেই সপ্তপদীর সময়ে কী করে যেন চোখ পড়ে গেল। দেখলাম চন্দনচর্চিত হয়েও লোকটির চেহারা ছবির থেকে ঢের নিরেস। উচ্চতা মাঝারিও নয়, বেঁটেই বলা যায়। উজ্জ্বল আলোতেও কালো রং কেমন খসখস করছে। ঝাঁটার মতো বিশ্রী গোঁফও আছে একটা। এই মানুষের সঙ্গে সারাজীবন থাকব আমি? এক বিছানায় শোব? এই পুরুষের সন্তান ধারণ করতে হবে আমাকে?

বাসরটিও জমল না। আমার কয়েকজন সখী হাসি-মসকরার চেষ্টা চালিয়েছিল, কেতকী আদিরসাত্মক গানও ধরেছিল একটা, কিন্তু আমার স্বামীটি এমন গোমড়া নিষ্প্রাণ মুখে বসেছিলেন যে কেতকীরা আর বেশি দূর এগোতে সাহস পায়নি।

ফুলশয্যার রাতে দিবানাথের রূপ বদলে গেল। দরজা বন্ধ হতেই গোমড়া ভাব উধাও। রুক্ষ স্বরটিতে ছুনছুন গানের কলি। কানাকেষ্টর গান। ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে। ফুলশয্যার উপযুক্ত গানই বটে।

সংগীতচর্চা করতে করতেও আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন দিবানাথ। আমি কচি খুকিটি নই, কী কী হবে এখন আমার জানা, দু'দিনেই বিয়েটাকে ভবিতব্য বলে মেনেও নিয়েছি, তবু আমার গলা শুকিয়ে আসছিল।

এক সময়ে গান থামিয়ে দিবানাথ বিছানায় এসে বসলেন, তোমার নামটি ভারি সুন্দর। বসুন্ধরা।

আমি চুপ। আড়ষ্ট।

তিনি আবার বললেন, বসুন্ধরা মানে তো পৃথিবী, তাই না?

এরকম বোকা প্রশ্নের কোনও মানে হয়।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। হাতটি কাঁপছিল। বললেন, বসুন্ধরা নাম ডাকার পক্ষে ভালো না, ছোট করারও অসুবিধে আছে। বসুও কেমন যেন, ধরাও ভালো শোনায় না।

জড়সড় বসে থাকতে থাকতে এবার আমার হাসি পেল। কাঁধ ধরে দিবানাথ একটু কাছে টানলেন আমাকে, আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে খুকি বলে ডাকি? তোমাদের বাড়ির মতো?

বাইরে সানাই বাজছিল। একটানা। নহবতখানা বানিয়ে গোটা রাত সানাই বাদনের বন্দোবস্ত করেছেন আমার স্বামী। বন্ধ দরজা ভেদ করে সানাই-এর সুর আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছিল ঘরে। আলো বেশি নেই, বিশাল কক্ষে একটি মাত্র

বেডল্যাম্প জ্বলছে, আলো-আঁধারে সানাই-এর সুর অন্ধকারকে বেশি প্রকট করে তুলছিল যেন।

আমি ঝট করে বলে উঠলাম, আপনি আমাকে খুকি বলে ডাকবেন কেন?

—কেন, ডাকটা কি খারাপ? বলেই বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, বিচিত্র স্বরে খুকি শব্দটাকে উচ্চারণ করলেন দিবানাথ।

আমার রাগ হয়ে গেল, না, আপনি আমাকে খুকি বলে ডাকবেন না।

—মুশকিল হল! কী বলে ডাকি তা হলে? তুমি আমার থেকে এত ছোট...

—যা খুশি ডাকুন, কিন্তু খুকি নয়। পুরো নাম ধরে ডাকতে পারেন।

আমার স্বরে বোধহয় একটু তেজ ছিল, যাতে কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন দিবানাথ। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। বেশিক্ষণ থাকলেন না সেখানে, আবার ফিরে এসেছেন বিছানায়। আমার হাতে হাত। নাড়াচাড়া করছেন মীনমুখী বালা। গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন,—আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি, না?

সত্যি বলতে পারলে কী ভালোই যে হত!

—পছন্দ না হলেও উপায় নেই। হে-হে। আমার সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

মনে মনে বললাম—জানি।

—তোমাকে কিন্তু পুরো সংসারটারই দায়িত্ব নিতে হবে। বিয়ের ভিড় কাটলে সব কিছু বুঝেশুনে নাও। শুনেছ তো রোজগারপাতি আমি খারাপ করি না। সবই এখন থেকে তোমার জিম্মায় থাকবে। আমিও। বলেই প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে একটি চুম্বন সারলেন দিবানাথ। চুম্বন যে এত স্বাদহীন, কষ্‌টে হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না।

হায় ফরাসি প্রেমিক!

সংকোচ আর বিরক্তিমাথা মুখে আমি যখন পরবর্তী আক্রমণের অপেক্ষায়, দিবানাথ বললেন,—খাঁসাহেব সানাইটা কিন্তু দারুণ বাজাচ্ছেন।

আমি অনেক কষ্টে হাসার চেষ্টা করলাম, হাসি ঠিক ফুটল না।

দিবানাথ বললেন,—এক রাতে দুশো টাকা নিচ্ছে, ভালো বাজাবে নাই-বা কেন? কী রাগ বাজাচ্ছে বোঝো? দরবারি কানাড়া।

—আপনি ভুল করছেন। কাঁহাতক আর চুপ করে থাকা যায়! বলেই ফেললাম, ওটা মালকোষ।

—না, দরবারি কানাড়া। একটু যেন দমে গেলেন আমার স্বামী।

আমি শান্তভাবে বললাম,—আমি মালকোষ চিনি। দরবারির সঙ্গে মালকোষের তফাত হল, মালকোষের ক্ষেত্রে...

—চুপ। একদম চুপ। চাপা স্বরে হঠাৎই হিসহিস করে উঠলেন দিবানাথ, আমার

সঙ্গে তুমি তর্ক কোরো না। ওটা দরবারি কানাড়াই।

মানুষটার আকস্মিক রুদ্রমূর্তিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি আমি, তবু গোঁ ছাড়িনি,—উঁহু, ওটা মালকোষ।

—না, দরবারি কানাড়া।

—বাজি রাখবেন?

কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। ছোট্ট থেকেই এই আমার এক বিটকেল নেশা। দুধঅলা আসবে কি না তাই নিয়ে মার সঙ্গে বাজি ধরি। কাপড় কাচার লোকটা সপ্তাহে কটা কাপড় ফাটাবে তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে বাজি হয়। এ ছাড়া দাদা তো আছেই। যে কোনো ছুতোয় বাজির লড়াই চলছে ভাইবোনে। বৃষ্টি রোদ্দুর শিলপড়া, কবিতার লাইন, পরীক্ষার রেজাল্ট, কী নিয়ে নয়। আর মজার ব্যাপার, আজ পর্যন্ত বাজিতে আমি হারিওনি। বাবা ঠাট্টার ছলে বলতেন মেয়ের আমার বাজিলগ্নে জন্ম।

দিবানাথেরও যেন জেদ চেপে গেছে। বললেন,—রাখব বাজি।

—হেরে যাবেন কিন্তু।

—দেখা যাক। আধো অন্ধকারে দিবানাথের কালো কুচকুচে মণি দুটো জ্বলছিল,—হারলে কী দিতে হবে?

দুম করে বলে বসলাম,—আজ রাত্রে আমার পাশে শোবেন না। ছোঁবেনও না আমাকে। রাজি?

দিবানাথের নাকের পাটা ফুলছিল,—আর যদি তুমি হারো?

—বলুন আপনি কী চান?

দিবানাথ কথা বললেন না। দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট কয়েক পর ফিরে এসে নিঃসাড়ে খিল তুললেন। এক পা এক পা করে এগোলেন আমার দিকে। ক্রুর চোখে দেখছেন। যেন অন্যায়ভাবে তাঁকে ঠকিয়ে দিয়েছি আমি। হিংস্র দৃষ্টি সরালেন এক সময়ে। ঘরে বেতের সোফা ছিল, সেখানে আধশোওয়া হয়ে কাটিয়ে দিলেন রাত। ঘুমোননি। তাঁর আগুনের হল্‌কার মতো নিশ্বাস অঘ্রানের রাতকেও তপ্ত করে তুলেছিল।

জয়ের তৃপ্তি স্থায়ী হল না। পরের রাত্রেই আমাকে অধিকার করলেন দিবানাথ। আমাদের সম্পর্কে একটা শনি ঢুকে গেল।

দুই

দিবানাথ ছিলেন আমার শ্বশুরমশাইয়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান হওয়ার সুখ যেমন আছে, বিপদও কম নেই। এদের কামনায় কোনো লাগাম থাকে না। অনেক সময়েই তা সৃষ্টিছাড়া পর্যায়ে চলে যায়।

আমার শ্বশুর হরনাথ তাঁর বিয়ের পর পরই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর শরিকি বাড়ি ছেড়ে পৃথক হয়ে আসেন। নিজের ভাগটি বুঝে নিয়ে ভবানীপুরে একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন তিনি। সেই বাড়িতেই আমাদের বাস। দিবানাথের জন্মের বছর খানেকের মধ্যেই হরনাথের স্ত্রীবিয়োগ হয়, কিন্তু তিনি আর বিয়ে করেননি। কেন যে করেননি! করলে হয়তো দু-একটা ভাইবোন থাকত দিবানাথের। নিদেনপক্ষে সংসারে একটা নারীর ছোঁয়া থাকলে দিবানাথের মধ্যে নিষ্ঠুরতা হয়তো কিছু কম থাকত। হয়তো বা কিছু সুকুমারবৃত্তির বিকাশও হতে পারত তাঁর হৃদয়ে।

দিবানাথের নিষ্ঠুরতা ছিল ভিন্ন গোত্রের। শারীরিক নিগ্রহ তো দূরস্থান, কোনোদিন আমাকে একটি কটু কথা বলেননি তিনি। সত্যি বলতে কী, তাঁর নিষ্ঠুরতাকে ভালোবাসা বলে ভ্রম হওয়াও বিচিত্র নয়। কী করে যে বোঝাই সে কথা!

হত কি, রাস্তার গ্যাসবাতি জ্বলতে না-জ্বলতেই হাওড়ার কারখানা থেকে সোজা বাড়ি ফিরতেন দিবানাথ। মরিস মাইনর হাঁকিয়ে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আগেই পৌঁছে গেছেন দোতলায়। আমাকে একবার চোখের দেখা দেখে তবেই তাঁর স্বস্তি। যেন বা আমি এক অলীক মায়াবিনী, সকালে ছিলাম, বিকেলে মিলিয়ে যাব মহাশূন্যে। বাড়ির ঝি-চাকর কী ভাবছে পরোয়া নেই, শয্যাশায়ী বাবার পাশে দুদণ্ড গিয়ে বসবেন তা নয়, ঠায় বসে আছেন আমার সামনে। বসেই আছেন। আমারও তখন কাজ একটাই। পাথরের মূর্তি হয়ে শুধু বসে থাকা। কোনও অছিলায় উঠতে গেলেও ঘোর বিপদ। প্রথম প্রথম বুঝিনি। হয়তো বা পানের-বাটা আনতে গেছি, পরের দিন শ্যামার মা বরখাস্ত হয়ে গেল। জলখাবারের দেরি হচ্ছে দেখে রান্নাঘরে ঢুকেছি, ঠাকুরের চাকরি খতম! অতএব কী আর করা। বসে থাকো। বসে থাকো। বসে থাকো। নিস্তব্ধ। নির্বাক। আমার সঙ্গে তাঁর তেমন কথাই বা থাকত কই। কোন দিনই বা ছিল!

পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে বসে থাকতে মেয়েদের খারাপ লাগে না। পুরুষের চোখই তো মেয়েদের আসল আয়না। হোক সে আয়না আমার স্বামীর মতো ছ্যাতলা পড়া। কিন্তু আয়নার সামনেই বা কতক্ষণ আর স্থাণুবৎ বসে থাকতে পারে মানুষ।

আমার হাঁপ ধরছিল। বিয়ের ছ'-সাত মাসেই নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার দশা। মনে হত জলের ভেতর আমাকে ডুবিয়ে মাথাটি চেপে আছেন দিবানাথ, আর আমি

প্রাণপণে ছাড়ানোর চেষ্টা করছি নিজেকে। পারছি না। আর আমার কষ্ট, ছটফটানি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন আমার স্বামী।

তখনই আমার পুরোনো ভুতুড়ে শখটা চাগাড় দিয়ে উঠল। লেখার। যা প্রাণ চায় লিখব। যা মনে আসে লিখব। এও তো এক ধরনের অর্গলমুক্তি। ভেতরের কথাগুলো যদি প্রাণ পায়, তা হলেও তো একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারি।

একদিন বসেই গেলাম কালি-কমল নিয়ে। কাগজে ফুটে উঠল এক অন্ধ মেয়ের কাহিনি। মেয়েটা শুধু স্পর্শ দিয়ে সমস্তরকম রং অনুভব করতে পারে।

লিখতে লিখতে আমি তন্ময়, ফিরলেন দিবানাথ। মিনিট কয়েক বুঝি উসখুস করলেন আরাম কেদারায়, তারপর উঠে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন। একটু বিরক্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী করছ?

চেয়ার থেকে উঠলাম না, মুখও ঘোরালাম না,—লিখছি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু লিখছটা কী?

—গল্প।

দিবানাথের যেন সামান্য কৌতূহল হল। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন লেখাটা। দু-চার লাইন পড়ে তাঁর আগ্রহ উবে গেল। বললেন,—আমি এসেছি।

ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ খেলে গেল আমার,—দেখেছি তো। আর তাই তো নড়িনি এখান থেকে। তুমি বসে বসে আমাকে দ্যাখো, আমি লিখব।

পরের দিন লেখার কাগজগুলো পেলাম না, কলমটাও না। সারা দুপুর তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও নেই। নিমাইকে ডেকে নতুন কাগজ কলম কিনে আনালাম। আবার লিখছি। অন্ধ মেয়ের কাহিনি।

দিবানাথ সেদিন ফিরে ঠাট্টা জুড়লেন,—তোমার গপ্পো শেষ হল?

—কী করে হবে? কাগজ-কলমটাই যে হারিয়ে গেল।

দিবানাথ হাসছেন ফিক ফিক,—এ বাড়ির লোকজন লেখাপড়া মর্যাদা বোঝে না, ওসব ছেড়েই দাও।

—আর সারাক্ষণ তোমার সামনে সং-এর মতো বসে থাকি, তাই তো?

—থাকো না। ক্ষতি কী?

—দোহাই তোমার, আমাকে একটা কাজ নিয়ে থাকতে দাও।

—স্বামী খেটেখুটে ফিরলে তার সেবাযত্ন করাও বউয়ের কাজ।

—তুমি তো আমার সেবা নাও না। তার জন্য তোমার ঠাকুর-চাকর আছে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যেন গুমোট নেমে এল। মাথার ওপর চার ডানার পাখা ঘুরছে, তবু যেন বাতাস স্থির। কেউ যেন টুঁটি টিপে রেখেছে হাওয়ার।

পরদিন আবার কাগজ কলম নিরুদ্দেশ। আমি আর খুঁজলাম না, জানি খুঁজে লাভ নেই। নিতাইকে দিয়ে আবার আনিয়ে নিয়েছি কাগজ-কলম। আবার লিখছি।

এক অন্ধ মেয়ের কাহিনি।

দিবানাথ সেদিন খানিকটা ক্ষুব্ধ, যদিও তাঁর স্বরটি নীচু তারেই বাঁধা,—তোমার এই এক গপ্পো লেখা কি চিরকাল চলবে?

—শেষ করতে না দিলে তো চলবেই। সরাসরি দিবানাথের দিকে তাকালাম।

দিবানাথ এবার একটু মিইয়ে গেলেন। হাসলেন আলতো। শিশুরা দোষ করে ধরা পড়ে গেলে যেমনটি হাসে, ঠিক তেমনটি। সময় নিয়ে বললেন,—লিখছ, ভালো। কিন্তু এসব ছাইপাঁশ লিখে লাভ কী?

—তুমি বুঝবে না। যেমন আমাকে ঘটের মতো বসিয়ে রাখাটা আমি বুঝি না।

কথা বলতে আবার সময় নিলেন দিবানাথ। বললেন,—নিজে লিখবে, নিজেই পড়বে, এত পরিশ্রমের কী দরকার? লাইব্রেরি থেকে ভালো ভালো বই এনে দেব, দুপুরে পোড়ো।

কথাটা হয়তো দিবানাথ ভেবে বলেননি, কিন্তু কোথায় যেন বিঁধল আমাকে। বললাম,—আমার লেখা আমি একা পড়ব কেন? আরও অনেকে পড়বে।

—তুমি কি বাড়িতে আসর বসাবে নাকি? ওসব আমি পছন্দ করি না।

—আসর বসাব না। কাগজে পাঠাব। ছাপা হবে, লোকে পড়বে।

—তোমার লেখা...! ছাপা...! লোকে...! শব্দহীন হাসিতে আমার স্বামীর মুখ কেমন ভেঙেচুরে যাচ্ছিল,—তুমি কি পাগল?

মনে মনে বললাম, হতে পারলে বোধহয় ভালোই হত। মুখে বললাম,—তোমার কি ধারণা আমার লেখা ছাপার যোগ্য নয়?

হাসি থেমে গেল। হঠাৎই মনে হল দিবানাথ যেন হাসছিলেন না, হাসির ভান করছিলেন এতক্ষণ। মনের কোনও গোপন কথা লুকিয়ে রাখছিলেন হাসিতে। নীরস স্বরে বললেন,—তোমার কি সন্দেহ আছে? কোন মুখ্যু তোমার লেখা পুঁছবে? বাবার আদর পেয়ে পেয়ে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে।

এ-কথাগুলোও যেন মনের কথা নয়, আমাকে আঘাত করার জন্য বলা। অপমানে সংবিৎ হারালাম আমি। বলে উঠলাম,—বাজি? যদি আমার লেখা পূর্বাশায় ছাপা হয়।

সন্দিগ্ধ চোখে আমাকে দেখছিলেন দিবানাথ। বোধহয় ফুলশয্যার স্মৃতিটা কাঁটা ফোটাচ্ছিল বুকে।

আমি একদম সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম,—বাজি ধরতে ভয় পাচ্ছ?

—কিসের ভয়? আমি ভয়টয় পাই না।

—তা হলে বলো, যদি গল্পটা ছাপা হয়, তুমি আর আমাকে লিখতে বাধা দেবে না? ওই নোংরা কাগজ লুকোনোর খেলা খেলবে না?

দিবানাথ সরে গেলেন। ঘরে পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। নিজের কুকর্মের জন্য এতটুকু ছায়া নেই তাঁর মুখে। একটু পরে বললেন,—যদি ছাপা না হয় তা হলে কী হবে জানো? জীবনে কক্ষনো আর কাগজ-কলম ধরতে পারবে না তুমি। রাজি?

—বেশ, রাজি।

সত্যিই দু-তিন দিন আর বাধা এল না। গল্পটা মনের মতো করে লিখে নিজের হাতে ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। পূর্বাশায়। এখন ফলাফলের প্রতীক্ষা।

দিন যায়। দিন যায়। উত্তর আর আসে না। ভেতর থেকে এক গভীর অবসাদ ছেয়ে ফেলছিল আমাকে। বাজিতে না গিয়ে দিবানাথকে হাতে-পায়ে ধরে বোঝালেই কি ভালো হত? লেখার সময়ে কল্পনাতে যেটুকুনি আকাশ দেখতে পেয়েছিলাম, তাও কি মুছে গেল চোখ থেকে?

এমন সময়ে আমার শ্বশুরমশাই মারা গেলেন। আগেই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে অসাড় ছিলেন তিনি, দোতলার এক কোণে জীবন্মৃতের মতো বেঁচে ছিলেন, সন্ন্যাস রোগ তাঁর প্রাণটুকু হরণ করে নিল। আমার সঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের তেমন কোনো নৈকট্য গড়ে ওঠেনি, তাঁর মৃত্যুও তাই তেমনভাবে ছুঁতে পারল না আমাকে।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। দিবানাথ এমনিতেই স্বল্পভাষী, কথাবার্তা আরও কমে গেছে তাঁর। এ বাড়িতে এসে অবধি বাবার ওপর তাঁর তেমন টান দেখিনি, তবু যেন খানিকটা মনমরা দেখায় তাঁকে।

মাসখানেক পর একদিন দাদা এল বাড়িতে। খুশিতে চকচক করছে দাদার মুখ,—হ্যাঁরে খুকি, তুই পূর্বাশা পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছিলি নাকি?

আমার রক্ত ঝনঝন কেঁপে উঠল,—হ্যাঁ। কেন?

— জেনেও না জানার ভান করা হচ্ছে, অ্যাঁ? তোর লেখা তো বেরিয়ে গেছে। গত সংখ্যার আগের সংখ্যায়। ভাবিস বিয়ে দিয়ে পর করে দিয়েছি, কোনও খবর রাখি না? তুই একটা অন্ধ মেয়েকে নিয়ে ওরকম দারুণ গল্প লিখলি কী করে? আমার বন্ধুদেরও পড়িয়েছি। ও-রকম গল্প লেখা কি চাট্টিখানি কথা।

আরও কী সব বলেছিল দাদা আমার মনে নেই। তবে দাদা চলে যাওয়ার পর একটা সন্দেহ কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে। কাঠের দেরাজে দিবানাথের একটা নিজস্ব কুঠুরি ছিল, অফিসের কাগজপত্র রাখতেন সেখানে। খুলে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতেই যা ভেবেছি তাই। পূর্বাশাটি রয়েছে। পত্রিকার ভাঁজে পূর্বাশার সম্পাদকের চিঠিও। আমাকে লেখা। মাস চারেক আগে। আপনার সুলিখিত গল্পটি আমাদের চমৎকৃত করিয়াছে। আগামী সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত হইবে। আপনার স্বামী আমাদের দপ্তরে লেখাটির খোঁজ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে পূর্বেই সংবাদটি জানাইয়াছিলাম। আশা করি তাঁহার হস্তে প্রেরিত কিঞ্চিৎ সম্মানমূল্যটিও আপনি ইতিমধ্যে পাইয়াছেন। পূর্বাশার পাঠকমণ্ডলী আপনাকে আবার পাইতে ইচ্ছুক।

আপনি আরও গল্প পাঠাইলে বাধিত হইব।

চিঠি পড়ে এক অদ্ভুত শিহরন জাগল শরীরে। একদিকে মুক্তির অপার পুলক, অন্য দিকে এক তীব্র বিবমিষা। শিকল ছিঁড়ে গেছে আমার, তবু শরীর জুড়ে কেন এই তিৎকুটে স্বাদ।

আমি আমার স্বামীকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

তিন

দিবানাথ ছিলেন এক কথার মানুষ। তাঁর কারখানার লোকজন বাড়িতে আসত মাঝে মাঝে, তারা বলত দিবানাথবাবুর কোনো আবেগ উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু তিনি যা বলেন তাই করেন। মাইনে বাড়াবেন, তো বাড়াবেন। বাড়াবেন না, তো কিছুতেই বাড়াবেন না। যেখানে যে জিনিস যেদিন ডেলিভারি যাওয়ার কথা, পৃথিবী উলটে গেলেও সেখানে সেদিন মাল পৌঁছবেই। তাতে যদি তাঁর লোকসান হয়, তবুও।

কথাটা আমার বিশ্বাস হত না। যে মানুষের পেটে এত প্যাঁচ, সে কি এত সোজা হতে পারে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেদিনের পর থেকে সত্যিই তিনি আর আমার সাহিত্যসাধনায় কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন না।

উলটে আমিই এক নতুন প্রতিশোধের নেশায় মাতলাম। সারা দুপুর ঘুমোই, সন্ধে থেকে কাগজ-কলম নিয়ে বসি। আকাশ ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে, রাত নিশুত হয়, তারারা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। এক সময়ে ফ্যাকাসে হয় আকাশ, তারা নেবে, ভোর আসে ধীর পায়ে। আমি লিখতে থাকি। তখনও। একটি দিনের জন্যও দিবানাথ আমাকে টানেন না বিছানায়। অথচ বুঝতে পারি তিনি জেগে আছেন। তাঁর রক্তবর্ণ চোখ ধারালো ছুরি হয়ে ফালাফালা করতে চায় আমাকে। তবু কলম থামাই না সারারাত। কী লিখছি তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু লোকটা পুড়ুক। নিজের বাসনার আগুনে পড়ুক।

খেলাটা বেশি দিন চলল না। বড় জোর হপ্তা তিনেক। তারপর একদিন গা গুলিয়ে উঠল আমার, মাথা টলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বদ্যি, ছোটাছুটি করে চারদিক তোলপাড় করে ফেললেন দিবানাথ।

মেয়ে ডাক্তার এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আমাকে। হাসল।

কেউ একজন আসছে পৃথিবীতে।

দিবানাথ যেন খুশি হলেন না তেমনটা। প্রথম সন্তানের আগমনবার্তা বাবাদের প্রায় পাগল করে তোলে, সেই আনন্দের ছিটেফোঁটা নেই দিবানাথের মধ্যে। আমি কাগজ কলমে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে দেখি প্রায় সন্ধ্যাতেই ম্লান মুখে বসে আছেন আমার স্বামী। আকাশপাতাল কী যেন ভাবছেন। বুঝি বা নিজের সঙ্গে

ই কোনও জটিল বোঝাপড়া চলছে তাঁর।

এর মধ্যে একটা দুটো লেখাও ছাপা হল আমার। নিজেই পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করে আনলেন দিবানাথ, সম্পাদকীয় দপ্তরে কয়েকটা প্রশংসার চিঠি এসেছিল, সেগুলোও নিজেই নিয়ে এলেন হাতে করে। আনন্দিত মুখে নয়, নিখুঁত কর্তব্য সারার মতো। বুঝলাম বাজিতে হারাটা তাঁর রক্তে সয়ে আসছে।

আমার তখন পাঁচ মাস চলছে, দিবানাথের ম্লান ভাব অনেকটা স্তিমিত। বাড়ি ফিরে আমার শরীরের খোঁজখবর নেন, যত্নআত্তির ত্রুটি থাকতে দেন না, সামান্য হাসির কথায় অকারণে বেশি বেশি হাসেন। আমিও সহজ করার চেষ্টা করছি নিজেকে।

হঠাৎই একদিন পার্ক স্ট্রিটের নিলামঘর থেকে একরাশ কাচের পুতুল নিয়ে এলেন দিবানাথ। গাউনপরা পুতুল। শাড়িপরা পুতুল। ঘাঘরাপরা পুতুল।

আমি তো হেসে বাঁচি না,—তোমার হঠাৎ পুতুল দিয়ে ঘর সাজানোর শখ হল যে?

দিবানাথও হাসছিলেন,—এসব পুতুল আমার মেয়ের জন্য।

—মেয়েই হবে তোমায় কে বলল?

—মেয়েই হবে। আমি জানি।

—ধরো যদি ছেলে হয়?

—হতেই পারে না। আমি মেয়ে চাই। ফুটফুটে পুতুলের মতো একটা মেয়ে।

মেয়ের মধ্যে কি আমাকেই খুঁজতে চান দিবানাথ? মনটা পলকে বিষিয়ে গেল। যে শব্দটাকে মন থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম, সেই শব্দটাই ছিটকে এসেছে মুখ থেকে,—বাজি? আমি বলছি ছেলে হবে।

দিবানাথ যেন শুনতেই পেলেন না কথাটা। আনমনে বিড়বিড় করলেন,—না, না দেখো মেয়েই হবে।

—কক্ষনো না। ছেলে হবে।

দিবানাথ নিষ্পলক তাকালেন আমার দিকে।

আমি বলে উঠলাম,—বাজি মারতে সাহস হচ্ছে না?

দিবানাথের মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছিল। ঢোক গিলে বললেন,—ভয় কিসের? বাজি রাখাই যায়।

—শর্ত?

—তুমিই বলো।

—ছেলে হলে আর কোনও সন্তান চাইতে পারবে না তুমি। আর মেয়ে হলে তুমি যা বলবে তাই। মেয়েকে কীভাবে মানুষ করবে তাই নিয়েও আমি নাক গলাতে যাব না। রাজি?

দিবানাথ অস্ফুটে কী যেন বললেন, ঠিক শুনতে পেলাম না।

এতদিনে স্বামীর ওপর কেমন যেন মায়া জাগছিল আমার। মায়া, না করুণা? হৃদয় নিংড়ানো কোনও অনুভূতি নয়, তবু কেন যে বুকটা টলটল করে ওঠে!

কেন?

চার

দিবানাথ ছিলেন আমার একমাত্র ছেলের পিতা। কিন্তু তিনি কোনোদিন ছেলেকে একটুও ভালোবাসতে পারেননি। মাতৃসদনে সদ্যোজাত শিশুকে দেখে মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল তার। শুনেছি বাড়ি এসে তিনি নাকি সেদিন জলস্পর্শ করেননি। ছেলেকে তিনি কখনও কোলে নিতেন না, আদর করতেন না, তাঁর কাছ থেকে এক ধরনের নির্মম উপেক্ষাই পেয়ে এসেছে আমার ছেলে।

দিবানাথের ওপর যেটুকু মায়া এসেছিল আমার সেটুকুও চলে গেল। ওই উপেক্ষা দেখেই। দিবানাথকে বাদ দিয়ে এক পৃথক দুনিয়া নির্মাণ করে নিলাম আমি। আমার ছেলেকে নিয়ে। আমার লেখা নিয়ে।

ক্রমশ আমার লেখার জগৎ ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার প্রথম দিকের গল্পে বড় বেশি আবেগের বাহুল্য থাকত, আতিশয্য থাকত, নাটকীয়তা থাকত, সেগুলো ধীরে ধীরে কমে এল। আমার কলম হয়ে উঠল রুক্ষতর। কঠিন। তবে ভাষার নিপুণ আঁচড়ে হৃদয়ের আরও গভীরে পৌঁছতে সমর্থ হলাম আমি। অনেক নামী কাগজেই নিয়মিত আমার লেখা বেরোয়, ছোট হলেও কিছু ভক্তকুল তৈরি হয়েছে আমার। বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে চারটি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও হয়ে গেছে। সভাসমাবেশ, সাহিত্য আসর থেকে ডাক আসে মাঝে মাঝে, প্রায়ই এখান সেখানে যাই। পাঠক আর সমালোচকদের মতে আমি এখন বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখিকা।

ছেলেকেও আমি মনের মতো করে মানুষ করেছি। ছোট থেকেই সে পড়াশুনায়ও অত্যন্ত মেধাবী, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রীতিমতো ভালো রেজাল্ট করে খড়গপুর আই আই টি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। বছর পাঁচেকের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিল, ফিরে এসে এখানকারই এক বড়সড় প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে বহাল এখন। স্বভাবে সে যথেষ্ট শান্ত। বিনয়ী। আমি তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ বপন করতে পেরেছি। নিজের পছন্দমতো একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে সে। নাতিনাতনি, ছেলে, ছেলের বউ নিয়ে আমার এখন ভরাট সংসার।

এই দীর্ঘ সময়ে দিবানাথের প্রায় কোনো বদলই হয়নি। তিনি মূলত কর্মী মানুষ, কারখানা নিয়ে পড়ে থেকেছেন বরাবর। একটা সময় গেছে যখন সকালে উঠে

কাজে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন অনেক রাতে। মাঝে কারখানার অবস্থা কিছুকাল খারাপ গিয়েছিল। অর্ডার নেই, র-মেটিরিয়াল পাওয়া যাচ্ছে না, শ্রমিক অসন্তোষ লেগে আছে, এই সব। সে সময়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকতেন দিবানাথ, কিন্তু কখনও সান্ত্বনা খুঁজতে আসেননি আমার কাছে। আমার ওপর এক অদ্ভুত ক্রোধে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। ছেলে হওয়ার পর আমাদের বিছানা আলাদা হয়েছিল, ছেলে বড় হতে ঘরও আলাদা হয়ে গেছে। পাশের ঘরেই থাকেন, তবু যেন দূরত্ব বেড়ে গেছে বহু যোজন। কথাবার্তা হয় না যে তা নয়, তবে সে সব নিছকই মামুলি আলাপচারিতা। প্রাণহীন। শুকনো। আমার লেখা বা খ্যাতি সম্পর্কে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহী নন, আমিও তাঁর ব্যবসার হালহকিকত নিয়ে সামান্যতম কৌতূহল দেখাই না। সংসারে থেকেও দিবানাথ আমাদের সংসারের বাইরের মানুষ।

শুধু একটা জিনিস আমি টের পাই। বাবা আর ছেলের মধ্যে একটা চোরা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। দিবানাথের সঙ্গে সম্পর্কটা তেমন কাছের না হলেও বাবার ওপর একটা টান আছে ছেলের, দিবানাথও যেন খানিকটা মান্য করেন ছেলেকে। ছেলের পীড়াপীড়িতেই ইদানীং কারখানা যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন দিবানাথ। বাড়িতেই থাকতেন, সার সার টবে বনসাই করে দিনরাত পরিচর্যা করতেন তাদের। স্বাভাবিক একটা গাছকে জোর করে বাড়তে না দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের চাপা নৃশংসতা আছে, যেটা আমার একদম পছন্দ নয়। হয়তো সেই জন্যই বনসাই-এর প্রতি দিবানাথের এত আকর্ষণ! তবু বাধা দিইনি আমি। ভেবেছি, পাশাপাশি দুটো রেল লাইনের মতো কেটে যাক না জীবনটা। যেমন কেটেছে এতদিন।

কাটল না। নিয়তি বাধ সাধলেন।

গত বছর শীতের শুরুতে, রাত্রে শুতে যাওয়ার সময়ে, হঠাৎই আমার বুকে যন্ত্রণা শুরু হল। যন্ত্রণা মানে সে এক অসহ্য অনুভূতি। কেউ যেন আমার হৃৎপিণ্ডে ধারালো নখের আঁচড়ে টানছে। মুঠোয় চেপে নিষ্পেষিত করছে আমার ফুসফুস। দরদর ঘামছি আমি। আর্তনাদও করে ফেলেছিলাম বোধহয়। অমনি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছেন দিবানাথ। ছেলেকে ডাকার আগেই ডাক্তারকে টেলিফোন করেছেন, ডাক্তারের নির্দেশে রাতদুপুরে আমাকে নিয়ে নার্সিংহোমে ছুটেছেন।

ফাঁড়াটা কেটে গেল। সাত দিন পর ফিরে এলাম বাড়িতে। হৃৎপিণ্ডের বাইরের দেওয়াল বড়সড় ঝাঁকুনি খেয়েছে একটা, ভাঙেনি। পূর্ণ বিশ্রামে খাঁচা মেরামত হয়ে যাবে।

ফিরে আসার পর রোজ অনেক রাত অবধি আমার ঘরে বসে থাকতেন দিবানাথ। কথা নেই, শুধু নিঃশব্দ উপস্থিতি। এক সময়ের কুচকুচে কালো চোখের মণি ধূসর হয়ে এসেছে, হয়তো বা নিষ্প্রভও, তবু যেন সেই চোখ বড় জীবন্ত মনে হত আমার। মনে পড়ত এইভাবেই এক সময়ে আমার দিকে তাকিয়ে কত

সন্ধ্যা, কত রাত্রি কাটাতে চেয়েছেন তিনি, অথচ আমি ওই দৃষ্টি সহ্য করতে পারিনি। আজ পারছি। ওই চোখে এখন কোনো কাম নেই, মুগ্ধতা নেই, আসক্তি নেই, তবু ওই চোখে চোখ পড়লে কেন যে আমার গা ছমছম করে!

একদিন বলেই ফেললাম,—কী অত দেখো? আমি তো এখন বুড়ি!

দিবানাথ আলগা হাসলেন। কুদর্শন মুখমণ্ডলটি ওই হাসিতে বড় মায়াবি ঠেকল আমার। স্মিত মুখে বললাম,—আমার দিন তো ফুরিয়ে এল।

দিবানাথের চোখ মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল, পরক্ষণে আবার ধূসর। ওই নীরব ঝলসে ওঠাতে আমি আর তেমন নাড়া খাই না। আবার হাসলাম। বললাম,—রাগো কেন? সত্যিই আমার শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, বাঁচার আর শক্তি পাই না। এবার বোধ হয় যাব।

বহুকাল পর দিবানাথ আমার কপালে হাত রাখলেন,—উঁহু, তোমার আগে আমিই যাব।

—তা কী করে হয়! তুমি আমার থেকে অনেক শক্তসমর্থ আছ, রোগব্যাধির বালাই নেই। আর আমার তো প্রথম ঘণ্টা বেজেই গেল।

—বাজুক, তবু আমি আগে যাব।

হঠাৎই পাশার দানটা পড়ে গেল। তিন যুগেরও বেশি ভুলে থাকা কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে,—বাজি?

সহসা হাত সরিয়ে নিলেন দিবানাথ।

পড়ে থাকা দান ফিরিয়ে নিলাম না আমি। বললাম,—বাজি রাখতে ভয় পাচ্ছ?

দিবানাথ কখনও যা করেননি, তাই করলেন। আচমকা চিৎকার করে উঠেছেন,—না-আ-আ। আমি ভয় পাচ্ছি না। রাখলাম বাজি। একবারও কি তুমি হারবে না জীবনে?

দিবানাথের চিৎকার আর্তনাদ হয়ে মথিত করছিল রাতটাকে। নীলাভ অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। ঘরের প্রাচীন কড়িবরগাও যেন কাঁপছিল থরথর।

পরদিন থেকে দিবানাথকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এক হিমেল ভোরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন দিবানাথ।

পাঁচ

দিবানাথ নেই। না, নেই বলাটা ভুল। নেই শব্দটাতে একটা সমাপ্তি আছে। তিনি কোথায় আছেন, আদৌ আছেন কি না, আমি এখনও জানি না।

বাবাকে খোঁজার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেনি আমার ছেলে। পুলিশে খবর দিয়েছে, রেডিও, টিভি, খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিয়েছে বারকয়েক।

যেখান থেকেই খবর এসেছে ছুটে গেছে বারবার। প্রাইভেট ডিটেকটিভও লাগিয়েছিল, লাভ হয়নি। চুয়াত্তর বছরের দিবানাথ যেন কর্পূরের মতো উবে গেছেন।

হঠাৎই গত আষাঢ়ে বেনারস থেকে একটা চিঠি এল। কোন এক উষারঞ্জন নস্করের লেখা। আমার স্বামী নাকি জ্যৈষ্ঠ মাসে দশাশ্বমেধ ঘাটে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে উষারঞ্জনকে ঠিকানাটা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন যেন ঠিক এক মাস পর সংবাদটি তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেটাই নাকি ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছে।

বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল আমার। যে মানুষটা আমার জীবনে নেই, যাঁর অস্তিত্ব আমি বিয়ের দিন থেকেই মুছতে চেয়েছি, তাঁর মৃত্যুসংবাদ কেন এমন শূন্য করে দিল আমাকে!

ছেলে খবর পেয়েই ছুটে এসেছিল অফিস থেকে। কিন্তু চিঠিটা দেখে কেমন যেন বিশ্বাস হয়নি তার। চিঠির ভাষাটি যেন বড় বেশি বাবার ছাঁদ ঘেঁষা। সেই রাত্রেই ট্রেন ধরল বেনারসের, চারদিন পর মুখ কালো করে ফিরে এল। গোটা শহর চষে বেড়িয়েও কোনও উষারঞ্জন নস্করের সন্ধান পায়নি সে। দশাশ্বমেধ ঘাটেও চার-ছ' মাসের মধ্যে ও-রকম কোনও অসুস্থতা বা মৃত্যুর খবর জানা নেই কারও। ওখানকার কোনও হাসপাতালের না। পুলিশের না। আশপাশের লোকজনেরও না।

আমি আর কাগজ-কলম নিয়ে বসতে পারি না। বসলেও একটি অক্ষরও আসে না মাথায়। ছেলে নাতি-নাতনি আমার এত প্রিয়, তাদেরও আজকাল সহ্য করতে পারি না। ঘরে এলে দূর দূর করে বিদেয় করি। কাজের লোকেরা আমাকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করে। তারা কী বলে তাও আমি জানি। বলে, বুড়ো পালাতে বুড়ির মাথায় ছিট ধরেছে।

তা তো ধরেছেই। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাই কালোকুলো নির্বোধ লোকটা মরিয়া হয়ে একটা বাজি অন্তত জিততে চাইছেন। শেষ বাজি। আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে আগে পালাতে চান দিবানাথ।

বসুন্ধরা তা হতে দেবে না। এ বাজিটাও তাকে জিততে হবে।

বসুন্ধরা কি দিবানাথকে কম ভালোবাসে। ঘৃণা আর ভালোবাসায় কতটুকুই বা ব্যবধান।

উজান

মন যেন কখন কী চায়, মনই কি জানে? এই যে প্রতিবার পুজোর ছুটিতে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে নন্দিতা অথচ বাইরে এসে কদিন যেতে না যেতেই কলকাতার জন্য মন উথালপাথাল, আবার এই যে ফেরার পথে বুকের ভিতর আরেকটা অন্যরকম দানা দানা কষ্ট, এরকম কেন হয়! এসব সময়ে নন্দিতার স্নায়ু বড় বেশি টান টান হয়ে থাকে। একটু টোকা পড়লেই বিস্ফোরণ। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

শেষ মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোচ খুঁজে সিট বার্থের দখল নেওয়ার আগেই ছেড়ে দিয়েছিল ট্রেনটা। একটু আগের চাপা ভিড় অনেকটা হালকা হয়ে এলেও, এখনও এদিক ওদিক ঘুরছে যাত্রীরা, নিজেদের মালপত্র সামলাচ্ছে। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নন্দিতাও স্যুটকেস হোল্ডঅল খাবার প্যাকেট সব তুলে রাখছিল বাংকের উপর, এমন সময় হঠাৎই পাশে রাখা স্যুটকেসটার গায়ে চোখ আটকে গেল তার। ছাইরং স্যুটকেসের গায়ে কালোসাদা স্টিকারে জ্বলজ্বল করছে নামটা। রাকা রায়। নামটা বড় চেনা চেনা না! নন্দিতা পলকের জন্য থমকাল। পলকের জন্যই। পরক্ষণেই মন চলে গেছে অন্যদিকে। তাদের জানালার ধারের সিটটায় বসে আছে এক অবাঙালি তরুণ। গাঁট্টাগোট্টা। বছর চব্বিশেক বয়স। ছেলেটা এখানে কেন। এ সিটটা তো নন্দিতাদের। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার নিজেদের বার্থ নাম্বারগুলো মিলিয়ে নিল নন্দিতা। একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ। ঠিকই আছে। জানালার সিটটা তাদেরই। ছেলেটাকে উঠে যেতে বলবে! ভাবতে গিয়েই নন্দিতার খেয়াল হল রিমলি পাশে নেই। গেল কোথায়! এই তো ছিল!

নন্দিতা ছটফট করে উঠল,—রিমলি, রিমলাই-ই ...

নন্দিতার মেয়ে সাড়া দিল পাশের কুপে থেকে,—এই যে মা, আমি এখানে।

ওখানে কী করছিস তুই?

—কিছু না। জানালার ধারে বসে আছি।

—ওখান থেকে কোথাও যেও না যেন।

নন্দিতা অবাঙালি ছেলেটার পাশে বসে ওয়াটার বটল খুলে দু ঢোক জল খেল। জানালার বাইরে বিকেলের রোদ এখন ঝকমকে পিতলবরন। সেই রং মেখে দ্রুত পিছলে যাচ্ছে দিল্লির শহরতলি। হারিয়ে যাচ্ছে। নন্দিতার বুকটা আবারও হু-হু করে

উঠল। কোনো কিছু ফেলে যাওয়া সবসময়ই বড় কষ্টের। সবারই কি এরকম খারাপ লাগে! নাকি শুধু নন্দিতারই? জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নন্দিতা নিজেদের কুপটায় চোখ বোলাল আর একবার। নন্দিতা আর শ্যামলেন্দুর মুখোমুখি, সামনের সিটে অল্পবয়সি এক স্বামী-স্ত্রী। দেখেই বোঝা যায় নতুন বিয়ে হয়েছে। একটু ঘন হয়ে বসে এর মধ্যেই পরস্পর মগ্ন হয়ে গেছে কথায়। খুব ঝলমলে একটা সালোয়ার-কামিজ পরেছে মেয়েটি, হাতভর্তি এত্ত কাচের চুড়ি। ওদের পাশে, জানলার ধারের মহিলাটি নন্দিতারই সমবয়সি প্রায়। রীতিমতো সুন্দর। টকটকে ফর্সা রং। চোখ দুটো বেশ বড় বড় টানা। কানে দুল নেই। গলায় ইমিটেশন মফচেন। সিঁথির সিঁদুরটা ভীষণ সূক্ষ্ম। হাতের সরু সরু শাঁখা পলা বলে দেয় ভদ্রমহিলা বাঙালিই। ইনিই কি রাকা রায়? নাকি অন্য মেয়েটি? রাকা রায় নামটা আগে কোথায় শুনেছে নন্দিতা? কোথায় যেন?

নন্দিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল, —কলকাতায় যাচ্ছেন?

মহিলা হাসল ভারি সুন্দর করে, —হুঁ।

—একা?

—হ্যাঁ। সঙ্গে দাদার আসার কথা ছিল। আসতে পারল, না।

—দিল্লিতেই থাকেন?

—উহুঁ। কলকাতায়। দিল্লি এখন আমার বাপের বাড়ি। দাদা থাকে। মাকে নিয়ে।

—আমার দাদাও কিছুদিন দিল্লিতে ছিল।

কথাটা বলেই দুম করে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে নন্দিতা। দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা হঠাৎই কেমন চিড় খেয়ে গেল। অথচ একসময় তাকে কী ভালোই না বাসত দাদা। সেও তো। একটা বয়স অবধি দাদাই তো নন্দিতার একমাত্র আইডল। কেন এমন হয়? ভাইবোনের সম্পর্ক ছিঁড়ে যায় বিশ্রীভাবে। নাকি সব সম্পর্কের বেলাতেই নিয়ম এক। স্বার্থ এসে পড়লে সব সম্পর্কেরই ভিত নড়ে যায়। তা সে সম্পর্ক ভাইবোনেরই হোক, কি স্বামী-স্ত্রীর। কিংবা বাবা মা ছেলেমেয়ের। অথবা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর।

অবাঙালি যুবক এখন এমনভাবে ঝুঁকে বসেছে যে বাইরের পৃথিবীটা প্রায় চোখের আড়াল। নন্দিতার খুব খারাপ লাগল। কিছু কিছু মানুষ এমন স্বার্থপর হয়। কেমন অন্যের জায়গা জুড়ে নির্বিকার বসে আছে দ্যাখো।

সামনের মহিলা মুখ ফিরিয়ে দিব্যি বাতাস মাখছে মুখে, নন্দিতা কনুই দিয়ে আলগা খোঁচা দিল শ্যামলেন্দুকে, —ওই ছেলেটাকে উঠে যেতে বলো।

শ্যামলেন্দু হাতের কাজ সেরে যথারীতি একটা পেপারব্যাক খুলে বসেছে। নন্দিতার কথা প্রথমটা ঠিক মতো ধরতেই পারল না, —কাকে?

—চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছ না? বিরক্ত হলেও নন্দিতা বেশ নীচু স্বরেই বলছিল

কথাগুলো, —জানালার ধারের সিটটা আমাদের।

শ্যামলেন্দু পাত্তা দিল না, —ও এমনই বসেছে। বসুক না। উঠে যাবে।

নন্দিতার গলা উঠল, —হ্যাহ্ সবাই তোমার মতো উদার কিনা।

—আস্তে বলো। শ্যামলেন্দু ত্রস্ত চোখে চারপাশটা দেখে নিল। ভাবটা এমন যেন নন্দিতাই লোকটাকে উঠতে বলে কোনও গর্হিত আচরণ করে ফেলেছে।

নন্দিতা গুম মেরে গেল। এসব মুহূর্তে তার নিজেকে বড় অসহায় লাগে। শ্যামলেন্দু তার কোনো কথাই সহজে বুঝতে চায় না। এই যে এখন জানালার ধারে বসে প্রচণ্ড হাওয়ায় মাখামাখি হয়ে বুক ভরে একটু দম নিতে চাইছে নন্দিতা, এটাও মুখ ফুটে খুলে বলতে হবে। নতুবা শ্যামলেন্দু কিছুই বুঝবে না।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে নন্দিতা শেষে রিমলিকেই ডাকল,—রিমলি, এবার এদিকে চলে এসো।

রিমলি তক্ষুনি দৌড়ে এসেছে,—ওদিকের পাঞ্জাবিগুলো কী ভালো বাংলা বলে মা।

—ছি। নন্দিতা মেয়েকে শাসন করল,—ওকি কথার ছিরি, আঙ্কল বলতে পারো না?

রিমলি ঢোঁক গিলল,—সরি সরি। আঙ্কল। ওই আঙ্কলরাও না কলকাতাতেই থাকে মা।

—ঠিক আছে। আঙুল চালিয়ে মেয়ের চুল ঠিক করে দিল নন্দিতা,—এবারে এখানে বোসো।

—ওখানে আমি জানালার ধারে বসেছিলাম। উঁ-উঁ-উঁ।

নন্দিতা আড়চোখে শ্যামলেন্দুর দিকে তাকিয়ে নিল। মেয়েকে বলল,—এখন এখানেই বোসো।

—না আমি জানালার ধারে বসব।

—তোমার বাবাকে বলো।

জানালা দখলকারী যুবক রিমলির দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকলেও নির্ঘাত একবর্ণ ভাষা বুঝছে না, না হলে একটু লজ্জা তো পেত নিশ্চয়ই।

—ও মা.......

—আমি কী জানি, বললাম না বাবাকে বলো। সামনের জানালায় বসা মহিলা হুট করে বলে বসল,—তুমি এখানে বসবে? এসো। বোসো।

রিমলি মাথা নাড়ল,—দূর ওদিকে হাওয়া নেই। ওটা তো উলটোদিক।

নন্দিতারও ইচ্ছে নেই মেয়েকে সোজাসুজি হাওয়ায় বসতে দেওয়ার, তবু চুপ সে।

রিমলি শ্যামলেন্দুকে ঠেলা দিল,—বাবা, ও বাবা .....

শ্যামলেন্দুকে বই বন্ধ করতেই হল। নন্দিতার দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকেছে। বিনীত গলায় বলছে,—মাফ করনা ভাইসব, এ সিট শায়েদ হামারি হ্যায়।

—ম্যায় কানপুরমেহি উতর্‌ যাউঙ্গা।

শ্যামলেন্দু পাছে বিগলিত হয়ে পড়ে, নন্দিতা তাড়াতাড়ি হাল ধরে নিল,—হামারি লেড়কি উঁহা বৈঠেগি। আপ দুসরা কোই জগাহ ঢুঁড় লিজিয়ে।

শ্যামলেন্দু বলে উঠল,—নেই, নেই ইধর ভি বৈঠ সকতে হ্যায়।

—নেহি, ঠিক হ্যায়। আপলোক আরামসে বৈঠিয়ে।

নন্দিতার ইচ্ছে হল ছেলেটিকে নিজে একবার বসতে বলে, পারল না। আরও মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল তাতে। মাঝে মাঝে কী যে হয়ে যায় তার! লাগাম টেনেও মনের রাশ ধরতে পারে না। সামনের ওই দম্পতি, ওই হাসিমুখো মহিলা নিশ্চয়ই তাকে খুব দুর্মুখ ভাবছে। ইশ্‌শ্‌।

রিমলি জানালার ধারে বাবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে সামনের মহিলার সঙ্গে,—তুমি একা একাই যাচ্ছ? তোমার বুঝি ভয় করে না?

—উঁহু।

—আমাকে মা একা একা কোথাও যেতে দেয় না। মা খুব ভিতু।

নন্দিতা কথা বলে সহজ করতে চাইল নিজেকে,—মেয়ের কথা শুনেছেন? সব সময়ে এরকম পাকা পাকা কথা।

—পাকা পাকা কোথায়! বেশ মিষ্টি তো।

—মিষ্টি না ছাই। একটু পরেই আপনাকে পাগল করে ছাড়বে।

—না, না পাগল করবে কেন? মহিলা হাত বাড়িয়ে গাল টিপে দিল রিমলির,—চকোলেট খাবে? বলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাংক থেকে স্যুটকেস নামাল। রাকা রায় লেখা স্যুটকেসটা।

নন্দিতা থমকেছে নতুন করে। এই তবে রাকা যায়! রাকা রায় কার নাম? রানুদির জায়ের নাম? সিদ্ধার্থর বউ-এর নাম? ওফ্‌ফ্‌ফ্‌, মনে পড়েছে। রাকা তো অরুণের বউয়ের নাম। হ্যাঁ, রাকাই তো। অরুণ রায়ের বউ রাকা রায়। নন্দিতার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। এই রাকা রায় কি সেই রাকা রায়? দূর, তার দিল্লিতে বাপের বাড়ি হতে যাবে কেন? নন্দিতা যতদূর শুনেছে অরুণ যাকে বিয়ে করেছে সে শ্যামবাজারের মেয়ে। সুমিতা সেরকমই রিপোর্ট দিয়েছিল। না, না, এ সে নয়। একই নামে দুটো মেয়ে থাকতেই পারে। তবে সেও তো শুনেছে বেশ সুন্দরী। তা বলে কি আর এত সুন্দর?

মনে মনে হাজার যুক্তি সাজিয়েও কে জানে কেন কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছিল না নন্দিতা। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করতেও বুক টিপটিপ করছে। সত্যি যদি

সেই রাকাই হয়! শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের কাছে দ্বিধা হার মানল।

—আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। কলকাতায় কোথায় থাকেন বলুন তো আপনি?

- সাউথে। ভবানীপুর।

—ভবানীপুরের কোথায়?

—পূর্ণ সিনেমার কাছে।

পূর্ণ সিনেমা! নন্দিতার শরীরের সমস্ত শিরাউপশিরাগুলো এবার একসঙ্গে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে। আর কোনও সন্দেহই নেই। সে। সে'ই।

—আপনারা কোথায় থাকেন?

—রানিকুঠি। নন্দিতা আড়ষ্ট উত্তর দিল।

হৃৎপিণ্ডে পাগলাঘন্টিটা বেজেই চলেছে। রাকাও কি চিনতে পারছে তাকে? মুখ দেখে অবশ্য কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এমন হতে পারে মেয়েটা খুব নিখুঁত অভিনয় জানে। হয়তো প্রথম থেকেই চিনেছে নন্দিতাকে। হয়তো ইচ্ছে করেই...। হতে পারে, হতেই পারে। নন্দিতার কি কোনো ছবিই নেই অরুণদের বাড়িতে! আর কারও কাছে না থাক, অরুণের অ্যালবামে থেকে যেতে পারে এক-আধটা। অরুণ কি আর নন্দিতার সব ছবিই ফেলে দিয়েছে! এমনও হতে পার রাস্তাঘাটে কোনো দিন দূর থেকে রাকাকে দেখিয়েছে অরুণ, ওই দেখো, ওই যে যাচ্ছে, ওটাই নন্দিতা! নন্দিতা হয়তো দুরমনস্ক ছিল সে সময়! অরুণ বা রাকাকে সে খেয়ালই করেনি!

রাকার সঙ্গে কোনোরকমে দু-একটা দায়সারা কথা বলে নন্দিতা বাথরুম যাওয়ার নাম করে উঠে গেল। শহরতলি ছাড়িয়ে এসে ধাবমান এসি এক্সপ্রেসের গতি এখন উদ্দাম। বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে খোলা বাতাসের সঙ্গে এখন তার অসম লড়াই। পর্যুদস্ত বাতাস আছাড় খেয়ে পড়ছে বার বার। মাথা কুটে মরছে। সংকীর্ণ প্যাসেজটা ধরে, পর পর পরিপূর্ণ কুঠুরিগুলো পেরিয়ে টলমল পায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল নন্দিতা। বাথরুমে এসেও কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। পায়ের তলার জমি থরথর কাঁপছে। টাল সামলাবার জন্য নন্দিতা বেসিনের পাশের রডটাকে আঁকড়ে ধরল। আয়নায় ক্রমগত কেঁপে চলেছে আর এক নন্দিতা। কাঁপছে? না হাসছে হি হি করে?

—কী রে, বোকার মতো ঘাবড়ে গেলি কেন?

—অরুণের বউ যদি আমাকে চিনে ফেলে?

—ফেললে ফেলবে। তাতে তোর কী?

—আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

—অস্বস্তি হওয়ার কোনো মানেই হয় না। ওই অসভ্য বুনো দানবটা কাকে বিয়ে করল না করল, সেই বউ তোকে চিনল কি চিনল না তাতে কী এসে যায়! তুই

তো কোনোদিন কোনো অন্যায় করিসনি। ভয়টা কীসের?

—সেটা ঠিক কথা। আমার জীবনটা অরুণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। মারধর, অত্যাচার, অন্যায় রকম গার্জেনগিরি.....

—তবে? সামলে নে নিজেকে। তোর এখন নিশ্চিন্ত জীবন, স্বামী, মেয়ে...

নন্দিতা মুখচোখে জল দিয়ে বেরিয়ে এল। গোটা কম্পার্টমেন্টের লোকজন বৈকালিক আলস্য গায়ে শুয়ে বসে আছে এখন। ঝিমোচ্ছে। গল্প করছে। তাস খেলছে। একটা কূপে, অসংখ্য টিফিনবাক্স সাজিয়ে খেতে বসে গেছে এক অবাঙালি পরিবার। প্যাসেজের দিকের সিটে একটি মেয়ে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে। নন্দিতাদের প্যাসেজের সিটের বয়স্ক ভদ্রলোক দুজন কী যেন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নন্দিতা শ্যামলেন্দুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল,—কী গো বই মুখে করে বসে থাকলেই হবে? সেই কখন ভাত খেয়েছ। এগোরোটার আগে। খিদে পায়নি?

শ্যামলেন্দু বই বন্ধ করল,—হ্যাঁ দাও। কিছু খেতে-ফেতে দাও।

খাবারে টুকরিটা বাংক থেকে নামাতে নামাতে নন্দিতা এক পলক দেখে নিল রাকাকে। রিমলির সঙ্গে বকবক করে চলেছে মেয়েটা। নন্দিতা মেয়েকে বলল,—আয়। খেয়ে নে আগে।

গুমগুম শব্দ তুলে কোনও এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পিষে মাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছুটন্ত ট্রেন। স্টেশনে দাঁড়ানো একটি লোকের মুখও পরিষ্কার বোঝার আগে সোজা এক সর্ষেখেতে পৌঁছে গেছে। শেষ বিকেলের আলোয় হলুদ ফুলে লালচে আভা।

নন্দিতা বুঝতে পারছিল না রাকাকে কিছু খেতে বলার অনুরোধ করাটা উচিত হবে কি না। নতুন বিয়ে হওয়া ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গেও তবে ভদ্রতা করতে হয়। ছেলেমেয়ে দুটো দুজন দু জানালার দিকে তাকিয়ে এখন। রাকার চোখও বাইরের হলুদ প্রান্তরের দিকে।

রিমলি একমুখ সন্দেশ নিয়ে সামনের ছেলেটির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল,—কাকু ও কাকু তোমরাও কি কলকাতায় যাচ্ছ?

শ্যামলেন্দু বলল মেয়েকে,—ও কী! মুখে খাবার নিয়ে কথা বলছ কেন? কাকুর গায়ে পড়বে যে।

রিমলি সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ওয়াটার বটল মুখে লাগিয়ে জল খেয়ে নিয়েছে,—এবার কথা বলি?

রিমলির চোখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে ছেলেমেয়ে দুটো হেসে কুটিপাটি। রাকা আর শ্যামলেন্দুও।

ছেলেটি কাছে টানল রিমলিকে,—নাম কী গো তোমার?

—রিমলি। না না, প্রজ্ঞাপারমিতা আচার্য।

—ওরেহ্ বাবা। তুমি স্কুলে পড়ো?

—নিশ্চয়ই।

—কোন ক্লাস?

—নার্সারি টু। রিমলি উত্তর দিয়েই উলটো প্রশ্ন ছুড়েছে,—এটা বুঝি তোমার নতুন বউ?

কী করে বুঝলে?

—বারে, নতুন বিয়ে হলেই তো এতটা করে সিঁদুর পরে। আমার পিসিও পরত।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল, এখন বুঝি আর পরে না?

—কই আর পরে। বলতে বলতে রাকার দিকে হাত দেখাচ্ছে,—ওই আন্টিটার মতো পরে। সরু করে। একটু।

নন্দিতা মেয়ের মাথায় চাঁটি মারল,—অনেক হয়েছে। এবার চুপ করো।

—আহা বলুক না। ছেলেমানুষই তো বলছে। রাকা হেসেই চলেছে,—এরকম কটকটি বাচ্চা আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমার মেয়েটা আবার কথা বেশি বলে না। গুন্ডামি করে। ভয়ানক গেছো।

অরুণের মেয়ে হল কবে? এ খবরটা তো জানা ছিল না। অবশ্য জানার উপায়ও নেই আর। সুমিতাও বিয়ে করে সেই ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। ওর কাছ থেকেই অনেক খবরাখবর পাওয়া যেত অরুণের। নন্দিতার দৃষ্টি স্থির হল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। রাকা কি মেয়ের খবর ইচ্ছে করেই শোনাল তাকে! না শুধুই কথার কথা!

মুখ ফসকে নন্দিতা জিজ্ঞাসা করে ফেলল, কত বড় মেয়ে আপনার?

—এর থেকে বড়। পাঁচ পুরে এবার ছয়ে পড়বে। এই নভেম্বরে। তবু এখনও এত ...

নন্দিতা দ্রুত হিসেব করে নিচ্ছিল। ডিভোর্স হওয়ার পর পরই বিয়ে করেছিল অরুণ। মানে বছর সাতেক হবে। রাকা বলছে রাকার মেয়ে ছয় হয়ে যাবে। তার মানে এবার আর বিয়ের পর তর সয়নি অরুণের। অথচ তাদের বিয়ের পর নন্দিতার কোনো কথাতেই অরুণ কান দেয়নি,—এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা হলে লাইফের আর রইল কী?

—কেন? যাদের বাচ্চা হয় তাদের বুঝি লাইফ থাকে না?

—বাজে বোকো না তো। এখন তো ফুর্তি করার সময়। তা না, এখন থেকেই চ্যাঁ ভ্যাঁ, আমূলস্প্রে, গ্রাইপওয়াটার....। তা ছাড়া বাচ্চা হলে মেয়েদের ফিগার নষ্ট হয়ে যায়।

—আমি ফিগার নিয়ে মাথা ঘামাই না।

—আমি ঘামাই। লোকে কী বলবে? অরুণের বউটা একটা কুমড়ো পটাশ, হ্যাহ্। আমার বউ হবে দেখবার মতো। বুক ফুলিয়ে দেখাব সকলকে।

—বউ কি দেখানোর জিনিস?

—তা ছাড়া কী। সবসময় সেজেগুজে টিপটপ থাকবে।

অরুণ ছিল ওইরকম। সারা দিন ধরে শুধু উদ্দামতা, আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা। বন্ধুবান্ধব আর খেলার মাঠ নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকা। নিয়ম করে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেই মাঠে দৌড়ত। প্র্যাকটিস থেকে ফিরেই স্নান খাওয়া সেরে অফিস। খেলা থাকলে অফিস থেকে মাঠ সেরে একরাশ বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাড়ি ফিরত। তার পর সন্ধে থেকে রাত অবধি তাদের আসর। খেলা যেদিন থাকত না সেদিন বাইরে আড্ডা মেরে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। সেসব দিন মুখে আবার হালকা মদের গন্ধ। সব কিছুর পর রাত্রে আর এক প্রস্থ ভালোবাসার খেলা। সেই খেলায় নন্দিতার কোনও আলাদা ভূমিকা থাকতে পারবে না। ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকবে না। শুধু একপেশে নির্মম বাসনা মিটিয়ে যেতে হবে তাকে। মাগো, আর কিছুদিন অরুণের সঙ্গে থাকলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরেই যেত নন্দিতা।

নন্দিতার বন্ধুরা বলত,—ইশ্‌শ্‌, কী দেখে যে তুই পছন্দ করেছিলি অরুণকে? তোর সঙ্গে কোনো কিছুতেই তো মিল নেই। না শিক্ষা, না রুচি ......

নন্দিতা বোঝাতে পারত না ভালোবাসার জোয়ার এলে শিক্ষা, রুচি, বিচারবিবেচনা সব খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। অরুণকে তো সত্যি সত্যি এক সময় ভালোবেসেছিল নন্দিতা। অরুণের ঝোড়ো আবেগ চুম্বকের মতো টেনেছিল তাকে।

রাকার সঙ্গেও কি অরুণ বিছানায় সেই একই রকম আচরণ করে?

পুরোনো দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে নন্দিতা কুঁকড়ে গেল বিতৃষ্ণায়।

হেমন্তের বিকেল দ্রুত মরে আসছে বাইরে। কামরার ভিতরেও বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে তরল অন্ধকার। জানালার দিকে পিছন ফিরে বসে থাকা রাকার মুখে সেই অন্ধকারের ছায়া। রাকা কি এখনও চিনতে পারেনি নন্দিতাকে? বোধহয় না। স্বামীর আগের পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে কেউ কি এত সহজভাবে কথা বলতে পারে?

কাগজের কাপে কফি বিক্রি করতে এসেছে একটা লোক। ছেলেমেয়ে দুটো কফি খাচ্ছে। শ্যামলেন্দু আবার ডুবে গেছে বইয়ের পাতায়। লোকটা সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকতে কী ভালোই না বাসে। বাড়িতেও সারাক্ষণ মোটা মোটা বই। সংসারের কোনও খোঁজখবরই রাখে না। সংসার তো দূরে কথা, মেয়ে বউয়েরও না। নন্দিতার এক এক সময় মনে হয় সে বা রিমলি যদি সাত দিন বাড়িতে নাও থাকে, সেটাও বোধ হয় টের পাবে না শ্যামলেন্দু।

নন্দিতা রাকাকে জিজ্ঞাসা করল,—কফি খাবেন?

রাকা মাথা নাড়ল,—ও তো চিনি দেওয়া কফি।

—আপনি বুঝি চিনি খান না?

—খুব কম। বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছি।

নন্দিতা হেসে ফেলল,—কোথায় মোটা! বলতে বলতে চোখ নাচাল,—কত? ওজন কত?

—ছাপ্পান্ন কেজি। তাতেই আমার বর আর দেওররা যা খ্যাপায়।

কথাটা ঠং করে বাজল নন্দিতার কানে। বউ সম্পর্কে ন্নিম ন্নিম বাতিক এখনও তবে যায়নি অরুণের। এই বউ নিয়ে আদিখ্যেতাও নিশ্চয়ই অনেক বেশি। তার মতো তো আর মাজা গায়ের রং নয়, নাক চোখও অনেক তীক্ষ্ণ, ফিগারটাও। ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতর আচমকা একটা পিঁপড়ের কামড় অনুভব করছিল নন্দিতা। সুন্দরী বউ পেয়ে অরুণ তা হলে সুখেই আছে। তার উপর এমন স্বামী সোহাগিনী বউ। স্বামীর আড়ালেও মোটা না হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেই গ্রাম্য দেওরগুলোও নিশ্চয়ই বউদি বলতে অজ্ঞান এখন। অরুণ, বরুণ, প্রকাশ। সারা দিন ধরে তিনজন শুধু হাহা করে চিল্লোত, সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির চারবেলা একগলা করে ভাত গিলে গলির মোড়ে দাঁড়ির চিৎকার করে যেত ফুটবল ক্রিকেট হকি যা হোক একটা কিছু নিয়ে, গোটা পাড়া মাত করে রাখত। এই শান্ত সভ্য মেয়েটা কী করে মিলেমিশে আছে তাদের সঙ্গে।

গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। দুপাশে এখন ঘন জনপদ। শ্যামলেন্দু বাইরের দিকে উঁকি দিল। ঘড়িও দেখল একবার,—টুন্ডলা আসছে বোধ হয়।

নন্দিতা একটু স্বামীর গা ঘেঁষে বসল,—এখানে ভালো রাবড়ি পাওয়া যায় না?

শ্যামলেন্দু আড়মোড়া ভাঙল,— সে ইটাওয়াতে ভালো পাওয়া যায়।

—স্টেশন এলে একবার নেমে দ্যাখো না বাবা। আর আমাকে ওপরের ব্যাগটা একটু নামিয়ে দাও। দুটো মাফলার বার করব।

—তেমন তো একটা ঠাণ্ডা নেই।

—তা হোক। একটুতেই তোমার আর তোমার মেয়ের যা গলা ফুলে যায়।

শ্যামলেন্দু কথা বাড়াল না। এসব ক্ষেত্রে সে কথা বাড়ায়ও না। সংসারের ব্যাপারে কিংবা শ্যামলেন্দু রিমলির, নন্দিতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সিমলা থেকে কেনা দুটো নতুন মাফলার কিটব্যাগ থেকে বার করল নন্দিতা। সঙ্গে একটা পাতলা চাদর। রিমলি যে-কোনো মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, তখন লাগবে। টুন্ডলাতে ট্রেন থামতেই শ্যামলেন্দু ব্যস্তসমস্ত হয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

রাকা জিজ্ঞাসা করল,—আপনার স্বামী খুব কম কথা বলেন, তাই না?

—ভীঈষণ। শব্দটা উচ্চারণের সময় হঠাৎই এক ধরনের অহংকার ফুটে উঠল নন্দিতার গলায়,—ওর স্টুডেন্টরা বলে স্যার নিজেই নাকি একটা জ্যান্ত বই। বইয়ের মতোই নিঃশব্দ কিন্তু ....

—উনি কলেজে পড়ান?

—আগে পড়াত। আমি যে কলেজে পড়াই সেখানে। এখন ইউনিভার্সিটিতে

চলে গেছে। পড়াশুনো ছাড়া পৃথিবীর কিছুই বোঝে না। নিজের কানেই নিজের কথাগুলো সুর হয়ে যাচ্ছিল নন্দিতার। সে কি রাকাকে শোনাতে চাইছে কথাগুলো? না নিজেকেই শোনাতে চাইছে অরুণের চেয়ে অনেক বেশি গুণী, মার্জিত এক প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে ঘর করে সে এখন?

শ্যামলেন্দু কোলাহল ফেলে, ভিড় পেরিয়ে, রাবড়ির ভাঁড় হাতে নিয়ে ফিরে আসছে। সঙ্গে কয়েকটা শালপাতার ঠোঙা।

রিমলি দেখেই লাফিয়ে উঠল,—আমি খাব। আমি খাব। আমাকে দাও।

নন্দিতার ভুরু কুঁচকে গেল। এরকম আদেখ্‌লেপনা তার একদম পছন্দ নয়। তা ছাড়া রাকার সামনে....। নন্দিতা গম্ভীর মুখে বলল,—অসভ্যতা কোরো না। তোমায় ঠিক দেওয়া হবে। তবে তুমি আর এর পর জানালার ধারে বসবে না। ট্রেন ছাড়লেই গলায় মাফলার জড়াবে।

—না আমি জানালার ধারে বসব।

—না বসবে না।

রাকা রিমলিকে ভোলাতে চাইল,—তুমি জানালার ধারে বসতে চাও, তাই তো? ঠিক আছে, তুমি এদিকে এসে বোসো, আমি ও পাশে যাচ্ছি। তোমার মায়ের পাশে। জানালার ধারেও বসা হবে, হাওয়াও লাগবে না। খুশি?

নন্দিতা বিরক্ত হল। বেশ তো উলটোদিকে বসেছিল, পাশে কেন এসে বসতে চায়!

দুই

—আপনি কি খুব হই-হল্লোড় বন্ধুবান্ধব ভালোবাসেন?

—উঁহু। না তো।

—গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে শুধু ফুচকা আলুকাবলি ভেলপুরি খেয়েই চলে আসেন?

—না। একদমই না।

—হঠাৎ হঠাৎ ক্যানিং ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে যেতে কেমন লাগে আপনার?

—এটা ভালো লাগবে। যদিও যাইনি কখনও।

—একা একা বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগে?

—দারুণ।

রাকাকে একের পর এক প্রশ্ন করতে নিজের প্রশ্নগুলো নিজেই উপভোগ করছিল নন্দিতা। রাকা বুঝতেও পারছে না তার স্বামীর প্রতিটি পছন্দ অপছন্দ এখনও মুখস্থ আছে নন্দিতার। বিয়ের পর প্রথম প্রথম, হঠাৎ কোনো লক্ষ্য ছাড়াই নন্দিতাকে

নিয়ে বেরিয়ে পড়ত অরুণ। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠে ক্যানিং কিংবা ডায়মন্ডহারবার। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অরুণ নিজের মনেই বেসুরো গলায় গান ধরত। একবার বাসন্তী যাওয়ার পথে ভুটভুটিতে উঠে খুশিতে চুমুই খেয়ে ফেলতে যাচ্ছিল নন্দিতাকে। লোকজন সব হাঁ করে দেখছে, অরুণের ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই—আমার বউকে আমি আদর করব, কার বাবার তাকে কী? ফেরার পথে সেবার ক্যানিংয়ের মাছের আড়ত থেকে এক গাদা চিংড়ি কিনে ফেলল। সেই চিংড়ি সেই রাতেই রান্না করে খেতে হল বাড়ির সবাইকে। সব সময় লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, হই হই চিৎকার করে যাচ্ছে। একবার ডায়মন্ডহারবারে নদীর ধার ধরে দৌড়তে দৌড়তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ভাঙা লাইটহাউসটার আড়ালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য একই ভাবে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল—দেখেছ তো, একটুও দম কমেনি। বন্ধুরা বলে আমি নাকি হাফটাইমের প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছি।

সেই লোকটার সঙ্গে এই মেয়েটার মেলে কীভাবে!

নন্দিতা আবারও জেরা করল রাকাকে,—আপনি কি হিন্দি সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন? মানে বাজারে যেসব মারপিট নাচাগানার ছবি চলে আর কি?

—খুব একটা বাসি না। দেখি মাঝে মাঝে।

—মোগলাই খানা খেতে কেমন লাগে আপনার?

—খারাপ লাগে না। কিন্তু আপনি আমাকে এসব প্রশ্ন কেন করছেন বলুন তো?

নন্দিতা উত্তরটা এড়িয়ে গেল। পাশে রাখা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের প্যাকেট ফাঁক করে রাতের খাবারটা দেখে নিল একবার। ট্রেনের খাবার তার এমনিতেই ভালো লাগে না, আজ তো আর ইচ্ছে করছে না খেতে। শ্যামলেন্দু খাবার শেষ করে আপার বার্থের বিছানায় উঠে গেছে। আজই বোধহয় পেপারব্যাকটা শেষ না করে ছাড়বে না। সন্ধে নামার মুখে রিমলি একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিল, এখন আর দশটার আগে তার চোখে ঘুম আসবে না। পাশের কূপে তিন চারটে ছেলে তাস খেলছে রিমলি তাদের পাশে গিয়ে বসে আছে। বেড়িয়ে ফেরা এক দল ছেলের তাস খেলার এখন মুগ্ধ দর্শক সে। ছেলেগুলো খেলার থেকে হই হল্লাতেই বেশি আগ্রহী। মাঝে মাঝে হিন্দি গানের কলি গেয়ে উঠছে দু একজন। নন্দিতাদের কূপের ছেলেমেয়ে দুটো নীচু গলায় কথা বলতে বলতে ফিক ফিক করে হাসছে।

রাকা মোড়ক খুলে রুটি বার করল—বললেন না তো ওসব প্রশ্ন করলেন কেন?

নন্দিতা আলতো হাসল, ট্রেনে আলাপ হল, বন্ধুত্ব হল, বন্ধুর কী ভালো লাগে না লাগে জানতে নেই?

রাকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সে নন্দিতার কথা বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করানোর দায়ও নেই নন্দিতার। তার শুধু অবাক লাগছে, মেয়েটা তাকে দেখে একদমই চিনতে পারল না! আশ্চর্য! নন্দিতার তবে আর একটা ছবিও নেই অরুণদের বাড়িতে।

ও বাড়ি ছাড়ার সময় নন্দিতার তার বেশিরভাগ ছবিই নিয়ে এসেছিল। হ্যানিমুনের ছবিগুলোও। তবু একটাও কি...। অরুণ তাকে তবে পুরোপুরি মুছে ফেলেছে জীবন থেকে। কোনো স্মৃতিচিহ্নই রাখেনি।

নন্দিতার বুকটা টনটন করে উঠল। খাবারগুলো আরও বিস্বাদ এই মুহূর্তে। রাকা জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের কি জয়েন্ট ফ্যামিলি?

—নাহ্। বিশাল লম্বা একটা নিশ্বাস গড়িয়ে এল নন্দিতার বুক থেকে—আমার শ্বশুরবাড়ি নর্থবেঙ্গলে। কুচবিহার। ওখানে সবাই আছেন। শ্বশুর শাশুড়ি ভাশুর।

—কলকাতায় ভাড়া থাকেন?

—আগে থাকতাম। রিসেন্টলি আমরা একটা ফ্ল্যাট কিনেছি।

—আপনারা দুজনে বেরিয়ে যান, মেয়েকে নিয়ে প্রবলেম হয় না?

—সে তো একটু হয়ই। একটা রাতদিনের বিশ্বাসী লোক আছে, এই যা।

রাকা বলল—আমার অবশ্য সেদিক দিয়ে খুব সুবিধে। বাড়িতে শাশুড়ি আছেন, দেওর, জা। আমি অফিস গেলেও মেয়ে কখনও একা হয় না।

—আপনি চাকরি করেন! নন্দিতা বিস্ময়ে হতবাক।

—করি। ব্যাঙ্কে। আমার কর্তার ব্রাঞ্চে।

একটা ভয়ানক হিংস্র রাগ গুমরে উঠছিল নন্দিতার বুকের গভীরে। সে কলেজে চাকরি অ্যাপ্লিকেশন করছে শুনেই মুখ হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল অরুণের মার। অরুণ রাগে ফেটে পড়েছিল,—আমার বউ চাকরি করতে যাবে? কভি নেহি।

নন্দিতা যুক্তি দেখিয়েছিল—ভেবে দেখো, দুজনে চাকরি করলে কত সুবিধে হবে। এত বড় একটা সংসার .... তোমার একার উপর বেশি চাপ পড়ে যায়।

—তোমার পয়সায় আমি সংসার চালাব?

—চললে ক্ষতি কী। কত ভালোভাবে থাকা যাবে বলো তো। যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পারব, পছন্দসই জিনিস কিনব...

—কী পছন্দ মতোন জিনিস তুমি পাও না শুনি? এই তো সেদিন দেড়হাজার টাকা দামের একটা শাড়ি কিনে দিলাম। আসলে চাকরিটা ছুতো, তুমি এখন উড়তে চাইছ।

—মূর্খের মতো কথা বোলো না তো।

—মূর্খ জেনেই তো বিয়ে করেছিলে আমাকে। এই মূর্খের প্রেমেই হাবুডুবু খেয়ে তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে এসেছ বাড়ি থেকে।

—আমি ওভাবে কিছু বলতে চাইনি। তুমি মিছিমিছি জট পাকাচ্ছ।

সব কথা মুখে বলে বোঝাতে হয় না। হাবভাবে বোঝা যায়।

—তোমার মনটা এত নিচু?

রাগে, দুঃখে, অপমানে তিন দিন অরুণের সঙ্গে কথা বলেনি নন্দিতা। অরুণ

নরম হয়নি এতটুকু। সেই লোক নিজের অফিসের মেয়েকে বিয়ে করে দিব্যি সুখে ঘর করছে? কবে থেকে ভালোবাসা চলছিল রাকার সঙ্গে? নন্দিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে থেকেই কি? সেই কারণেই কি নন্দিতার সঙ্গে ....? নিজের অজ্ঞাতে গলায় ঝাঁঝ ফুটল নন্দিতার — বিয়ের অনেক আগে থেকেই আপনাদের তবে আলাপ বলুন?

—উঁহু। রাকা হাসছে ঠোঁট টিপে —আমি আগে একটা অন্য ব্রাঞ্চে ছিলাম, এই ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে আসার পরও সেরকম প্রেমটেম কোনোদিনই হয়নি। কলিগরাই প্ল্যান করে ...।

ও। তার মানে অরুণের দুর্ভাগ্যে কাতর সহকর্মীরাই ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। কিন্তু সুমিতা কেন নন্দিতাকে বলেনি রাকা চাকরি করে? নন্দিতার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবে না বলে? হয়তো তাই।

নন্দিতার বুকে ঢেউ ভাঙছিল ক্রমাগত। রাকার বেলায় চাকরি করা নিয়ে আপত্তি নেই অরুণের। অরুণের মা'ও দিব্যি মেনে নিয়েছেন ব্যাপারটা। খুশি মনে রাকার মেয়েকে সামলান দিনভর। এ চেতনাটা যদি ওদের আগে আসত!

নন্দিতাকে এখন কলেজে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে ভাবতে হয় রিমলি কী করছে, কী খাচ্ছে, স্কুল থেকে ঠিকমতো ফিরেছে তো। একটা যদি দেওর ননদও থাকত নন্দিতার! না হয় তারা তরুণ বরুণদের মতোই হত।

নন্দিতার সংসারটা বড় বেশি ফাঁকা ফাঁকা। রাকা জানালার কাচ নামিয়ে দিয়েছিল, নন্দিতা সেটা তুলে প্রায়ভর্তি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা ছুড়ে দিল বাইরে। পলকে এক ঝলক দমকা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়েছে গায়ের উপর। নন্দিতা জানালাটা বন্ধ করে দিল। বেসিনে হাত ধোওয়ার জন্য যেতে গিয়ে রিমলির উপর চড়াও হল, কী রে, তুই ঘুমোবি না?

—দ্যাখো না, এই কাকুটা আমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না।

ছেলেগুলো হেসে উঠল। একজন বলল, এই মিষ্টি মেয়েটা হাত ছোঁয়ালেই যা দারুণ দারুণ তাস উঠছে না বউদি।

আরেকজন বলল, বসুন না বউদি।

তাসখেলা নন্দিতার দু'চক্ষের বিষ।

ছেলেগুলোর আহ্লাদেপনা মোটেই পছন্দ হল না তার,—নটা বেজে গেছে। রিমলি, এবার ঘুমোবে চলো।

রিমলিকে বাথরুম-টাথরুম করিয়ে নিয়ে এসে নন্দিতা দেখল শ্যামলেন্দু নিচে নেমে সিগারেট ধরিয়েছে। কী সব কথা বলছে রাকার সঙ্গে। নন্দিতার শরীরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী আলোচনা হচ্ছে দুজনের!

রাকা নন্দিতাকে দেখে বলল, আমার এক জামাইবাবু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে

আছেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করছিলাম চেনেন কি না।

নন্দিতা শ্যামলেন্দুর দিকে তাকাল, তুমি নেমে এলে যে? বই শেষ?

শ্যামলেন্দু ঠোঁট ওলটাল, আলোটা বড় কম। চোখে লাগছে।

নন্দিতাদের শোওয়ার তোড়জোড় দেখে নতুন বর-বউ দু'জন ঈষৎ সন্ত্রস্ত। রাকাও যদি শুয়ে পড়তে চায় তাদের উঠে যেতে হবে নিজেদের বার্থে। দুজনেরই মনে হয় বেশ অনিচ্ছা তাতে।

শ্যামলেন্দুর সঙ্গে বিয়ের পর প্রথমবার বেড়িয়ে ফেরার সময় দারুণ ভিড় ট্রেনে উঠতে হয়েছিল। আগ্রা থেকে। ট্রেনে উঠেই উশখুশ করছিল শ্যামলেন্দু। নন্দিতার মনে হয়েছিল একটু বোধহয় পাশে আসতে চাইছে মানুষটা। ওমা, প্রথম সুযোগেই একটা বাংক খালি পেয়ে সটান শুয়ে পড়ল তাতে। নিচে সারা রাত ঠায় বসে নন্দিতা। পরে বুঝেছে ওই উদাসীন মানুষটার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক আচরণ। না হলে ওভাবে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কেউ! পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে দিতে।

ডিভোর্সের পর বাপের বাড়িতে থাকাটা তখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে নন্দিতার।

দাদাবউদির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততম পর্যায়ে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের জন্য বাপের বাড়ির চৌকাঠ যে কত উঁচু হয়ে যায়, প্রতি পলে তখন নন্দিতা টের পাচ্ছে। একলা থাকার জন্য একটা বাড়ি বা হোস্টেল খুঁজে খুঁজে হন্যে। কিন্তু একা মেয়েকে কে দেয় বাড়ি? পেয়িংগেস্ট থাকতে চাইলেও সহস্র জেরার মুখোমুখি হতে হয়। লেডিজ হোস্টেলের সংখ্যা বড়ই অপ্রতুল। এমন একটা সময়ে, চিন্তায় চিন্তায় পাগল নন্দিতা পরীক্ষার হল-এ শ্যামলেন্দুর গলা শুনেছিল, ম্যাডামকে খুব ডিপ্রেসড লাগছে কেন?

নন্দিতা উত্তেজনার মাথায় বলে ফেলেছিল—একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারেন? হোস্টেল-ফোস্টেল?

—কার জন্যে?

—আমার জন্য। বাড়িতে ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে। দাদা বউদি ... বলতে গিয়ে নন্দিতার সম্বিত ফিরেছিল, না, মানে, ওদের একটু অসুবিধে ...

শ্যামলেন্দু চিন্তিত মুখে উঠে গিয়েছিল চেয়ার থেকে। গোটা হল-এ বার কয়েক চক্কর মেরে পাশে এসেছে—আপনি আমার ফ্ল্যাট শেয়ার করতে পারেন। আমার এক্সট্রা ঘরও আছে। একা থাকি।

নন্দিতা স্তম্ভিত। লোকটা কি পাগল? না বদমাইশ? ডিভোর্সি মেয়েদের অনেক রকম অশোভন প্রস্তাব শুনতে হয় অনেক সময়, তা বলে শ্যামলেন্দু বলবে? যার কিনা সভ্য ভদ্র মার্জিত পণ্ডিত বলে এত সুনাম কলেজে? যাকে একটু আগেও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে নন্দিতা?

—আপনি কী বলছেন, আপনি জানেন?

—জানি। জানি বলেই বলছি। আপনার মানসিক অসুবিধে না থাকলে আমরা বিয়েও করে নিতে পারি।

নন্দিতা দপ করে জ্বলে উঠেছিল—আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।

দুদিন পরে করিডোরে তাকে একা পেয়ে আবার শ্যামলেন্দু বলেছিল, আমার প্রপোজালটা ভেবে দেখেছ?

নন্দিতার চোয়াল কঠিন। আপনি থেকে সোজাসুজি তুমি। একবার মনে হয়েছিল যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করে দেয়। কিন্তু শ্যামলেন্দুর মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্ব আছে যে খারাপ মনে হলেও খারাপ ভাবা যায় না তাকে।

শ্যামলেন্দু আবার ধরেছে তাকে—কী হল? ভেবেছ?

—না সময় পাইনি।

নন্দিতা একবার ভেবেছিল প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করে শ্যামলেন্দুর নামে। অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে শ্যামলেন্দুর মুখোশটা খুলে দেওয়ার কথাও ভেবেছিল একবার। কিছুই করতে পারেনি। নিজের সঙ্গে একা হলেও ওই শান্ত সৌম্য মিতভাষী শ্যামলেন্দু ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়। কেন যেন মনে হয়েছে ওই মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায়। তবুও দিনের পর দিন তাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে নন্দিতা। শ্যামলেন্দুও হাল ছাড়েনি। শেষে মরিয়া হয়ে নন্দিতা একদিন বলে ফেলেছে,—ভালো না বেসে শুধু ঘর শেয়ার করার জন্য একজন আরেকজনকে বিয়ে করতে পারে?

শ্যামলেন্দু বিকারহীন—আমি কি একবারও বলেছি আমি তোমাকে ভালোবাসি না? তবু মুখ ফুটে বলেনি আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে চাই। তোমাকে ছাড়া চাঁদ তারা ফুল পৃথিবী সব বৃথা।

নন্দিতা প্রশ্ন ছুড়েছিল,—আমার পাস্ট লাইফ সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?

—না জানার কী আছে। এ কলেজের প্রতিটি ইট কাঠ জানে। তোমার একটা ফুটবলার স্বামী ছিল, সে তোমাকে কিক মেরে গোলপোস্টের বাইরে বের করে দিয়েছে। তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

—কেন ঝগড়া হয়েছিল জানেন?

—অনুমান করতে পারি। নিশ্চয়ই বনেনি।

—আপনার সঙ্গেই যে বনবে তার নিশ্চয়তা কী?

—ট্রাই করতে দোষ কী। ইউ ক্যান স্টার্ট অ্যাফ্রেশ।

নন্দিতার মুখ থেকে দুম করে বেরিয়ে গেছে, আমার কিছু শর্ত আছে।

—জানি। তুমি তোমার মতো থাকবে। আমি আমার মতো। কেউ কারুর

ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় মাথা গলাব না। তাই তো?

নন্দিতা কেঁদে ফেলেছিল। হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করেছিল বেয়াড়াভাবে।

শ্যামলেন্দু কথা রেখেছে। অক্ষরে অক্ষরে। তবে কেন যেন নন্দিতার মনে হয় শ্যামলেন্দু যদি একটু জোর করেই ঢুকে পড়ত তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছায়, বেশি ভালো লাগত তার।

শ্যামলেন্দু টয়লেট থেকে রাত্রে পরার পাজামা পাঞ্জাবি পরে চলে এসেছে। সাদা পোশাকে রোগা লম্বাটে চেহারাটা আরও গুরুগম্ভীর। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, চওড়া কপালে ঝকঝকে তামাটে মুখ। নন্দিতার হাতে তোয়ালে ফেরত দিয়ে তরতর করে উঠে গেল উপরের বার্থে —আর কিন্তু আমাকে ডাকবে না। এক্কেবারে ভোরে উঠব। এগারোটা সাড়ে এগারোটায় কানপুর আসবে, তখন যদি চা খাওয়ার ইচ্ছে হয় কাচ তুলবে, চাঅলাকে ডাকবে। আমাকে নয়।

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করল, এয়ার পিলো নিয়েছ?

—এয়ার পিলোতে আমার ঘুম হয় না। চাদর মুড়িয়ে বালিশ করে নিচ্ছি।

রিমলি নন্দিতার কোলের কাছে ঘুমিয়ে কাদা। জোর করে একবার শোয়াতে পারলে ঘুম আসতে দেরি হয় না মেয়ের।

নন্দিতা রাকাকে বলল—এই হচ্ছে মেয়ে। এই হচ্ছে বাবা। পুরো কুম্ভকর্ণ ফ্যামিলি।

রাকা হাসল, যাই বলুন, আপনার হাজব্যান্ড কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম। কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও নন্দিতা তেমন খুশি হতে পারল না। অরুণ অনেক বেশি ম্যানলি ছিল।

তিন

কৃষ্ণপক্ষে গাছপালা খেতনদী সব কিছুরই উপর এক ছায়ার আস্তরণ দেখতে পায় নন্দিতা। চাঁদের আলো থাকলেও জ্যোৎস্নার মায়াবি আনন্দ যেন হালকা কালো পর্দায় ঢেকে রেখেছে কোনও অদৃশ্য জাদুকর। আঁধারমাখা কাচের মধ্যে দিয়ে দূরে এক আধটা বাড়ির টিমটিম আলো হঠাৎ মাটির বুকে তারার মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর কাচের গায়ে শুধুই নিজের মুখের আবছা প্রতিচ্ছবি। ঘুমন্ত কামরার মৃদু আলোয় নিজের সেই প্রতিচ্ছবিকেও কেমন আলৌকিক মনে হচ্ছিল নন্দিতার। রহস্যময়। কে সে! কী চেয়েছিল এত দিন ধরে! এখন কী চায়! কেন ওই সামনে শুয়ে থাকা মেয়েটাকে দেখে এত চঞ্চল হয়ে পড়েছে সে! তবে...! রাকা পাশ ফিরল সামান্য। বন্ধ চোখ খুলেছে, ঘুমোবেন না?

—ট্রেনে আমার ঘুম আসে না। বসে বসেই ঢুলে নিই একটু।

—আমারও আসে না।

—তা হলে শুয়ে রয়েছেন কেন? এদিকে এসে বসুন গল্প করি।

রাকার চোখ ছলছল করে উঠল,—মেয়েটার কথা মনে পড়ছে। কতদিন দেখিনি মেয়েটাকে। মার অসুখ শুনে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লাম..

—কবে এসেছিলেন দিল্লিতে?

—সেই ফার্স্ট অক্টোবর স্টার্ট করেছিলাম। আজ একুশ।

—মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই তো পারতেন।

—মাথা খারাপ? মেয়ের বাবা মেয়ে ছাড়া একদিনও থাকতে পারে না। মেয়েও চোখে হারায় বাবাকে। মা'র জন্য অত কান্নাকাটি নেই। ছোট্ট থেকেই। রাকা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল—শুধু তার বাবা কেন? ঠাকুমা কাকারাও এমনভাবে সারাদিন আগলে রাখে, ওদের মেয়ে কোথাও গিয়ে থাকতেও পারে না।

নন্দিতা সন্তর্পণে ঠাট্টা ছুড়ল এবার—মেয়ের মাকে বুঝি তার বাবা চোখে হারান না?

রাকা হেসে ফেলল, প্রথম প্রথম হারাত। মেয়ে হয়ে গেলে মায়েদের কি আর সে দর থাকে?

রাকার স্বর বলছে রাকারও কোথাও একটা গোপন কষ্ট হচ্ছে। কী সেটা? নন্দিতা খুব সাবধানে প্রশ্ন ভাঁজল, আপনার বর কেমন? আমার বরের মতো গোমড়ামুখো? না হাসিখুশি?

—মন ভালো থাকলে হাসিখুশি। মন বিগড়োলে গোমড়া।

—আপনার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন কেমন ছিলেন?

—সব ছেলেই যেমন থাকে। লাইভ্লি।

রাকার গলা কি একটু কেঁপে গেল? উত্তর দিতে একটু বেশি সময় নিল? নন্দিতা ঠিক বুঝতে পারল না। সে জানতে চেষ্টা করছিল কত তাড়াতাড়ি তাকে ভুলেছে অরুণ। একেবারেই কি ভুলে গেছে? এক সময় অরুণ যে তাকে সাংঘাতিক ভালোবাসত তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই। একটু পাশবিক, একটু উগ্র, এই যা। সেই অরুণ দিব্যি অন্য একটা মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে, এ কথা কী করে বিশ্বাস করে নন্দিতা? রাকা নির্ঘাত চেপে যাচ্ছে। হয়তো অরুণের বিষণ্ণ মুখটাই তাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি। হয়তো অরুণের অতীত যন্ত্রণাই পথ করে দিয়েছিল মসৃণ প্রেমের। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই তাই। নিজের মনে অরুণের নতুন করে প্রেমে পড়ার যুক্তিগুলোকে সাজাতে পেরে এক ধরনের তৃপ্তি পাচ্ছিল নন্দিতা। শ্যামলেন্দু বলত, নন্দিতা যদি তাদের বিয়েটাকে ম্যারেজ অফ লাভ না বলতে পারে, ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স বলতে আপত্তি কী। নন্দিতা আর শ্যামলেন্দুর বিয়ের সংজ্ঞা যদি তাই-ই হয় রাকা অরুণের বিয়েটাকে কী বলা যায়? ম্যারেজ আউট

অফ সিমপ্যাথি? না ম্যারেজ অফ ফিজিক্যাল নিড?

গুম গুম শব্দে ট্রেনটা একটা ব্রিজ পার হচ্ছে। নিশুত রাতে নদী পেরোনোর এই শব্দটা বড় বেশি প্রকট হয়।

রাকা উঠে এসেছে নন্দিতার পাশে। গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে।

নন্দিতারও শীত শীত করছিল। কোন অদেখা ফাঁকফোকর দিয়ে যে ছুরি ফলার মতো তীক্ষ্ণ বাতাস হানা দেয় রাতের ট্রেনে কে জানে! রিমলিটাও ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেছে। নন্দিতা মেয়ের গায়ে কম্বল ঢেকে দিল ভালো করে। অনেকক্ষণ পর কথা বলল, আপনার মেয়ের কোন স্কুল?

—সাউথ পয়েন্ট। আপনার মেয়ে?

—আপাতত পাড়ার একটা নার্সারিতে। দেখি এরপর ওয়ানে কোথায় ভর্তি করা যায়। আজকাল ভালো স্কুলে ভর্তি করার যা ঝামেলা।

—ঝামেলা বলে ঝামেলা। আমার মেয়েকে যে কী করে...। অবশ্য সব হ্যাপা আমার কর্তাই সামলেছে। সেই রাত থেকে লাইন দিয়ে ফর্ম আনা, অফিস কামাই করে মেয়েকে পড়ানো.....। কাকে সব ধরে টরে কাঠখড় পুড়িয়ে...। মেয়েকে ভালো স্কুলে দেওয়ার জন্য তো ওর ঘুম চলে গেছিল।

নন্দিতার বুক ফাঁকা হয়ে গেল। রিমলির লেখাপড়া নিয়ে শ্যামলেন্দুর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কিছু বলতে গেলে হেসে উড়িয়ে দেয় নন্দিতাকে, কুচবিহারে অনামী স্কুল থেকে পাস করে আমি যদি ইউনির্ভাটির মাস্টারিতে পৌঁছতে পারি, আমার মেয়েও যে কোনো স্কুলে পড়ে যেখানে পৌঁছবার ঠিক পৌঁছবে। তুমি নিজেই বা কী এমন কনভেন্ট বা পাবলিক স্কুলে পড়েছিলে?

নন্দিতা তর্ক করেও বোঝাতে পারে না সময় এখন অন্যরকম। ইঁদুরদৌড়ে নাম লেখাতে গেলে একটা দামি খাঁচার ভিতর ঢুকতে হয় আজকাল।

বোধহয় কোনো সিগনালে ট্রেনের গতি সামান্য কমেছিল, আবার সশব্দে দৌড়তে শুরু করেছে এক্সপ্রেস। নানা ভঙ্গিতে বেজে উঠছে ধাতব ঝঙ্কার। নন্দিতার মনেও সেই ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি? নাকি আর্তনাদ? গলার কাছে ,কটা চোরা কষ্ট ডেলা বাঁধতে চাইছে বারবার।

শ্যামলেন্দুই বা কম নিষ্ঠুর কীসে। অরুণ তার ইচ্ছা অনিচ্ছা জাহির করত গলার জোরে। একবার সিনেমা যেতে রাজি হয়নি বলে নন্দিতার হাত মুচড়ে দিয়েছিল। আর শ্যামলেন্দুর ইচ্ছা অনিচ্ছা এতই সূক্ষ্ম যে নিকটতম সম্পর্কের মানুষজনও তার হদিস পায় না। যখন পায় তখন অজান্তেই ওই নিস্পৃহ মানুষটার ইচ্ছা অনিচ্ছার শিকার হয়ে যায়। এতদিন সেটা ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পায়নি নন্দিতা। আজ যেন হঠাৎ এই রাতের গাড়িতে বসে উত্তেজনাহীন, নিরীহস্বভাব শ্যামলেন্দুর নাড়ির ঠিকানা পেয়ে যাচ্ছে সে। এই তো এবারই যেমন। এবার তো সমুদ্রে যেতে চেয়েছিল

নন্দিতা। একটি বারও আপত্তি না জানিয়ে মেয়েকে শুধু পাহাড়ের গল্প শোনাতে শুরু করল শ্যামলেন্দু। সমুদ্রে যাওয়ার কথা উঠতেই মেয়েরও বায়না শুরু। সে বরফের পাহাড় দেখবেই। এখন নন্দিতা বুঝতে পারছে রিমলি নয়, শ্যামলেন্দুই পাহাড়ে যেতে চেয়েছিল। এমন অনেক নিষ্ঠুরতা থাকে যার বিরুদ্ধে চিৎকার করা যায় না, দেওয়ালে মাথা ঠোকা যায় না, কেবল একটা শীতল বন্ধ জানালার ধারে বসে, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, বুক চেরা কষ্ট নিয়ে জেগে থাকতে হয় সারা রাত।

মাঝের বাংকে শুয়ে নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েটা ঘুমের ঘোরে এলোমেলো হাত বাড়াচ্ছে। যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে কাউকে। বিদ্রূপের হাসিতে নন্দিতার ঠোঁট বেঁকে গেল।

রাকারও দৃশ্যটা নজরে পড়েছে। নন্দিতার কানে কানে বলল, আহারে, এক বাংকে যদি শুতে পারত দুজনে।

নন্দিতার ঠোঁট থেকে বিদ্রূপ মুছে গিয়ে একটা অন্য ধরনের হাসি ফুটে উঠল, চান্স পেলে সেভাবেও যায় অনেকে। আমিই গেছি।

রাকার চোখে অবিশ্বাস, যাহ্।

নন্দিতা বলল, সত্যি। বম্বে যাওয়ার সময় প্যাসেজের দিকের বার্থ দুটো পেয়েছিলাম। গোটা রাত্তির ও একবারও উঠল না উপরে।

—তবে যে বলছিলেন উনি একটুও রোমান্টিক নন, অ্যাঁ?

— সে তো কথার কথা। একেবারে অন্য মানুষ ছিল সে সময়। বৃষ্টি পড়লে কিছুতেই আমাকে ছাতা খুলতে দেবে না। একই ছাতার নীচে দুজনকেই আধভেজা হতে হবে।

—ওমা তাই!

—লজ্জার কথা কী আর বলব। নিজে হতে শাড়ি গয়না পছন্দ করে কিনে আনত। এনেই হুকুম, শিগগির সব পরে এসো। দেখব তোমাকে।

রাকা খিলখিল করে হেসে উঠল—সত্যি আপনার বর...!

নন্দিতা আরাম করে সিটে মাথা রাখল। হাসল চোখ বুজে। মনে মনে বলল,— সেটা আমার বর ছিল না রে, তোর বর।

চার

—চোলিকে পিছে কেয়া হ্যায় চোলিকে পিছে ...

গানের কলিটা শুনেই পিত্তি জ্বলে উঠেছিল নন্দিতার। আড় চোখে দেখল রাকার ভুরুতেও ভাঁজ পড়েছে। শ্যামলেন্দু পাটনা থেকে কেনা ইংরেজি কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

মোকামা স্টেশন থেকে হা-রে-রে করে উঠে পড়েছে ছেলেগুলো। তার আগে, পাটনা ছাড়ার পর থেকেই অবশ্য ট্রেনে বেশ ভিড়। দিনের বেলাতে এ সব ট্রেনে রিজার্ভেশনের কোনও বালাই থাকে না। কন্ডাক্টর গার্ড, চেকার-ফেকার সব উধাও। ঠেলেঠুলে যে যেখানে পারছে জায়গা করে নিচ্ছে এখন। নন্দিতা আর রাকাদের সিটে জনা পাঁচেক দেহাতি বুড়ি বসে পড়েছে গাদাগাদি করে। ছেলেগুলোও নন্দিতাদের কুপের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

—চুনরি কে নীচে কেয়া হ্যায়, চুনরি কে নীচে ...

রাকা নন্দিতা শ্যামলেন্দু তিনজনই পরিষ্কার বুঝতে পারছে কাকে উদ্দেশ করে এই অশালীন উচ্ছ্বাস। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েটিকে দেখে পুলক আর ধরে রাখতে পারছে না ছেলেগুলো। মেয়েটি মাথা নীচু করে একটা ম্যাগাজিন পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির চোখমুখ লাল। চোয়াল শক্ত।

রাকা নন্দিতার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল, এসব রাফিয়ানগুলোর জন্য লং ডিসটান্স ট্রাভেল করাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আজকাল।

রিমলি হাঁ করে ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নন্দিতা মেয়ের ঘাড় ধরে তার মুখ জানালার দিকে ঘুরিয়ে দিল। শ্যামলেন্দু এখনও ইংরেজি দৈনিকের আড়ালে।

নন্দিতা নিচু গলায় শ্যামলেন্দুকে বলল, পাশের কুপের ছেলেগুলোকে ডাকো না। কিংবা ওদিকের পাঞ্জাবি ভদ্রলোকদের।

—লাভ হবে না। তার থেকে বরং ইগনোর করার চেষ্টা করো। কিউল-ফিউলে নেমে যাবে মনে হয়। মনে করো না মেট্রো চ্যানেলের গান শুনছ।

নন্দিতা চুপ করে গেল। জানে কথা বলে লাভও নেই। কলকাতার রাস্তাঘাটে হাঁটার সময় দু চারটে টিটকিরি যে তাকে শুনতে হয়নি তা নয়। শ্যামলেন্দু হয়তো তখন পাশেই তার। কখনও অপমানে নাকের পাটা ফুলে উঠলেও শ্যামলেন্দুর কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, ঘরদোরে পোকামাকড থাকে না? এগুলো হল রাস্তার পোকামাকড়। এদের টিকাটিপ্পনী গায়ে লাগাতে আছে? ঝেড়ে ফেলে দাও। মশামাছি তাড়ানোর মতো। নন্দিতার বলতে ইচ্ছে করছে, পোকামাকড় লোকে ঝেড়ে ফেলে না, মেরে ফেলে। বলেনি। বললেও শ্যামলেন্দু গায়ে মাখত না। ঠিক আরেকটা কোনও বক্তৃতা দিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত তার শান্তিপ্রিয়, বিদ্বান স্বামী।

নন্দিতার মাথা ঝাঁঝাঁ করে উঠল। অত্যন্ত অভব্য ভঙ্গিতে ছেলেগুলোর মধ্যে একজন মাঝের সরু প্যাসেজটায় ঢুকে দাঁড়িয়েছে। কারণ ছাড়াই ঝুঁকে পড়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে মেয়েটির গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মেয়েটি ভয়ে জড়োসড়ো। মেয়েটির বর আর নীরবে থাকতে পারল না। ভুল হিন্দিতে বলে উঠল,—ঠিক সে দাঁড়ানে নেই সকতা কেয়া?

সঙ্গে সঙ্গে বাকি ছেলেগুলো ভেংচে উঠেছে, কেয়া দাদা, ঠিক সে দাঁড়ানে নেই সকতা কেয়া?

একজন বিহারি ভদ্রলোক পিছন থেকে বোধহয় শাসন করার চেষ্টা করলেন ছেলেগুলোকে। উত্তরে যুবকের দল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

মেয়েটি ভয়ে কেঁদে ফেলে প্রায়। তার থেকেও বেশি ভয় পেয়েছে রাকা। নন্দিতার ডানহাতের কবজি চেপে ধরেছে প্রাণপণে। নন্দিতারও শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত ওঠানামা করছিল। বেশ বুঝতে পারছে সামনের ছেলেটি চিৎকার করে উঠতে চাইছে। সাহস পাচ্ছে না। আর কেউ যদি এগিয়ে না আসে, অতগুলো ছেলের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন? অক্ষম রাগে চোখমুখ তার দপদপ করছে।

ট্রেনটার গতি ক্রমে ধীর হয়ে এল। গুড়গুড় করে আওয়াজ বাজিয়ে একটা ব্রিজে উঠে পড়েছে গাড়িটা। উদ্ধত ছেলেগুলো চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গীর উদ্দেশে, আরে ও শামা, ছোড় দে দুলহানিয়াকো।

শ্যামলেন্দু নন্দিতার হাঁটুতে হাত রাখল—কিউল এসে গেছে। এবার সব নেমে যাবে।

সত্যিই তাই। ট্রেন পুরোপুরি থামার আগেই ধাক্কাধাক্কি করে নেমে যাচ্ছে ছেলেগুলো। প্ল্যাটফর্মে নেমে জানালার ধারে এসে হাসির ফোয়ারা তুলল ভাবটা এমন, কেমন মজা করলাম? ভয় দেখালাম তোদের?

ট্রেন ছাড়ার পর শ্যামলেন্দু নতুন করে খবরের কাগজে মন ডুবিয়েছে। যেন এতক্ষণ যা ঘটল তা কোনও স্বাভাবিক দৈনন্দিন ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। যেন এতক্ষণ ছেলেগুলোর হল্লাবাজিতে শুধু শুধু বিঘ্ন ঘটছিল তার পড়ায়। অথচ রিমলি যে রিমলি, সেও বেশ আহত হয়েছে ছেলেগুলোর বেলেল্লাপনায়। মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলছে,—তুমি মন খারাপ করো না আন্টি। দুষ্টু লোকগুলোকে বড় হলে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব।

ছেলেমেয়ে দুটো হাসার চেষ্টা করছে।

শ্যামলেন্দুর মুখেও মৃদু হাসি। নন্দিতার মাথা গরম হয়ে গেল। হঠাৎই ঝাঁঝিয়ে উঠছে শ্যামলেন্দুকে, হাসবে না একদম। তখন ভয়ে চুপ করে থাকলে...

শ্যামলেন্দুর মুখ থেকে হাসি মুছল না, —কী করতে পারতাম বলো। ওরা ওরকমই।

পারবে না যখন, তখন হাসবেও না।

ছেলেটি নিজেকে ঠাণ্ডা করার জন্যই বোধহয় উঠে গেল সামনে থেকে। মেয়েটি চোখ বুজে হেলান দিয়েছে সিটে। রাকা অসম্ভব রকম চুপচাপ।

নন্দিতা রাকার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। অরুণ থাকলে এতক্ষণে এই কামরায় যে একটা 'খুনোখুনি' কাণ্ড ঘটে যেত তাতে কোনও সন্দেহই নেই। একবার

ক্যানিং লোকালে দুটো ছেলে নন্দিতাকে চোখ মেরেছিল বলে সোজা গিয়ে দুহাতে দু'জনের কলার চেপে ধরেছিল অরুণ। কোনও প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি মেরেছিল একজনের চোয়ালে, লাথি চালিয়েছিল অন্যজনের পেটে। ছেলে দুটোও ছাড়ার পাত্র নয়। মুহূর্তে উলটো আক্রমণ হেনেছে। অরুণও নাছোড়বান্দা। মারপিট করতে করতে নাক মুখ কেটে রক্ত ঝরেছে তবু অরুণকে ছাড়াতে পারেনি আর সব প্যাসেঞ্জাররা। অবিরাম চিৎকার করে যাচ্ছিল অরুণ,—মেয়েদের হিড়িক দেওয়া, অ্যাঁ? শুয়োরের বাচ্চা, তোদের আমি চোখ উপড়ে নেব। লজ্জায় ট্রেনের দেওয়ালে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছিল নন্দিতার।

এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে শ্যামলেন্দুর জন্যও ট্রেনের দেওয়াল খোঁজা উচিত। ভাগ্যিস রাকা তাকে চিনতে পারেনি। চিনলে ভাবত এক কাপুরুষ নপুংসককে বিয়ে করেছে তার স্বামীর আগের পক্ষের বউটা।

রাগুক, মারুক, ধরুক একটা চনমনে উত্তাপ ছিল অরুণের মধ্যে। শ্যামলেন্দু বড় বেশি শীতল। যান্ত্রিক। ভিতু ধরনের। পড়াশুনোর জগতে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি করে যেন গোটা সাইবেরিয়া বুকের ভিতর পুরে রেখেছে লোকটা।

রাকা বুঝি পড়ে ফেলেছে নন্দিতার মনের ভাবটাকে। নরম গলায় বলে উঠল,—ওঁর ওপর অত রেগে যাচ্ছেন কেন? সত্যিই তো উনি একা কীই বা করতে পারতেন? দেখলেন না, এত ভদ্রলোক চারদিকে, কেউ জোর গলায় প্রোটেস্ট করল না।

নন্দিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—আপনার স্বামী থাকলে তিনি নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকতেন না।

রাকা বলল,— কে জানে। ওর সঙ্গে থাকা অবস্থায় এরকম সিচুয়েশনে তো পড়িনি কোনওদিন।

নন্দিতা মনে মনে বলল,—আমি পড়েছি। আমি জানি। অরুণ শ্যামলেন্দু নয়। অরুণের ভিতর প্রকৃত সাহস আছে। স্ত্রীর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসাও।

পাঁচ

মন যে কী চায়, মন কি তা জানে।

এই যে সারা সকাল ধরে, সারাটা দুপুর ধরে শ্যামলেন্দুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে ইচ্ছা করল না নন্দিতার, সারাক্ষণ ধরে শুধু অরুণের স্মৃতি রিনরিন করে বেজে চলল অন্তরে, বার বার মনে হল অরুণের সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না শ্যামলেন্দুর, অরুণ কম শিক্ষিত হয়েও অনেক বেশি সরল, সাহসী, সুন্দর, অনেক বেশি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সেই মনই সহসা কেন যে বিরূপ অরুণের উপর!

শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে ট্রেনটা আরও এগিয়ে যাওয়ার পর রাকা নিজের মনেই বলে

উঠেছিল,—এক ঘণ্টার ওপর লেট যাচ্ছে গাড়িটা। কে জানে কেউ স্টেশনে থাকবে কিনা।

মুহূর্তে নন্দিতার ভুরু জড়ো,—কার আসার কথা আছে?

—আসার কথা তো আমার বরেরই।

শ্যামলেন্দু বলল,—চিন্তার কী আছে? আমরা তো ভবানীপুরের ওপর দিয়ে যাবই, তেমন হলে আপনাকে ...

নন্দিতা নিথর। অরুণ স্টেশনে আসতে পারে শুনেই আতঙ্কে শিথিল হয়ে আসছে তার শরীর। ওই লোকটার সামনাসামনি পড়তে হবে! যে কিনা ঘাড় ধরে নন্দিতাকে বার করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। যে কিনা ডিভোর্সের পর পরই নন্দিতাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে আর একটা মেয়েকে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে।

রাকা বাথরুমের দিকে যেতেই নন্দিতা হিসহিস করে উঠল,—ওর বর আসবে কি আসবে না সেটা ওর ব্যাপার। গায়ে পড়ে উটকো ঝামেলা তোমার ঘাড়ে নেওয়ার দরকার কীসের?

—বাহ্, ভদ্রমহিলার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়ে গেল! অবিরাম গল্প করে গেলে! আর ট্রেন থেকে নামার সময় সে উটকো ঝামেলা!

নন্দিতা হাতের কাছে ভালো যুক্তি খুঁজে পেল না। পেল না বলেই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল স্পষ্ট ভাবে,—আমি হাওড়া পৌঁছে কারুর জন্য দাঁড়াব না। তুমি অপেক্ষা করে দেখো ওর স্বামী আসে কি না। তার পর দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে এসো।

শ্যামলেন্দু আরও গম্ভীর হয়ে গেল। গোমড়া মুখে স্যুটকেস হোল্ডঅল নামাচ্ছে বাংক থেকে। মুখ দেখে বোঝা যায় নন্দিতার আচরণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ সে।

শ্যামলেন্দুর কাছে ছোট হয়ে গিয়ে নন্দিতারও খারাপ লাগছিল। কী করবে? সব মানুষেরই এমন কিছু কথা থাকে যা কাউকে খুলে বলা যায় না। নিজের স্বামী বা স্ত্রীকেও নয়। রাকা বাথরুম থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে ফিরে এল। নন্দিতারা মোটামুটি নামার জন্য তৈরি। রিমলি ওয়াটার বটল কোলে করে বকবক করছে সামনের ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে।

রাকা নিজের স্যুটকেস মেঝেতে নামাল,—কাল রাত থেকে আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

নন্দিতা জানালা দিয়ে শহরতলির স্কাইলাইন দেখার ভান করছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে তাকাতে হল তাকে,—কী?

—কাল আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর দেননি কিন্তু।

—কোন প্রশ্ন?

—ওই যে আমি কী ভালোবাসি, কী বাসি না... কাল ওসব কেন জিজ্ঞেস করছিলেন?

—এমনিই। নন্দিতা লম্বা শ্বাস ফেলল,— স্রেফ কৌতূহল।

—কৌতূহল মিটল? কী বুঝলেন?

—সব কি আর কোনোদিন পুরোপুরি বোঝা যায়? সব কৌতূহল মেটে মানুষের? নন্দিতা মুখ হাসিহাসি রাখার চেষ্টা করল,—কিছুটা আন্দাজ পেলাম বইকি।

রাকা লঘু স্বরে হেসে উঠল—বেশ। আমার বর স্টেশনে এলে আলাপ করিয়ে দেব। ওঁর সঙ্গে কথা বললে আরেকটু আন্দাজ বাড়তেও পারে।

মন্থরগতিতে কারশেড পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ডাউনের গাড়ি। নন্দিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

ট্রেন দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রিমলিকে নিয়ে নন্দিতা আগে ভাগে নেমে পড়েছিল কামরা থেকে। রাকাকে অবাক করে দিয়ে। শ্যামলেন্দুকে মাল নামাতে একটুও সাহায্য না করে। নেমেই একটা মোটা থামের আড়ালে লুকিয়েছে নিজেকে।

শেষ সন্ধ্যাকালে গোটা স্টেশন চত্বর জুড়ে এখন অফিস ফেরত যাত্রীদের অবিরাম স্রোত। ভরা জোয়ারের মতো। সকলেই ঘরে ফেরার জন্য মরিয়া এখন।

নন্দিতার হাঁটু দুটো টিপটিপ কাঁপছিল। অবাধ্য চোখ বারবার ভিড় মাড়িয়ে খুঁজছে অরুণকে। অরুণ এসেছে কি আদৌ? হয়তো এসেছে। হয়তো আর সব কোচগুলোতে উঁকি মেরে খুঁজছে বউকে। মানুষ তো এভাবেই আপনজনকে খুঁজে বেড়ায়।

শ্যামলেন্দুও কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে ব্যস্ত চোখে খুঁজছে নন্দিতাকে। নন্দিতা এক দৌড়ে গিয়ে স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরল,—তাড়াতাড়ি চলো।

বলল বটে, তবুও কেন যে বেয়াড়া পা দুটো থেমে পড়তে চাইছে নন্দিতার। ফিরে ফিরে চোখ পিছন দিকেই যায়। একচিলতে দেখা যদি হতই অরুণের সঙ্গে ক্ষতি কী হত। ভাবতে গিয়ে ভাবনা হোঁচট খেয়েছে আচমকা। আশ্চর্য! একী বোকামি করল সে! অরুণ যে এই রাকারই স্বামী তা তো না'ও হতে পারে। নন্দিতা একবারও রাকাকে তার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করেনি। সম্পূর্ণ ঠিকানাটাও! পূর্ণ সিনেমার কাছাকাছি দুজন রাকা রায় থাকতেই পারে।

নন্দিতার পা দুটো পুরোপুরি নিশ্চল হয়ে গেল। ফিরে গিয়ে দেখবে!

থাক। যদি সত্যি সত্যি অরুণই হয়! যদি হয়!

ভিড়ের চাপে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। একটা বড় সড় ধাক্কায় কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল নন্দিতা, আবারও এক ধাক্কায় বুকটা ধক্ করে উঠেছে। শ্যামলেন্দু বা রিমলি কেউ আর নেই চোখের সামনে। দুজনেই ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

নন্দিতা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভিড় সরিয়ে সামনে এগোনোর চেষ্টা করছিল। কোথায় শ্যামলেন্দু! রিমলি কোথায়! কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বড় বেশি উটকো লোক এসে পড়েছে মাঝখানে।

হায়রে, নন্দিতা এখন কী যে করে!

অনুভব

ডালের হাতা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলেন প্রতিমা। এখনও নির্মাল্যর শুক্তোপর্ব চলছে। পাতে লেগে থাকা ঝোলটুকু কাঁচিয়ে নিচ্ছেন নির্মাল্য, এক মনে আঙুল চাটছেন।

এক মনে, না আনমনে? এইবার বেয়াইমশাইয়ের ধরনধারণ অন্যরকম, লক্ষ করছেন প্রতিমা। বড় শান্ত চুপচাপ ধরনের হয়ে গেছেন নির্মাল্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় প্রাক্তন ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার যেন এখন অতীতের মলিন ছায়া। আগের মতো গমগম হাসি নেই, হঠাৎ হঠাৎ রসিকতা নেই, তিনবার ডাকলে একবার সাড়া পাওয়া যায়, পাঁচ দশ মিনিট আগে কথা বেমালুম ভুলে যান, সাধারণ প্রশ্ন করলে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকেন। বুড়ো বয়সে বউ মরে গেলে পুরুষমানুষের কি এই দশাই হয়?

প্রতিমা গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করলেন,—শুক্তোটা ভালো হয়েছে বেয়াইমশাই?

নির্মাল্য নড়েচড়ে উঠলেন,—অতি উত্তম। আহা, যেন অমৃত।

—দেব আর একটু?

—না, থাক। ভালো জিনিস অল্পই ভালো। বেশি খেলে ভালোর স্বাদ মরে যায়।

উলটোদিকের চেয়ারে সিতাংশু ডালের প্রতীক্ষায় ভাত ভেঙে বসে। টেরচা চোখে বেয়াইকে দেখতে দেখতে তিনি বলে উঠলেন,—এত ভালো লাগল? আমার তো মনে হল তেতো একটু বেশি হয়ে গেছে।

—তাই কি? না না। একেবারে মাপা তেতো, মাপা নুন, মাপা মিষ্টি.....

—সবই মাপা? সিতাংশু বাঁকা হাসলেন,—তা হলে বোধহয় আমারই জিভের দোষ।

বটেই তো, বটেই তো। সারাটা জীবন যে লোক বউয়ের ত্রুটি খুঁজে বেড়ান তাঁর আর এ ছাড়া কীই বা মনে হবে। সাধে কি প্রতিমা রান্নাঘরে যাওয়া ছেড়েছেন। এহ্, পোস্ত একেবারে আলুনি করে ফেলেছ, বাঁধাকপিতে মণখানেক চিনি ঢালার কী দরকার ছিল, নাদা নাদা আলু দিলেই কি তরকারি ভালো হয়—এই তো সব মন্তব্যের ছিরি! কতকাল পর মাত্র কটা দিনের জন্য ছেলের শ্বশুর এসেছেন বাড়িতে, পোলাও মাংস কালিয়া কাবাব নয়, রোজ একটা কি দুটো নিরামিষ পদ স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন প্রতিমা। সামান্য নারকেল কুমড়ি কি মোচার ঘণ্টা কি শুক্তুনি, তাই

সোনা মুখ করে খেয়ে শ্রীহারা মানুষটা এক-আধটা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করছেন, অমনি টিপ্পনী শুরু হয়ে গেল!

প্রতিমা হড়াস করে স্বামীর পাতে ডাল ঢেলে দিলেন। গোমড়া মুখে বললেন,—বেগুনভাজা দেব?

—প্রাণ চাইলে দেবে।

—তোমার তো আবার শতেক প্যাখনা। লম্বা ফালি চলবে না, কালো হয়ে গেলে মুখ ভ্যাটকাবে..। সিতাংশুর থালায় অবহেলাভরে ভাজা বেগুন ফেলে আবার নির্মাল্যর প্রতি মনোযোগী হলেন প্রতিমা। কানে লেগে থাকা ক্ষণপূর্বের স্তুতির রেশটুকু ফেরাতে চাইছেন। মুখ হাসি হাসি করে বললেন,—আপনার আবার বেশি বেশি। ওই কচু ঘেঁচু শুক্তোকে কেউ অমৃত বলে না।

—আমি বলি। নির্মাল্যর সরল উত্তর, আপনার বেয়ান চলে যাওয়ার পর থেকে এ সব রান্না আর জোটে কই!

—কোথায় বেয়ানের রান্না, কোথায় আমার!

—অমন করে বলছেন কেন? আপনার বেয়ানের হাত একরকম ছিল, আপনার আর একরকম। দুটোই ভালো, তবে দুরকম।

—হ্যাঁ, একজনেরটা চিনি, অন্যজনেরটা গুড়। দুটোই মিষ্টি, কী বলেন?

কড়া চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন প্রতিমা। টুকুস চিমটি কেটে সিতাংশু নির্বিকার, হ্যা হ্যা হাসছেন। সামনের মানুষটা তাঁর ব্যঙ্গে ব্যথিত না উদাস, সে দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘরে এসে সিতাংশুকে ধরলেন প্রতিমা,—তোমার কী আক্কেল গো? অভাগা মানুষটাকে অমন হুল ফোটাও কেন?

সিতাংশু হাই তুলতে তুলতে দিবানিদ্রাকে আহ্বান জানাচ্ছেন। অলসভাবে বললেন,—খারাপ কী বলেছি? আগেও তো কতবার এ বাড়ি এসেছেন, এমন গদগদ প্রশংসা তো কখনও শুনিনি! কেন, তখন বউ পাশে থাকত বলে?

—কী ছি, কী ভাবা! বেচারার বউ মারা গেছে এখনও বছর ঘোরেনি........

—তো? তার জন্য তোমার রান্না নিয়ে আদিখ্যেতা মেনে নিতে হবে?

প্রতিমা চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠলেন,—আমার রান্না নিয়ে দুটো ভালো কথা বলা মানে আদিখ্যেতা? নিজের মুখে মধু নেই বলে.....

—মধুবাক্যেই গলে গেলে গিন্নী? সিতাংশু বিছানায় গড়ালেন,—শোনো, নির্মাল্য দস্তিদার মহা ধূর্ত চিজ। ওটা তোমার প্রশংসা নয়, ঘুরিয়ে নিজের ছেলের বউয়ের নিন্দে করা। আরে বাবা, সে বেটি আজকালকার মেয়ে, কেন বসে বসে শ্বশুরের জন্য শুক্তো শাশুড়িকে তাঁদের পছন্দের পদ করে খাইয়েছে?

কী প্যাঁচ, কী প্যাঁচ! জিলিপির ঠাকুরদাদা অমৃতি! এমন প্যাঁচোয়া লোককে সামলে

কী করে যে চল্লিশটা বছর ঘর করলেন প্রতিমা! এ দিকে কুট কুট করে ছেলের বউ-এর নিন্দে করবেন, ও দিকে তার সামনে একেবারে আদর্শ শ্বশুরটি। বাবুসোনা হওয়ার পর চাকরি করা নিয়ে দুপুরের সঙ্গে প্রতিমার যখন খটাখটি বেধে গেল, অমনি উনি রামমোহন বিদ্যাসাগর সেজে গেলেন। লেখাপড়া-জানা মেয়ে, ঘরে বসে শুধু সংসার আর বাচ্চা সামলাবে নাকি! করবে, নিশ্চয়ই চাকরি করবে। বাবুসোনাকে দুম করে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে ফেলল নূপুর, বেচারা প্রতিমার নাতির জন্য মন পোড়ে, একা একা দিন কাটতেই চায় না। দোষের মধ্যে দোষ, ফস করে একদিন নূপুরকে বলে ফেলেছিলেন, একটা মাত্র ছেলেকে বাড়ি থেকে বিদায় না করে দিলে কি চলছিল না! বাপ রে, সঙ্গে সঙ্গে কর্তার কী মেজাজ! ও ছেলের মা, ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে, তুমি কথা বলার কে হে!

এই বেয়াইমশায়ের কথাই ধরা যাক না। পিঠের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, দুর্গাপুরে অনেক ডাক্তারবদ্যি করেছেন, আসানসোলে গিয়ে বড় অর্থোপেডিক দেখিয়ে এসেছেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, মেয়ে বাবাকে কলকাতায় এনে স্পেশালিস্ট দেখাবে—এ তো ভালো কথা। কিন্তু প্রতিমাকে আগে একবার জানাতে কী কষ্ট ছিল? প্রতিমা জানলেন কখন? না, বেয়াইমশাই কলকাতায় পা দেওয়ার পর। এর জন্য একবার অভিমান প্রকাশ করতেই কর্তার কী ধমক! বলি, বাপটা কার! তোমার, না নূপুরের? তার বাপকে ডাক্তার দেখানোর আগে তোমার অনুমতি নিতে হবে। সেই লোক ঘরের কোণে বসে এখন ছেলের বউয়ের কুচ্ছো গাইছে! প্রতিমা যদি একবার মুখ ফুটে নূপুরকে কিছু রাঁধতে বলেন, অমনি তো খিঁচিয়ে উঠবেন। সারাদিন অফিসে খাটাখুটি করে মেয়েটা, আবার হেঁশেলেও ঢুকবে! লোক বটে একখানা! একজনকে দেখলেই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে যায়।

প্রতিমা মনে মনে জুতসই জবাব তৈরি করেছিলেন, আবার সিতাংশুর গলা কানে উড়ে এল,—কী ধ্যান করছ বসে বসে? বেয়াইয়ের সার্টিফিকেটটা কোথায় ঝোলাবে? ওটাকে মাদুলি করে পরে থেকো।... আপাতত একটু গড়িয়ে নাও। অনেকক্ষণ রান্নাঘরে কাটিয়েছ, এর পর তো আবার কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা করে তড়পাবে।

প্রতিমা ঝেঁঝে উঠলেন,—হ্যাঁ বেয়াইমশাই পাশের ঘরে, আর আমরা এখানে জোড়ে শুয়ে নিদ্রা দিই! লজ্জাশরম তো কিছু নেই! ছোঃ।

—লজ্জাশরম? আমার দুর্গাপুর গেলে বেয়াই-বেয়ান বুঝি সারাক্ষণ আমাদের মুখের সামনে মুখ লাগিয়ে বসে থাকতেন?

—ভুলে যেওনা তখন বেয়ান ছিলেন।

—তবে আর কী! যাও, বেয়াইয়ের সামনে গিয়ে তা তাথিয়া তা থিয়া নাচো।

—নিজে ঘুমোও না। আমাকে নিয়ে প্যাচাল পাড়ছ কেন?

ড্রেসিংটেবিল থেকে চশমা নিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাটের কোনাটিতে এসে বসলেন প্রতিমা। উলটোচ্ছেন এ পাতা সে পাতা, হেডিংগুলো দেখছেন। হিমালয়ের কোন এক শৃঙ্গে উঠেছে বাংলার কয়েকটি মেয়ে। বাহ্ বাহ্। সরষের তেলের দাম আবার চড়ল। কোনও মানে হয়! প্রেমিক-প্রেমিকের যুগল আত্মহত্যা। মরণ, বেঁচেছিলি কেন অ্যাদ্দিন। বধূহত্যার দায়ে শাশুড়ি হাজতে। সব্বোনাশ, কোন প্রতিমার কপাল পুড়ল। প্রতিমা ঝুঁকলেন কাগজে, মন দিয়ে খবরটা পড়ছেন। চশমার পাওয়ারটা ঠিক নেই, ঘরের অল্প আলোয় ভালো মতো ঠাহর হচ্ছে না লেখাগুলো। উঠে আলো জ্বালতে গিয়েও নিরস্ত হলেন। চোখে সামান্যতম আলো পড়লেই ঘুম ভেঙে যাবে সিতাংশুর, অনর্থ শুরু করে দেবেন।

কাগজ হাতে ঘর থেকে বেরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রতিমা। ফরর ফরর নাক ডাকছে, সিতাংশুর, দ্যাখ না দ্যাখ গভীর ঘুমে চলে গেছেন মানুষটা। কার্তিকের শেষ, উত্তরের জানালা দিয়ে শিরশিরে বাতাস ঢুকছে, প্রতিমা জানালার পাল্লাটা টেনে দিলেন। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ঘুরন্ত ফ্যান পুট পুট দুপয়েন্টে কমিয়ে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়।

পুবমুখো বারান্দায় খানদুয়েক বেতের চেয়ার, ছোট একটা টেবিল। অতনু আর নূপুরের শৌখিন বসার আয়োজন। এক ধারে সিতাংশুর ইজিচেয়ারও আছে। হেমন্তের দুপুরে এ বারান্দা ভারি আরামের।

একটা চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে হঠাৎই নীচের কাঁচা উঠোন মতো জায়গাটায় প্রতিমার দৃষ্টি আটকে গেল। নির্মাল্য। উবু হয়ে বসে নিরীক্ষণ করছেন কী যেন। কখন নেমে গেলেন দোতলা থেকে?

প্রতিমা গলা ওঠালেন,—ওখানে কী করছেন বেয়াইমশাই?

নির্মাল্য ঘাড় তুললেন,—আপনার বাগান দেখছি।

—কোথায় বাগান! সবই তো আগাছা।

—কেন, কটা ফুলের চারাও তো বেরিয়েছে।

—তাই বুঝি?

প্রতিমার মন প্রসন্ন হয়ে গেল। এ বাড়ির কেউই তেমন গাছ অন্ত প্রাণ নয়। একমাত্র তাঁরই যা এক সময়ে অল্পস্বল্প উৎসাহ ছিল। টগর শিউলি গন্ধরাজের চারা লাগিয়েছিলেন কয়েকটা। গাছগুলোয় এখনও ফুল ফোটে, তবে আর তেমন যত্নআত্তি করা হয় না। সে শক্তিও নেই, সে উদ্যমও নেই। এখন শুধু ফি বছর পুজোর পর কিছু মরসুমি ফুলের বীজ এনে ছড়িয়ে দেন উঠোনের ওদিকটায়। পুরোনো অভ্যেসের মতো। অযত্নে অবহেলায় বেশিরভাগই সূর্যের মুখ দেখতে পায় না, দুটো চারটে গাঁদা বেঁচে যায় ক্বচিৎ কখনও। হিলহিলে শরীর নিয়ে লিকলিক বেড়ে ওঠে, নবীন সোনালি ফুলে উঠোনে আলো হয়ে যায়। বেশ লাগে দেখতে। এ বছরও

তবে ফুটবে কয়েকটা?

পায়ে পায়ে প্রতিমা একতলায় নেমে এলেন। নির্মাল্যর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অভিভাবকের সুরে বললেন,—দুপুরে না শুয়ে এসব হচ্ছে?

নির্মাল্য যেন শুনতেই পেলেন না। আপন মনে বললেন,—চারাগুলোর এই হাল কেন? মাটি না তৈরি করলে হয়!

—ও সব ঝঞ্ঝাটে কে যায়! প্রতিমা ঠোঁট ওলটালেন,—নিজে থেকে যা হয়, হোক না।

—তা বললে হয়, পৃথিবীতে নতুন প্রাণ আসছে, তাদের একটু খাতিরদারি করতে হবে না?

প্রতিমার বুকে টুং করে বাজল কথাটা। অচেনা পাখির ডাকের মতো। কোমল দুপুরটার মতো। হাসলেন,—কী করতে হবে শুনি?

—খুরপি-টুরপি কিছু একটা দিন। মাটি ঝুরো করি, অগাছা সাফ করি........

—খুরপি কোথায় পাব?

—নেই? তা হলে একটা লোহার শিক গোছের কিছু....

সেকেন্ডের জন্য প্রতিমা ভাবলেন, আছে কি? হুঁউঁ, আছে তো! বাথরুমে। চৌবাচ্চার মুখ চেপে আটকানোর জন্য। আনতে গিয়ে খুঁজে পেলেন না। বাসন্তীর মা কোথায় যে রেখেছে।

রান্নাঘর হাতড়ে শেষে স্টিলের খুন্তিটা নিয়ে এলেন প্রতিমা। সঙ্গে একখানা কাটারিও। গভীর মনোযোগে মাটি খোঁড়ায় নেমে পড়েছেন নির্মাল্য। দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা মাটি গুঁড়ো হয়ে গেল। প্রতিমাও কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন, হাতে ঘষে ঘষে ঝুরো করছেন মাটি। সেই মাটি ফুল গাছের গোড়ায় চেপে চেপে দিচ্ছেন নির্মাল্য, কাটারি দিয়ে ছেঁটে ছেঁটে দিচ্ছেন আগাছা।

কাজ করতে করতে কথা চলছে দুজনের। গাছের কথা। ফুলের কথা। এলেমেলো কথা।

নির্মাল্য—এ তো বেশ ভালো জাতের গাঁদা। ফুল প্রায় টেনিস বলের সাইজে হবে।

প্রতিমা—কই হয়! আমি তো এইটুকু টুকুই দেখি।

নির্মাল্য—ফুলের জন্য খাটতে হবে। সার দিতে হবে, জল দিতে হবে। জানেন তো, গাছ কখনও বিট্রে করে না। আপনি গাছের কথা ভাবুন, গাছও আপনার কথা ভাববে।

প্রতিমা—ছিলেন তো ইঞ্জিনিয়ার, গাছাগাছালির খবর এত জানলেন কী করে? নেশাটা কি নতুন?

নির্মাল্য—নেশা বলছেন? গাছ কত ভালো সঙ্গী জানেন?

প্রতিমা—তা বটে। যা ইচ্ছে কথা শোনাতে পারেন, জবাবটি দেবে না।

নির্মাল্য কাটারি চালানো থামিয়ে বিচিত্র চোখে তাকালেন প্রতিমার দিকে। চশমার আড়ালে মণিদুটো যেন ঝিকঝিক করে উঠল। হাসি, অথচ যেন হাসি নয়। অন্যমনস্ক স্বরে বললেন,—নীরব থেকেও তো অনেক কথা বলা যায়। আপনার বেয়ানকে তো চিনতেন, দিনে রাতে কটা কথা বলত সে?.....আমি তো একাই বকে মরতাম।

কাছেই ট্রেনলাইনে ঝমঝম শব্দ বাজিয়ে একটা ট্রেন শহর থেকে শহরতলির দিকে চলে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে। শীতের হাওয়ার মতো।

প্রতিমা অস্ফুটে বললেন,—বেয়ান বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। অসময়ে।

—মৃত্যুর কি সময় অসময় আছে? নির্মাল্য ছোট্ট শ্বাস ফেললেন,—পৃথিবীতে তার কাল ফুরিয়েছিল, সো শি হ্যাড টু ডিপার্ট। আফসোস শুধু একটাই। চিকিৎসা করানোর সুযোগ দিল না। টিভি দেখতে দেখতে একটা উঃ শব্দ করল, ব্যস্, দি এন্ড। সেরিব্রাল হয়েও তো কতজন বেঁচে যায়। যায় না, বলুন?

প্রতিমা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কথার মোড় ফেরাতে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন,—এহে, আপনার সর্বাঙ্গ যে একেবারে মাটিতে মাখামাখি হয়ে গেল!

নির্মাল্য কাটারি রেখে উঠে দাঁড়ালেন। হাত ঝাড়ছেন, পাঞ্জাবি ঝাড়ছেন, হাতের পিঠ দিয়ে কপাল মুছছেন। বাড়ির এ দিকটা থেকে অনেকক্ষণ রোদ সরে গেছে, তবু ঘেমেছেন বেশ। শেষ কার্তিকের দুপুরেও।

মানুষটাকে দেখে প্রতিমার ভারি মায়া জাগছিল। কেমন আলাভোলা ধরনের হয়ে গেছেন, আত্মমগ্ন। আঁচলে আলগা হাত মুছে নিয়ে নির্মাল্যর পাঞ্জাবির পিঠ ঝেড়ে দিলেন প্রতিমা।

তখনই দোতলায় চোখ চলে গেল।

সিতাংশু।

চারটের সময় চা না দিলে সিতাংশুর দিবানিদ্রা ভাঙে না, আজ উঠে পড়েছেন যে বড়।

সন্ধে নামার মুখে মুখে ফিটফাট বাবুটি সেজে সিতাংশু তৈরি। ঘর থেকেই হাঁক দিলেন—বেয়াইমশাই, রেডি তো?

নির্মাল্য দোতলার বারান্দায়, সিতাংশুর ইজিচেয়ারে। বসে বসেই সাড়া দিলেন,—আজ আর বেরোব না ভাবছি।

—সে কী! ক্লাবে যাবেন না?

—ইচ্ছে করছে না।

—আরে চলুন চলুন, চব্বিশ ডিল খেলেই ফিরে আসব। সিতাংশু ছড়ি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন,—সুরেন পরিমলদের সঙ্গে তো আপনার ভালো ফ্রেন্ডশিপ

হয়ে গেছে। দেখবেন, গল্প শুরু করতে না করতেই সন্ধে কাবার।

—আজ ছেড়ে দিন বেয়াইমশাই। কাল ডাক্তারের কাছে যাব, আজ একটু রেস্ট নিই।

প্রতিমা ঘরে সন্ধে দিচ্ছিলেন। ঠাকুরের সামনে ধূপ দোলাতে দোলাতে গলা ওঠালেন,—ওঁর যখন ইচ্ছে করছে না, জোর করছ কেন? তুমি তাসুড়ে মানুষ, তুমি ঘুরে এসো।

মুখে বিদঘুটে এক ধ্বনি তুলে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেলেন সিতাংশু।

এ অঞ্চলে মশা খুব। গোটা জায়গাটা এক সময়ে জলাভূমি ছিল। এখন অবশ্য অগুন্তি বাড়ি হয়ে গেছে। তবু জলাভূমির স্মৃতি ভুলতে দেয় না মশারা, সন্ধে হলেও হানা দেয় ঝাঁকে ঝাঁকে।

দোতলার ঘরগুলোতে মসকিউটো রিপেলেন্ট জ্বালিয়ে জানালা দরজা সব ভেজিয়ে দিলেন প্রতিমা। বারান্দায় এসে বাতি জ্বেলে দিলেন,—এক কাপ চা খাবেন নাকি বেয়াইমশাই?

নির্মাল্যর উত্তর নেই। সামনের তরল আঁধারে দৃষ্টি হারিয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে প্রতিমা সিঁড়ির দিকে এগোলেন। বাসন্তীর মা বিকেলের রান্না করতে এসে গেছে, দু' কাপ চা দিয়ে যেতে বললেন তাকে। ফিরে চেয়ারে বসেছেন।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলেন,—শরীরটা কি খারাপ লাগছে বেয়াইমশাই?

নির্মাল্যর মৃদু স্বর শোনা গেল,—নাহ্, ঠিকই আছি।

—পিঠের ব্যাথাটা আবার হচ্ছে না তো?

—সামান্য। বলার মতো কিছু নয়।

প্রতিমা অনুযোগের সুরে বললেন,—মিছিমিছি তখন মাটি কোপাতে গেলেন, অমন ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করা আপনার একদম উচিত নয়।

—দূর, ও জন্য কিছু হয়নি। বরং গাছের পরিচর্যা করলেই আমি বেশ থাকি। নির্মাল্যর দুই হাত ইজিচেয়ারের দুই হাতলে,—আমার যন্ত্রণাটার মূল অনেক গভীরে। প্ল্যান্টে কাজ করার সময়ে একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। বছর পঁচিশ আগে। লোহার সিঁড়ির সাত আট ধাপ ওপর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।

—ও মা, কী সব্বোনেশে কথা! আগে শুনিনি তো?

—না, চোট তখন তেমন লাগেনি কিছু। হাড়গোড়ও ভাঙেনি, রক্তপাতও হয়নি ... তবে তারপর থেকে ঠায় বসে থাকলেই ... রিটায়ারমেন্টের পর থেকে তো হাঁটাচলা কমেই গেছে। বসেই থাকি। আর সেই সুযোগ বুঝেই ব্যথা আবার চড়াও হয়েছে।

—বসে থেকেই যখন ব্যায়রাম, বসে রইলেন কেন? ওঁর সঙ্গে হেঁটে এলেই

পারতেন।

—তাস পাশা আমার ভালো লাগে না বেয়ান। জন্মে কখনও খেলিনি তো। স্পেড হার্ট না ট্রাম্প্ শুনলে কেমন চমকে চমকে উঠি। নিজেকে বেশ ইডিয়টিক লাগে। তবে হ্যাঁ, বেয়াইমশাইয়ের বন্ধুরা সজ্জন ব্যক্তি, গল্পগুজব করাই যায়। কিন্তু মুশকিল হল, ওঁদের টপিক একটাই। পলিটিক্স। মিস্ত্রি মজুর খাটানো মানুষ তো, ভোঁতাবুদ্ধি। ওই সূক্ষ্ম বুদ্ধির শাস্ত্রটি আবার পছন্দ হয় না।

শেষ বাক্যটির মর্মার্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না প্রতিমা। অপাঙ্গে দেখলেন, বেয়াইমশাই একটু যেন কাত হয়ে গেছেন, মুখ চোখ কুঁচকোনো। ব্যথাটা যত কম বলছেন তত লঘু নয় বোধহয়।

নরম স্বরে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলেন,—পিঠের ঠিক কোনখানে হচ্ছে ব্যাথাটা?

—শিরদাঁড়ার ডান দিকে। বেয়ে বেয়ে কাঁধ অবধি উঠলেই চিত্তির, একেবারে বিছানায় আছড়ে ফেলে দেবে।

—আগে কি এতটা বাড়াবাড়ি ছিল?

—ছিল না। আবার ছিলও। আপনার বেয়ান গরম তেল কী সব মিশিয়ে মালিশ করে দিত, বাড়তে পারত না।

—কী মালিশ? নূপুর জানে?

—নাহ্। ওসব ছিল আপনার বেয়ানের নিজস্ব তুকতাক।

—আমার একটা বেদনার মলম আছে। মালিশ করতে হয় না, আলগা বোলালেই কাজ হয়। দেব?

হ্যাঁ না কিছুই শোনা গেল না। চরাচরে এখন গাঢ় অন্ধকার। রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। মিহি কুয়াশায় চারপাশের বাড়ি আলো কেমন অস্পষ্ট দেখায়। প্রবল প্রতিযোগী দুই রিকশা তীক্ষ্ণ হর্ন বাজাতে বাজাতে সামনে দিয়ে ছুটে গেল। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এলোমেলো, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

বাসন্তীর মা চা রেখে গেছে। আঁচল গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কাপে চুমুক দিলেন প্রতিমা। আলগা বললেন,—এ বছর শীতটা ভালোই পড়বে মনে হয়। সবে নভেম্বরের দশ তারিখ, এখনই বাতাস কী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

নির্মাল্য বললেন,—হুঁ।

—আপনাদের ওদিকে তো অনেক বেশি শীত পড়ে।

—হ্যাঁ, ডিসেম্বরে বেশ টেম্পারেচার নেমে যায়। কথাটা বলেই নির্মাল্য একটুক্ষণ চুপ। তারপর বললেন,—আপনার বেয়ান বড্ড শীতকাতুরে ছিল। দুটো মাস তো একেবারে জবুথবু হয়ে থাকত। প্রতি বছরই বলত, এ শীতটা আর কাটবে না। গত বছর কথাটা ফলে গেল।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না সেরিব্রালের সঙ্গে শীতের কী সম্পর্ক। হয়তো

নির্মাল্য বলবেন, মৃত্যুভয়ই সেরিব্রাল টেনে এনেছে! কোনো কথা বলাই এখন বিপদ। নির্মাল্যর সব কথাই এখন ঘুরেফিরে স্ত্রীতে চলে যায়।

—কিছু লাগবে না। ঠাণ্ডা আমার বেশ লাগে।

—লাগুক। তবু একটা কিছু গায়ে দিন। হিম পড়ছে। এ সময়টাই অসুখবিসুখ হয় বেশি।

ইজিচেয়ার আবার নীরব।

প্রতিমা চা শেষ করে উঠে পড়লেন। নির্মাল্যর ঘরে গিয়ে চাদর আনতে কেমন বাধো বাধো ঠেকল, এসেছেন নিজেদের ঘরে। সিতাংশুর তুষের চাদরখানা হাতে নিয়ে এক সেকেন্ড ভাবলেন কী যেন। তারপর ড্রেসিংটেবিলের দেরাজ থেকে মলমটাও নিয়ে ফিরে এলেন বারান্দায়।

টিউব আরামকেদারার হাতলে রেখে বললেন,—লাগিয়ে নিন। চাদরটা তারপর জড়িয়ে নেবেন গায়ে।

কথা শেষ হতে না হতেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ছড়ি হাতে আবির্ভূত হলেন সিতাংশু।

প্রতিমা অবাক হয়ে বললেন,—এর মধ্যে তোমার চব্বিশ ডিল হয়ে গেল?

—ধুস, কেউ আসেনি। ছড়ি টেবিলে শুইয়ে চেয়ারে বসলেন সিতাংশু,—একা একা কতক্ষণ মাছি মারব?

—আশ্চর্য! তোমার তাসবন্ধুরা ডুব মেরেছে! সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছিল গো?

সিতাংশু দুম করে চটে গেলেন,—কেন, তারা কি একদিন বাড়িতে রেস্ট নিতে পারে না?

—তুমি না বলো, তাস খেলাই তোমাদের বিশ্রাম? প্রতিমা খোঁচালেন।

সিতাংশু গুম হয়ে গেলেন।

মুখ খুললেন সেই রাতে। শোওয়ার সময়ে। মশারি গুঁজতে গুঁজতে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন,—টিউব শেষ?

প্রতিমা গ্লাস উঁচু করে জল খাচ্ছিলেন। হালকা বিষম খেলেন, —কিসের টিউব?

—ন্যাকা সেজো না। আমার কি চোখ নেই? গোটা মলমটাই কি বেয়াইয়ের পিঠে ঘষা হয়ে গেল?

—গোটা মলম কোথায়? একটুখানি তো পড়ে ছিল।

—বললেই হল? পুজোর পর ওটা কেনা হয়েছে। পাক্কা দু মাস চলে, আমার হিসেব আছে।

—কী ছোট মন গো তোমার!

—হ্যাঁহ্, আমারই তো ছোট মন! ন্যাজাল ড্রপের শিশি খুলে নাসিকাগহ্বরে ফোঁটা

ফোঁটা তরল ঢালছেন সিতাংশু। জোরে নাক টানলেন কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও বিকৃত হয়ে গেল,—নিজের মন তো খুব বড়। আমি মানুষটা ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলাম, তাকে একটা শাল কম্ফর্টার দেওয়ার কথা মনে পড়ল না, আর তিনি আমারই ইজিচেয়ারে শুয়ে আমার চাদরে ওম নিচ্ছেন! দুর্ভাগা অভাগা হওয়ায় ভারি মজা, অ্যাঁ?

রাগে ঘেন্নায় প্রতিমার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। এক পা ঘাটে বাড়িয়ে বসে আছেন, এখনও কুচুটেপনা হিংসুটেপনা গেল না! বাষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল প্রতিমার, এখনও তাঁকে সন্দেহ করা! ছি ছি ছি ছি।

বিছানায় এসে বেড় সুইচ নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন প্রতিমা। অন্ধকারে দাঁতে দাঁত ঘষছেন। এই জন্যই দুপুরে বারান্দা থেকে উঁকি মারছিল? তাসের আসর থেকে ফিরে এসেছেন? টিকটিকিপনা?

প্রাণ থাকতে এই মানুষটার সঙ্গে আর কথা বলবেন না প্রতিমা।

পরদিন রাত আটটা নাগাদ ডাক্তার দেখিয়ে ফিরলেন নির্মাল্য। মেয়ে জামাই-এর সঙ্গে। মেয়ের ডাক্তারও তেমন কিছু আশার কথা শোনায়নি। ক'টা ব্যথার ওষুধ লিখে দিয়েছে, সঙ্গে ফিজিওথেরাপির নির্দেশ। আর টেস্ট দিয়েছে এককাঁড়ি। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ সবেরই একবার পরীক্ষা চায় ডাক্তার। সমস্ত করে টরে আবার মাসখানেক পর হাজির হতে হবে তাঁর চেম্বারে, তখন তিনি উপযুক্ত বিধান দেবেন!

বাড়ি এসে নির্মাল্য খানিকক্ষণ মনমরা হয়ে বসে রইলেন।

নুপুর অতনু নানা রঙ্গরসিকতা জুড়ে তাঁকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করছে, তাও তাঁর মুখে হাসি নেই। অবশেষে ম্লান মুখে ঘোষণা করলেন, কালই ভোরে তিনি দুর্গাপুর ফিরতে চান। বাড়ির জন্য তাঁর মন কেমন করছে।

প্রতিমা ভেতর থেকে সিঁটিয়ে গেলেন। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ সংশয় উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। কাল রাতে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ কি কানে গেছে নির্মাল্যর? যেতেই পারে। বেআক্কেলে লোকটার তো মাত্রাজ্ঞান নেই, সব কথাই উঁচু পর্দায় বলতে ভালোবাসে। নাকি সিতাংশুর ব্যবহারে আহত হয়েছেন নির্মাল্য? এও সম্ভব। সিতাংশুর যা চ্যাটাং চ্যাটাং কথার বহর। কিংবা নির্মাল্য নজর করেছেন সিতাংশু প্রতিমার বাক্যবিনিময় বন্ধ হয়ে গেছে? বেয়াইমশাই নিজেকে যতই ভোঁতামস্তিষ্ক বলুন, তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর। আলাভোলা হতে পারেন, শিশু তো নন। কুটুমের কাছে মানসম্মান কিছু রইল না। কী লজ্জা, কী লজ্জা।

অনেক রাত অবধি প্রতিমা দু চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। পাশের মানুষটা দিব্যি সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, নাক ডাকছে ফরর ফুস। প্রতিমার হাত নিশপিশ করছে। ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে সিতাংশুকে। এক্ষুনি ও ঘরে গিয়ে

বেয়াইমশায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসুক।

কিন্তু কিছুই পারলেন না প্রতিমা। শেষ ট্রেনের ভোঁ চোখে নিদালি বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কাকভোরে ছোটখাটো হইচই শুরু হয়ে গেল বাড়িতে। উঠে পড়েছেন প্রতিমা, জেগে উঠেছেন সিতাংশু, তৈরি হয়ে নিচ্ছে নূপুর। চা হচ্ছে, মালপত্র গোছগাছ চলছে। বাথরুমে দরজা খোলা-বন্ধ হচ্ছে ঘন ঘন। অতনু ট্যাক্সি ডেকে আনল। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে স্টেশন রওনা হলেন নির্মাল্য।

প্রতিমা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আলো ফুটে গেছে বেশ, ঘন কুয়াশার পর্দা সরিয়ে ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছে পৃথিবী। কাগজঅলার সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শোনা যায় মাঝে মাঝে। বিকট শব্দ করে মোড়ের বুথে দুধের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

সহসা ভীষণ জোর নাড়া খেয়ে গেলেন প্রতিমা। নীচের উঠোনে সিতাংশু। মগে করে জল দিচ্ছেন ফুল গাছের চারায়! গাছের গোড়াগুলো খোঁচাচ্ছেন কাঠি দিয়ে, আবার চেপে চেপে দিচ্ছেন মাটি।

প্রতিমা ফিক করে হেসে ফেললেন। ঈর্ষার উত্তাপই বুঝি বেঁচে থাকাটা আজও রঙিন করে দেয়। পাগল, লোকটা একেবারে পাগল।

সম্পর্ক

অন্যমনস্কভাবে দরজা খুলতে এসেছিল ইন্দ্রাণী। দরজা খুলেই থমকে গেল।

সামনে রজত।

না, ঠিক সামনে নয়, কলিংবেল বাজিয়ে রজত একটু সরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সিঁড়ির কাছে। চওড়া কাঁধ, দীর্ঘ শরীর ঝুঁকে আছে অল্প, ঘাড় এক পাশে ফেরানো, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

সেই চেনা ভঙ্গি!

কতদিন পর এত কাছ থেকে ইন্দ্রাণী দেখছে রজতকে! পাঁচ বছর? না আরেকটু বেশি? মুহূর্তে মুছে গেল এক দীর্ঘ সময়। ইন্দ্রাণী অস্ফুটে ডাকল, এসো।

রজত মুখ ফেরাল, এগোল না। দূর থেকেই আড়ষ্ট প্রশ্ন করল, মুনিয়া এখন কেমন আছে?

অঘ্রান মাস পড়ে গেছে। সূর্য ডুবলেই ঝুপ করে আঁধার নেমে আসে এ সময়ে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ বাতিটাও জ্বলছে না আজ। ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে যেটুকু আলো বাইরে এসে পড়েছে তাতে রজতের মুখ ভালো দেখতে পাচ্ছিল না ইন্দ্রাণী। রজত কি হাঁপাচ্ছে? ইন্দ্রাণী নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চাইল। যেন রজতের সঙ্গে রোজই দেখা হয় এমন স্বরে বলল, জ্বরটা বেড়েছে একটু। এসো, ভেতরে এসো।

দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণী, তবু ইতস্তত করছে রজত। ঘন ঘন কয়েকটা টান মারল সিগারেটে। মেঝেতে ফেলে মাটিতে ঘষে ঘষে আগুন নেবাল। সামনের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে নিল একবার। পায়ে পায়ে ভেতরে এসেছে।

ইন্দ্রাণীর ফ্ল্যাটটা বড় নয়। মাঝারি আয়ের সরকারি কর্মচারীদের জন্য গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার যেমন হয়, সেরকমই। ছোট বসার ঘর, সামান্য বড় শোওয়ার ঘর, টুকরো ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর, বাথরুম, এক চিলতে বারান্দা। সব মিলিয়ে ক্ষেত্রফল ছশো স্কোয়্যার ফিটও হবে কি না সন্দেহ। তার মধ্যেও বাড়িটাকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে ইন্দ্রাণী। দেওয়াল মেঝে রান্নাঘর বাথরুম সোফা শো-কেস খাট আলমারি বিছানা সব কিছুই টিপটপ। ঝকঝকে তকতকে। এক ফোঁটা ধুলো বালি মালিন্যের চিহ্ন নেই কোথ্থাও।

ইন্দ্রাণী চিরকালই এরকম। ভীষণ পরিষ্কার বাতিক। সারাক্ষণ এত ফিটফাট ভাব, এত কেতাদুরস্ত চেহারা পছন্দ ছিল না রজতের। বলত, বাড়াবাড়ি। শোম্যানশিপ।

এটা কি বাড়ি, না হোটেলের স্যুইট?

রজত কোনোদিনই এই ফ্ল্যাটটাকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে পারেনি। ইন্দ্রাণীর নামে, ইন্দ্রাণীরই চাকরিসূত্রে পাওয়া ফ্ল্যাটে থাকতে রজতের পৌরুষে লাগত। এই নিয়েও কম অশান্তি, কম বাকবিতণ্ডা হয়েছে একসময়ে? রজতের কাছে এই ফ্ল্যাট হোটেল ছাড়া আর কীই বা!

সেই ফেলে যাওয়া হোটেলের স্যুইটে এখন চোখ বোলাচ্ছে রজত। ইন্দ্রাণীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। রজত কী দেখছে এত খুঁটিয়ে? পাঁচ বছরে কতটা বদল হয়েছে হোটেলের? সেই পার্ক স্ট্রিটের নিলামঘর থেকে কেনা ডিম্বাকৃতি খাবার টেবিল, সেই চারটে পিঠ উঁচু কাঠের চেয়ার, সেই ফ্রিজ, সেই দেওয়ালে লাগানো কাচের ক্রকারি কেস সবই তো তেমন রয়েছে।

ঠিক তেমনটি নেই, কিছু বদলেছেও। যেমন মানুষ বদলে যায়। দিনে দিনে। মাসে মাসে। বছরে বছরে। খাবার টেবিল মাঝখান থেকে সরে দেওয়ালের গায়ে এখন। ফ্রিজের রং সাগরনীল থেকে শ্যাওলাসবুজ। ক্রকারি কেসখানাও নামানো হয়েছে হাতখানেক। কিছু জিনিস বেড়েওছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মেদ বাড়ে। অভিজ্ঞতা বাড়ে। দরজার ধারে জুতো, খবরের কাগজ আর পুরোনো ম্যাগাজিন রাখার বাহারি কাঠের বাক্স এসেছে একটা। ডানদিকের টানা জানালায় মিনেকরা পিতলের পটহোল্ডার। তিনটে। মনোরম ইনডোর প্ল্যান্টের জন্য। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো টেরাকোটার গণেশ। গণেশটা প্রবালের নিজের হাতে তৈরি। দেড় মাস ধরে খেটে বানিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে প্রবাল। শোওয়ার ঘরেও নিজের পেন্টিং টাঙিয়ে দিয়েছে। বাইরের ঘরেও। শুধু বড় রবার গাছটাই আর নেই। নার্সারি থেকে গাছটাকে টবসুদ্ধ কিনে এনেছিল রজত। জানালার ঠিক নীচে ওই ফাঁকা জায়গাটায় রেখেছিল। সকাল বিকেল বারান্দায় নিয়ে গিয়ে রোদ খাওয়াত। তোয়াজ করত খুব।

রজত যেদিন ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সেদিনই ইন্দ্রাণী আছড়ে আছড়ে ভেঙেছিল টবটাকে। মাটিসুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলে দিয়েছিল রাস্তায়।

রজত কি সেই গাছটাকে খুঁজছে এখন? ইন্দ্রাণী পলকা প্রশ্ন করে ফেলল, কী দেখছ?

—কিছু না। রজত অপ্রস্তুত মুখে মাথা ঝাঁকাল, মুনিয়া কী করছে? ঘুমোচ্ছে?

—না, শুয়ে আছে। যাও না, ঘরে যাও। ইন্দ্রাণী এগিয়ে শোওয়ার ঘরের পর্দা সরিয়ে দিল, মুনিয়া দ্যাখ তোকে কে দেখতে এসেছে!

অনেক দিন পর পাঁচ দিন টানা জ্বরে পড়ে আছে মুনিয়া। সন্ধে হলেই লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বর বাড়তে শুরু করে। একশো এক, একশো তিন, একশো চার, একেবারে নেতিয়ে পড়ে থাকে তখন। এমনিতেই বড় রোগা মেয়েটা, তার ওপর জ্বরে একদম

কাহিল হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ফোলা ফোলা চোখের তলায় কালি। রুক্ষ চুল ঝামর ঝামর। একটু আগে মেয়েকে হরলিক্স খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল ইন্দ্রাণী, মেয়ে কিছুতেই বসে থাকতে পারছিল না বিছানায়, বার বার শুয়ে পড়ছিল।

সেই ঝিমদুর্বল মেয়ে রজতকে দেখেই তড়াক করে উঠে বসেছে। শীর্ণ মুখমণ্ডল পলকে উদ্ভাসিত, বাপি!

রজতও প্রায় ছুট্টে বিছানার পাশে। মেয়ের মুখ বুকে চেপে ধরেছে, কী হয়েছে তোমার মামণি? কেমন আছ তুমি?

মুনিয়া আড়চোখে ইন্দ্রাণীকে দেখে নিল, তুমি কী করে জানলে আমার অসুখ করেছে?

—সকালে তোমার নাচের স্কুল থেকে আমি ফোন করেছিলাম যে!

প্রতি রবিবার সকালে মুনিয়াকে নাচের স্কুল থেকে নিয়ে যায় রজত। আইনের শর্ত অনুযায়ী। সারাদিন নিজের কাছে রেখে রাত্তিরে ফেরত দিয়ে যায় মেয়েকে। বাড়ি অবধি আসে না, নীচের দরজায় পৌঁছে দেয়। আজ মেয়েকে নাচের স্কুলে না পেয়ে রজত ফোন করেছিল বাড়িতে।

মুনিয়া আবারও একবার তাকাল মায়ের দিকে। ইন্দ্রাণী তাকে রজতের ফোনের কথা বলেনি।

ইচ্ছে করেই বলেনি। বাবা সম্পর্কে মেয়ে এত বেশি স্পর্শকাতর! হয়তো বাবা নিতে এসে ফিরে গেছে শুনে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ল! সহজে তো মুখে কিছু প্রকাশ করে না মুনিয়া, তবু ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে সব। শনিবার সন্ধে থেকে কেন মেয়ে উচ্ছল হয়ে ওঠে! কেনই বা রবিবার রাতে ঘুম আসতে চায় না মুনিয়ার!

ইন্দ্রাণী মেয়ের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। আট বছরের মুনিয়াও অভ্যাসমতো অভিমান মুছে ফেলেছে মুখ থেকে। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে নির্মল হাসল, তুমি বুঝি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে বাপি?

—হুঁউউ।

—বারে, দেবস্মিতাদের জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে।

—তাতে কী হয়েছে মামণি? আমি তোমার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। রজত মুনিয়ার গালে গাল ঘষছে। ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন বাপ-মেয়েতে নিশ্চয়ই অনেক আহ্লাদিপনা চলবে। সেই যে বুধবার থেকে ধন্দ্রাণী অফিস কামাই করে বসে আছে, দিবারাত্র ছটফট করছে মেয়ের জন্য, তা যেন কিছুই নয়! বাবাকে দেখেই মেয়ে গলে জল!

বেইমান! বেইমান! ন মাস কষ্ট করে তোকে পেটে ধরেছিল কে? ওই বাবা? কে এই এতটুকুন থেকে তিলে তিলে বড় করে তুলল? ডিভোর্সের সময় যখন কোর্টে তোর কাস্টডি নিয়ে প্রশ্ন উঠল তখন কেন তোর বাবা টুঁ শব্দটি না করে

তোকে আমার কাছে ছেড়ে দিয়েছিল, সে কথা বুঝিস? পড়ি কি মরি করে আবার বিয়ে করার জন্য। যার প্রেমে মজেছিল তাকে বিনা থাকতে পারছিল না বলে। যদি মেয়ে নিয়ে নতুন সংসার পাততে অসুবিধা হয়! এখন তাদেরই ওপর ওপর আদিখ্যেতা দেখে ভুলে গেলি তুই! অথচ তোর মা এক পা এগোলে দশ পা পিছোচ্ছে। শুধু তোর কথা ভেবে।

ইন্দ্রাণীর চোখ ঠেলে জল আসছিল। দাঁতে দাঁত চেপে রুখল অশ্রু। বাথরুমের লাগোয়া বেসিনের সামনে দাঁড়াল একটুক্ষণ। মুখে চোখে জল ছেটাল। শীত এখনও ভালোমতো পড়েনি, তবু সন্ধের পর থেকে জল বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শীতল জলের স্পর্শে ইন্দ্রাণী একটু আরাম পেল যেন। আঁচলে মুখ চেপে রান্নাঘরে এল। মুনিয়ার জন্য আরও কিছুটা গরম জল ধরে রাখবে। ঠাণ্ডা জল গরম জল মিশিয়ে মেয়েকে খেতে দিচ্ছে এখন। পরিষ্কার ডেকচিতে জল বসিয়ে ইন্দ্রাণী কী যেন ভাবল কায়েম সেকেন্ড। গম্ভীর মুখে শোওয়ার ঘরে ফিরল।

উদ্ভাসিত মুনিয়া ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। চোখ বন্ধ। মুনিয়ার মাথার কাছে, বিছানার কোণ ঘেঁষে সন্তর্পণে বসে আছে রজত। মেয়ের কপালে হাত বোলাচ্ছে।

—তুমি চা খাবে?

—চা? রজত চোখ তুলল, করছ?

—খেলে করব। ইন্দ্রাণী খাটের ওপাশে ঘুরে গিয়ে মুনিয়ার গায়ে সুজনি ঢেকে দিল ভালো করে। মেয়ের কপালের দিকে না গিয়ে হাত ছুঁয়ে তাপ অনুভব করার চেষ্টা করল।

রজত বলে উঠল, গা তো বেশ গরম আছে।

—হুঁ।

—কখন টেম্পারেচার দেখেছ?

—ছটায়। ইন্দ্রাণী কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছিল। —ডাক্তার দু'ঘণ্টা পর পর জ্বর দেখতে বলেছে।

—তখন কত ছিল?

—এক পয়েন্ট চার।

—এখন ভালোই বেড়েছে মনে হচ্ছে।

—হতে পারে। এ সময়ে বাড়ে।

—কোন ডাক্তার দেখছে?

—ডক্টর বিশ্বাস। যিনি ছোটবেলা থেকে মুনিয়াকে দেখেন।

—ওসব ডক্টর বিশ্বাস ফিশ্বাস আর চলে না। বুড়ো মানুষ, স্টেথো ধরতে গিয়ে হাত কাঁপে, ওসব লোককে দিয়ে কি আর মডার্ন চিকিৎসা হয়? রজত নিজের মনে গজগজ করে উঠল, পাঁচদিন ধরে জ্বর ছাড়ছে না, ভালো কোনও চাইল্ড

স্পেশালিস্ট কল করা দরকার।

ইন্দ্রাণী ভালো করে চাদরটা গুঁজে দিচ্ছিল তোশকের নীচে, তীক্ষ্ণ চোখে রজতের দিকে তাকাল, আমার ডক্টর বিশ্বাসের ওপর আস্থা আছে। উনি মুনিয়ার ধাত জানেন, ওঁর ওষুধেই মুনিয়ার কাজ হয়।

রজত অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আবার প্রশ্ন করল, ডক্টর বিশ্বাস কী বলছেন?

—বলছেন তো ইনফ্লুয়েঞ্জা। ঠাণ্ডা লেগে গেছে। নতুন ঠাণ্ডা। ইন্দ্রাণীর গলা খানিকটা নরম হল, চারদিনের ওষুধ দিয়েছেন। কাল এসে দেখবেন আরেকবার। কালকেও জ্বর না কমলে ব্লাড টেস্ট করাতে হবে।

মুনিয়া নড়ে উঠল। তার বন্ধ চোখের পাতা কাঁপছে টিপটিপ। বাবা-মার প্রতিটি কথা দু'কান দিয়ে শুনে নিচ্ছে সে।

রজত মুনিয়ার দিকে ফিরেছে, কষ্ট হচ্ছে মামণি?

দু'চোখের কোলে টলটল জলবিন্দু, তবু দু'দিকে মাথা নাড়ল মুনিয়া। ঢোক গিলল। ড্রেসিংটেবিলে ফ্লাস্ক রাখা আছে। ইন্দ্রাণী ফ্লাস্ক থেকে একটু জল ঢালল গ্লাসে। কুসুম কুসুম উষ্ণ জল নিয়ে মেয়ের মাথার কাছে দাঁড়াল—একটু হাঁ কর মুনাই। নে, মাথাটা একটু তোল। জলটুকু খেয়ে নে।

মুনিয়া চোখ খুলল না। দু'দিকে মাথা নাড়ল আবারও।

ইন্দ্রাণী ঝুঁকল মেয়ের দিকে, খেয়ে নে মা। গলা শুকিয়ে গেছে।

শুকনো জিভ দিয়ে ততোধিক শুকনো ঠোঁট চাটছে মুনিয়া। তবু জলটুকু খেল না। ইন্দ্রাণীর কান্না পাচ্ছিল আবার। কী ভীষণ ভীঈঈষণ চাপা মেয়েটা। সেই ছোট্ট থেকে। তিন বছরের মেয়ের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাবা-মা, মনে মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু একদিনও কাঁদল না। দু'-চারদিন বাবার কাছে যাওয়ার বায়না ধরেছিল মাত্র। তারপর চুপ। আদালতের আদেশমাফিক বাবার সঙ্গে একদিন করে দেখা হওয়াতেই সন্তুষ্ট। হয়তো সন্তুষ্ট নয়, তবে মেনে তো নিয়েছে! আরও কত কী মেনে নিয়েছে ওই একরত্তি মেয়ে! বাবার বিয়ে মেনে নিয়েছে, বাবার দ্বিতীয় বউকে মেনে নিয়েছে, মার কাছে ঘন ঘন আসে প্রবাল আঙ্কল, মার সঙ্গে তার সম্পর্কটাও অস্পষ্ট নয়, তাকেও মেনে নিয়েছে মুনিয়া। কত কিছু শিখেও ফেলেছে এর মধ্যেই! যখন স্কুল থেকে ফেরে, বাড়িতে মা থাকে না, নিজে নিজেই জামাকাপড় বদলে নেয় মেয়ে, মুখ-হাত ধোয় একা একা, বইখাতা গুছিয়ে রাখে টেবিলে, রতনের মা'র তৈরি করা জলখাবার শান্ত মুখে খেয়ে নেয় রোজ। কোনো কোনোদিন বাসট্রামের গণ্ডগোল থাকলে ইন্দ্রাণীর অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়, সে সব দিনে যদি বা রতনের মা কাজ সেরে চলে যায়, মুনিয়া ব্যাকুল হয় না একটুও। ওপরে মায়াদিদের ফ্ল্যাটে গিয়ে বসে থাকে। অথবা সামনে টুকাইদের ঘরে।

মাত্র আট বছর বয়সে কোথা থেকে এত শক্তি পেল মুনিয়া! এত কিছু মেনে নেওয়ার! মানিয়ে নেওয়ার! একটা চোরা শ্বাস গড়িয়ে এল ইন্দ্রাণীর বুক থেকে। এটাই বোধহয় উদ্‌বর্তনের নিয়ম। না হলে কী করে মুনিয়ারা টিকে থাকবে এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে? টুকরো টুকরো ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্কের আবর্তে?

ঠিক আটটায় ইন্দ্রাণী আবার টেম্পারেচার দেখল। একশো তিন পয়েন্ট দুই। বিশ্বাস ডাক্তার টেম্পারেচারের একটা চার্ট রাখতে বলেছেন, সেই চার্টে ইন্দ্রাণী টুকল তাপমাত্রাটা।

রজতও দেখল কাগজটা। শুকনো মুখে বলল,

—কাল তো এ সময়ে একশো দুই ছিল দেখছি!

ইন্দ্রাণী অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ। মাথাটা আরেকবার ধুইয়ে দিই।

—বার বার মাথা ধোওয়ালে ঠাণ্ডা লেগে যাবে না তো?

একটু আগেও মুনিয়াকে নিয়ে রজতের বেশি মাথা ঘামানো পছন্দ হচ্ছিল না ইন্দ্রাণীর, এখন সে বেশ অসহায় বোধ করছিল।

—বাড়িতে একটা আইসব্যাগ ছিল না? রজত মুনিয়ার কপাল থেকে জলপট্টিটা তুলে আরেকবার ভিজিয়ে নিল। কথাটা নিতান্তই অসতর্কভাবে বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে।

হানিমুন থেকে ফিরে জ্বরে পড়েছিল ইন্দ্রাণী। জোর ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। ঠান্ডা লাগাটা বিচিত্র নয়, ডিসেম্বরের শীতে সিমলায় গিয়ে অনেক রাত অবধি রাস্তায় হেঁটে বেড়াত দু'জনে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ধারালো ছুরির মতো কেটে বসছে শরীরে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝিরঝির তুষার অবশ করে দিচ্ছে গা হাত পা, তার মধ্যেই নবীন সুখে মাতাল এক দম্পতি চষে বেড়াচ্ছে পাহাড়ি পথ। একই ওভারকোটের নীচে শরীরে শরীর মিশিয়ে উত্তপ্ত হতে চাইছে দু'জনে। পরিণামে ওই ঠাণ্ডা লাগা। ওই জ্বর।

তখনই একটা আইসব্যাগ কিনে এনেছিল রজত।

ইন্দ্রাণী হেসেছিল খুব, সর্দি বসে একটু জ্বর হয়েছে তার জন্য আইসব্যাগ। তুমি কি পাগল?

—হ্যাঁ, পাগল। আমার বউয়ের জন্য আমি পাগলই।

—তোমার বাবা-মা কী ভাবছেন বলো তো?

—কেন? তারা ভাববে কেন?

—বারে, তাঁদের বুঝি জ্বরজারি হয় না? তাঁদের জন্য কোনোদিন তুমি আইসব্যাগ কিনে এনেছ?

—অন্যায় করেছি। রজত কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসেছিল, তা বলে তো তোমার কষ্ট হচ্ছে দেখতে পারব না। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা মানে ...

—অসভ্য কোথাকার। ইন্দ্রাণী চিমটি কেটেছিল রজতকে, ওই আইসব্যাগ তুমি আলমারিতে তুলে রাখো প্লিজ। ছি ছি এই সামান্য জ্বরে ... যে শুনবে সেই বলবে, আদিখ্যেতা।

তারপর থেকে আলমারিতেই পড়েছিল আইসব্যাগটা। আর বেরোয়নি কোনোদিন। পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনেও নয়, পাঁচ বছরের বিচ্ছিন্ন জীবনেও নয়।

কাথাটা বোধ হয় ভুল হল। বছরখানেক আগে আলমারি গুছোতে গিয়ে ব্যাগটা চোখে পড়েছিল ইন্দ্রাণীর। গরম জামাকাপড়ের তলায় থেকে থেকে রবারের ব্যাগ গলে গেছে। অযত্নে। অবহেলায়।

ইন্দ্রাণী রজতের চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল, ওটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফেলে দিয়েছি।

—ও। তা হলে মাথাই ধোওয়াও।

ইন্দ্রাণীর অস্বস্তি হচ্ছিল। এক সূক্ষ্ম অপরাধবোধে জীর্ণ হচ্ছিল যেন। ম্লান মুখে বলল, ফ্রিজে আইসকিউব আছে, কিছু বরফ যদি প্লাস্টিকে ভরে কপালে ধরি?

—ধরতে পারো। রজতের গলাতেও যেন সান্ত্বনা, তাতেও খানিকটা কাজ হবে।

ইন্দ্রাণী ডাইনিংস্পেসে এল। ফ্রিজ খুলে বার করার চেষ্টা করল বরফ জমার পাত্রটাকে। পারছে না। ডিপফ্রিজের কঠিন শীতলতায় জমাট বেঁধে আটকে গেছে পাত্রটা। রান্নাঘর থেকে খুন্তি এনে সজোরে চাড় দিল বরফের গায়ে। খোঁচাল কয়েকবার। খুঁড়ল। কোনো কিছুতেই ভাঙছে না তুষারস্তূপ।

ইন্দ্রাণী রজতকে ডাকল, একটু এদিকে শুনে যাও।

রজত উঠে এসেছে, কী?

—বরফটা বেরোচ্ছে না।

ইন্দ্রাণীর হাত থেকে খুন্তিটা নিল রজত। কয়েকবার ঠোক্কর মেরে বলল, খুন্তিতে হবে না, খুন্তি ভেঙে যাবে। অন্য কিছু নিয়ে এসো।

রান্নাঘর থেকে লোহার সাঁড়াশিটা আনতে গিয়েছিল ইন্দ্রাণী, দরজায় বেল বাজল। এখন আবার কে এল! দিদি জামাইবাবু? দাদা বউদি? নাকি ওপরের মায়াদি?

হ্যাঁ মায়াদিই। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, মুনিয়া কেমন আছে রে? জ্বর কমল? বলেই মায়ার নজর গেছে রজতের দিকে। কয়েক সেকেন্ড হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্দ্রাণী অনুচ্চ স্বরে বলল, মুনিয়াকে দেখতে এসেছে।

—ও। রজতকে আপাদমস্তক জরিপ করল মায়া।

রজত সামান্য হাসার চেষ্টা করল, কেমন আছেন?

—ভালো। মায়ার মুখে অসন্তোষের ছাপ—আপনার সংসার কেমন চলছে?

পলকের জন্য রজত পাংশু হয়ে গেল। উত্তর না দিয়ে ধীর লয়ে ঘাড় নাড়ল

শুধু। এত ধীরে যে হ্যাঁ, না, ভালো, মন্দ, কিছুই বোঝা যায় না। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বরফ খোঁড়ায় মন দিল। মায়া রজতকে আর আমল দিল না, সোজা শোওয়ার ঘরে গিয়ে মুনিয়াকে দেখে এল।

ইন্দ্রাণীকে বলল, যা ভেবেছিলাম তাই! জ্বর তো বেশ বেড়েছে!

ইন্দ্রাণী অস্ফুট স্বরে বলল, হুঁ।

—মেয়ে তো একদম নেতিয়ে পড়ে আছে! খেয়েছে কিছু?

—বিকেলে একটু হরলিক্স খেয়েছিল। চিকেন স্যুপ দিতে গেলাম, থু থু করে ফেলে দিল।

—না খেলে তো আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। মায়ার কপালে ভাঁজ পড়ল, তোর বিমানদাকে বলব একবার ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসতে? পারলে বুড়োকে ডেকে আনুক।

ইন্দ্রাণী এক ঝলক রজতকে দেখে নিয়ে ঢোঁক গিলল, আজ রোববার, চেম্বার নেই, আজ কি আসবে?

—আসবে না মানে! ঘাড় আসবে। কী ওষুধ দিয়েছে ঠিক নেই, পাঁচদিন ধরে মেয়েটার জ্বর কমছে না! কত বার বলছি এটা চাইল্ড স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যা, ওই ঢকঢকে বুড়োকে দিয়ে আর হয়!

রজতের চোখে চোখ পড়ে গেল ইন্দ্রাণীর। রজত খোঁড়া থামিয়ে দেখছে ইন্দ্রাণীকে। দেখছে, না মজা পাচ্ছে? নাকি ভর্ৎসনা করছে?

মায়া এসব দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ করেনি, নিজের মনেই বলল, তোরই বা কী দোষ। তুই বা একা হাতে ক দিক সামলাবি? সংসার! মেয়ে! অফিস! বলতে বলতে অপাঙ্গে দেখে নিল রজতকে, প্রবাল আসেনি আজ?

কোনো কারণ নেই তবু কেমন যেন কাঠ হয়ে গেল ইন্দ্রাণী। চাপা গলায় বলল, ও তো এখানে নেই। উটিতে একটা আর্ট ওয়ার্কশপে গেছে। বুধবার ফিরবে।

—প্রবাল থাকলে তোর তাও একটু সুবিধে হয়। মায়া ইচ্ছে করে একটু গলা তুলল,—প্রবালকে দেখলে মুনিয়াটাও বেশ চনমনে থাকে।

মায়াদিটা কী আরম্ভ করেছে! ইন্দ্রাণী যথেষ্ট বিচলিত হল। কিন্তু কিছু বলতেও পারছিল না সে। বলার কিছু নেইও। কথা ঘোরানোর জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তুমি বরং বিমানদাকে একবার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পাঠিয়েই দাও মায়াদি।

—সে তোকে বলতে হবে না। আমি গিয়েই পাঠাচ্ছি। এক্ষুনি না পাঠালে তিনি আবার সুপারহিট মুকাবিলায় বসে যাবেন। পুরুষমানুষের হল ফুর্তির প্রাণ, কোনও দায়িত্ব ফায়িত্বর বালাই থাকে না। মায়া রজতের দিকে কটমট করে তাকাল, প্রবালের কথা অবশ্য আলাদা। কত গুণী অথচ কী সেন্সিবল। কী র‍্যাশনাল। ওরকম ছেলে লাখে একটা পাওয়া যায়।

রজতের কবজির চাপে বরফের চাঁই সুদ্ধু ধাতব পাত্র বেরিয়ে এসেছে এবার। পাত্রটা হাতে ধরে রজত থতমত মুখে দাঁড়িয়ে রইল একটু, তারপর রুক্ষ স্বরে বলল,—এটা কোথায় রাখতে হবে?

ইন্দ্রাণী এগোনোর আগে মায়া বলে উঠেছে, বেসিনে নিয়ে গিয়ে জলের তলায় রাখুন না। বাইরের বরফটা ধুয়ে যাক।

রজত বিনা বাক্যব্যয়ে বেসিনের কল খুলেছে। মায়া দরজার দিকে গিয়েও থামল একবার। আরেকটু খোঁচাল রজতকে, আমি বলি কি ইন্দু, বিয়েটা এবার সেরেই ফ্যাল। দেখছিস তো এক হাত ফেরত ছেলেরাও আজকাল পড়ে থাকে না। আর এ তো ফ্রেশ। ব্যাচেলার। আর ওরকম একটা ভালো ছেলেকে তুই কষ্ট দিবিই বা কেন?

মায়া চলে গেছে। দরজাটা হাট করে খোলা। খোলা দরজা দিয়ে অঘ্রানের হিমরেণু ভেসে আসছিল। ফ্ল্যাট জুড়ে এক অখণ্ড নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ এত গাঢ় যে, আশপাশের ফ্ল্যাটের টিভির আওয়াজও এই শব্দহীনতার ঘেরাটোপ ভেদ করতে পারছিল না। এক প্রান্তে নিশ্চল ইন্দ্রাণী, অন্য প্রান্তে রজত। রজতের হাতে বরফের চাঙড়ে ঢাকা ধাতব পাত্র। বেসিনে জল পড়েই চলেছে। জলে বরফের আস্তরণটুকু ধুয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

ইন্দ্রাণী দরজা বন্ধ করে দিল। পাঁচ বছরের ব্যবধানে আজ হঠাৎ এত সামনাসামনি রজতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এতক্ষণ এক ধরনের অস্বচ্ছ অবরোধ কাজ করছিল দু'জনের মাঝখানে, মায়া এসে আচমকাই যেন শুষে নিয়ে গেছে কুয়াশাটুকু। অবরোধটা যদিও আছে। আছেই। তবু যেন দু'জনে অনেক স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে পরস্পরকে। তাদের মাঝে অনেক না বলা কথা আপনাআপনি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রাণীর হৃৎপিণ্ড, তেত্রিশ বছরের শরীর, ভরাট বুক, নিটোল হাত-পা, ফোলা ফোলা গাল, ফর্সা গ্রীবা এই মুহূর্তে এক স্পন্দন অনুভব করছিল। মায়া ঘরের গুমোট আকাশে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠে বেরিয়ে গেছে।

মন্থর পায়ে রজতের দিকে এগিয়ে গেল ইন্দ্রাণী, মায়াদির কথায় কিছু মনে করো না। মায়াদির মুখের কোনো লাগাম নেই।

রজত কল বন্ধ করে বলল, বরফগুলো কীসে ভরবে ভরে ফ্যালো।

ইন্দ্রাণী ছুটে ঘরে ঢুকে গেল। এই মুহূর্তে রজতের সামনে থেকে সরে যেতে পেরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছিল সে। রজত কি আহত হয়েছে? ফুঃ। ইন্দ্রাণীর তাতে বয়েই গেল।

তোশকের তলা থেকে একটা বড়সড় প্লাস্টিকের ব্যাগ বার করল ইন্দ্রাণী। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থামল। কী মনে করে মেয়ের মুখের কাছে এসে ঝুঁকেছে। মুনিয়ার মুখ বেশ লাল। থেকে থেকে তপ্ত নিশ্বাস পড়ছে।

ইন্দ্রাণী গাঢ় স্বরে ডাকল, মুনিয়া।

মুনিয়া সাড়া দিল না।

ইন্দ্রাণী মেয়ের গালে গাল ছোঁওয়াল, এক্ষুনি কষ্ট কমে যাবে মা।

মুনিয়ার কপালের জলপটি শুকিয়ে খটখটে। কাপড়ের টুকরোটাকে ভিজিয়ে ইন্দ্রাণী লেপটে দিল মেয়ের কপালে। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে রজতের হাত থেকে বরফের টুকরোগুলো নিল, ভরল প্লাস্টিক ব্যাগে, দু'জনে একসঙ্গে ফিরল মেয়ের কাছে।

মুনিয়ার মাথার দু'পাশে বসে আছে তার বাবা-মা। দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে আছে বরফের ব্যাগ। দু'জনেই মেয়েতে নিবদ্ধ, দু'জনে সংশয়ে আকুল, দু'জনেরই স্নায়ু টানটান।

নীরবে বসে থাকতে থাকতে ইন্দ্রাণী একটা ছবি দেখতে পাচ্ছিল। পুরোনো ছবি। মলিন স্মৃতি হয়ে কোনো গোপন কুঠুরিতে ছিল এতদিন, হঠাৎই ভীষণভাবে জ্যান্ত।

দেড় বছরের মুনিয়া খাটে বসে খেলছে। অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে রজত। ইন্দ্রাণী ড্রেসিংটেবিলের সামনে।

রজত বলল, মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছ?

ইন্দ্রাণী বলল, দেখেছি। ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে।

—ছ্যাঁকছ্যাঁক নয়, জ্বর আছে। তোমার কি আজ অফিস না গেলেই নয়?

—এটা কোন মাস খেয়াল আছে? এপ্রিল। এর মধ্যে আমার চোদ্দটা সি এল শেষ। ইন্দ্রাণী কপালে টিপ লাগাল, অফিসে বলে যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব।

—ততক্ষণ জ্বর গায়ে মেয়েটা একা থাকবে?

—একলা কেন? ঊর্মিলা তো আছে!

—বাহ্! এই না হলে মা!

—তুমিও তো বাবা। তুমি ছুটি নিয়ে থাকো না একদিন।

—আমি তোমার মতো সরকারি চাকরি করি না। প্রাইভেট ফার্ম, খেটে পয়সা রোজগার করতে হয়।

—বিয়ের আগে তুমি অন্য কথা বলতে। সংসারের সব কাজ আমরা সমান ভাগ করে নেব! সব ঝড়ঝাপটা দু'জনে একসঙ্গে সামলাব!

—তা বলে আমি জ্বোরো মেয়েও সামলাব? অফিস কামাই করে? আর তুমি নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাবে?

—বাজে কথা বোলো না। কদিন তুমি মেয়ের জন্য অফিস কামাই করেছ? মেয়ের যখন হাম হল কে আর্নড লিভ নিয়ে বাড়িতে বসেছিল? দেড় বছরে আমার কতগুলো ছুটি চলে গেল হিসেব করেছ?

—সেটা তোমার ডিউটি।

—ডিউটি শুধুই আমার একার? তোমার নেই?

—বড় বড় কথা বোলো না।

—কেন বলব না? তোমার চাকরিই চাকরি? আমার চাকরি কিছু নয়? ইন্দ্রাণী ঘুরে বসল, ভুলে যেও না যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছ সেই কোয়ার্টারটাও আমার চাকরির দৌলতে পাওয়া।

—ভুলিনি। তুমি ভুলতে দাও না কোনোসময়ে। কী কুক্ষণে যে নিজের বাড়ি ছেড়ে এই কোয়ার্টারে এসেছিলাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলো সে দোষও আমার! আমি তোমাকে তোমার ফ্যামিলি থেকে ফুসলে নিয়ে এসেছি!

—আমার ভালো লাগে না। আমার ভাল্লাগছে না। রজত অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাল, আমি বলছি তুমি আজ যাবে না, যাবে না।

—তোমার হুকুম?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হুকুম।

—উর্মিলাআআ। ইন্দ্রাণী ব্যাগ কাঁধে উঠে দাঁড়াল, উর্মিলা, মুনিয়া রইল দেখিস। ওকে আজ স্নান করাস না, গাটা গরম আছে। সময় মতো খাইয়ে দিস। আমি দুপুরে চলে আসব।

ইন্দ্রাণী অফিস বেরিয়ে গেল। গরগর করতে করতে রজতও। দেড় বছরের শিশু খেলা ফেলে হাঁ করে দেখছে বাবা-মার চলে যাওয়া।

তখন থেকেই কি ভাঙনের শুরু? মেয়েকে কেন্দ্র করে? নাকি তার আগে থেকেই ঘুণ ধরেছিল সম্পর্কে? মেয়ের অস্তিত্ব শুধু সেই ক্ষয়টাকে প্রকট করে দিচ্ছিল? কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যে সে সময়ে লড়াই করেছে দু'জনে! বাজার নিয়ে! আলুপটল নিয়ে! ঘর সাজানো নিয়ে! আত্মীয়স্বজনেব বাড়ি যাওয়া নিয়ে! ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। কার দোষ বেশি ছিল? ইন্দ্রাণীর? না রজতের? কার মন আগে অন্য দিকে ঘুরে গেল? ইন্দ্রাণীর? না রজতের?

রজত অনেকক্ষণ পর আচমকাই ডাকল ইন্দ্রাণীকে, শুনছ? ও ঘরে তোমার ফোন বাজছে।

আত্মমগ্ন ইন্দ্রাণী পাশের ঘরে যাচ্ছে। দুরমনস্ক মুখে রিসিভার তুলেই ঝাঁকুনি খেল। ওপারে সুদেষ্ণা!

—রজত কি আছে ওখানে?

ইন্দ্রাণী নীরসভাবে বলল, হ্যাঁ।

—একটু ডেকে দিবি কাইন্ডলি?

—দিচ্ছি।

সুদেষ্ণা সত্যি অত্যন্ত অভদ্র। রজত এখানে এসেছে জানে, তার মানে কেন

এসেছে সেটাও জানে, তবু একবার মুনিয়া কেমন আছে জিজ্ঞাসা করল না! করলেও অবশ্য ইন্দ্রাণী খুব একটা পাত্তা দিত না। মুনিয়া ইন্দ্রাণীর। শুধুই ইন্দ্রাণীর। সুদেষ্ণার অধিকার নেই মুনিয়ার কথা জানার।

রজত টেলিফোনে কথা বলছিল, ভারী পর্দার এপাশে ইন্দ্রাণী স্থাণুবৎ। তার এক সময়ের প্রিয় বান্ধবী কথা বলছে তার এক সময়ের প্রিয় মানুষটির সঙ্গে। ইন্দ্রাণী এখন কেউ নয়! ওই দু'জনের!

দু'চারটে শব্দের টুকরো কানে আসছিল ইন্দ্রাণীর।...না না, ডাক্তার আসছে।.. দেখি আরেকটু। ...বলতে পারছি না ঠিক। ...ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে রজতের স্বর। ছিঃ। ইন্দ্রাণী নিজেকে ধমকাল। সে কিনা শেষে আড়ি পাতছে।

ফোন রেখে রজত বাথরুমে গেল। মিনিট কয়েক পরে ফিরেছে। সেও মুখে চোখে একটু জল দিয়ে এসেছে বোঝা যায়। এই আলগা শীত শীত রাতেও। রুমালে মুখ মুছছে।

ইন্দ্রাণী টেরচা চোখে দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকাল, অনেক রাত হয়েছে। নটা বাজে। এবার বাড়ি যাও।

—মুনিয়ার জ্বরটা কমল না.....রজত আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, ভাবছি আজকের রাতটা মুনিয়ার কাছে থেকেই যাই।

—দরকার হবে না। ইন্দ্রাণী কঠিনতর,—এরকম টেম্পারেচার রোজই উঠছে।

—দরকারের কথা নয়। এটা ডিউটির ব্যাপার। আমি বাবা, আমার একটা কর্তব্য আছে। মেয়ের জন্য আমারও তো দুশ্চিন্তা হয়। নিজের চোখে মেয়ের এই অবস্থা দেখে আমি যাই কী করে?

—তাই বুঝি? যাওয়া যায় না বুঝি?

রজত চুপ করে রইল।

ইন্দ্রাণী আবারও হুল ফোটাল, সুদেষ্ণার পারমিশন নিয়েছে?

রজত বিভ্রান্ত মুখে তাকাল, তুমি আমাকে আমার মেয়ের অসুখের সময়েও তার কাছে থাকতে দেবে না ইন্দ্রাণী?

তিন

রাত বাড়ছে।

রজত মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

বিশ্বাস ডাক্তার এসে দেখে গেছেন মুনিয়াকে। কাল রক্ত পরীক্ষা করাতেই হবে। সঙ্গে স্টুল ইউরিনও। অসুখটা সম্ভবত ফ্লু নয়, টাইফয়েড গোছের কিছু হবে। তবে তাঁর মতে সাময়িক উত্তেজনা থেকে নাড়ির গতি চঞ্চল হয় অনেক সময়ে। সেটাও

হয়তো জ্বর বাড়ার একটা কারণ। জ্বর কমানোর জন্য ওষুধও দিয়ে গেছেন তিনি। তরল পাইরেজেসিক। রজতই বেরিয়ে কিনে এনেছে ওষুধ। বিমানের বাধা শোনেনি। মায়ার ব্যঙ্গও না। এক ডোজ ওষুধ পড়ার পর থেকেই মুনিয়ার জ্বর নামছে একটু একটু করে।

মায়া আর বিমান বার বার ইন্দ্রাণীকে বলে গেছে একটু অসুবিধা হলেই তাদের ডাকতে। রজতের উপস্থিতি তারা ধর্তব্যেই আনতে চায়নি। তাতেই বুঝি আরও জেদ চেপে গেছে রজতের। সে আজ মুনিয়ার কাছে থাকবেই।

ইন্দ্রাণী টুকটাক ঘরটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিল। বরফের প্লাস্টিক ব্যাগ বাথরুমে রেখে এল। খাটের লাগোয়া ছোট টেবিলে ওষুধপত্রগুলো সাজিয়ে রাখল ঠিক করে। মুনিয়ার জামা প্যান্ট, ইন্দ্রাণীর শাড়ি সায়া ব্লাউজ শুকোচ্ছিল বারান্দায়, রতনের মা দুপুরে কেচে মেলে দিয়ে গেছে, সেগুলোকে তুলে এনে ভাঁজ করে আলনায় রাখল। মুনিয়ার পড়ার টেবিলে প্রবালের একটা ফোটোগ্রাফির বই পড়ে আছে, প্রবালই রেখে গেছে যাওয়ার সময়, রজতকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ইন্দ্রাণী বইটাকে সরিয়ে রাখল ড্রয়ারে। ছোট্ট হীরে বসানো প্রবালের একটা আংটি ড্রয়ারে পড়ে আছে, আংটিটাকে ঠেলে দিল ভেতর দিকে। কেন যে ঠেলল ইন্দ্রাণী নিজেও জানে না।

জ্বর কমার পর মুনিয়া অল্পস্বল্প কথা বলছিল, রজত মুনিয়ার কপালে মৃদু চাপড় দিল, হল কী তোর? চোখ বোজ।

মুনিয়ার শীর্ণ ঠোঁটে অনাবিল হাসি। লাজুক মুখে বলল, ঘুম আসছে না বাপি।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, কিছুই তো মুখে তুললি না, এখন খাবি একটু কিছু?

—কী খাব?

—হরলিক্স খা।

মুনিয়া নাক কুঁচকোল।

—চিকেন স্যুপ? ওপরে গোলমরিচ ছড়িয়ে দেব, ভালো লাগবে।

—নন্‌না।

রজত বলল, সলিড কিছু দাও না। কড়া করে টোস্ট?

মুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজি, খালি একপিস টোস্ট খাব।

রান্নাঘর থেকে টোস্ট করে আনতে আনতে মুনিয়ার গলা শুনতে পাচ্ছিল ইন্দ্রাণী, বাপি তুমি সত্যি সত্যি আজ থাকবে তো?

রজত বলল, থাকব রে বাবা, থাকব।

—আমি যখন ঘুমোব তখনও থাকবে?

—হুঁউউ।

—আমার পাশে ঘুমোবে?

—ঘুমোব। রজত শব্দ করে হাসছে। ঠিক যেভাবে হাসতে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করার আগে। পরে পরেও। হাসিটা কেন যে হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল? উহুঁ, হাসিটা রজত স্থগিত রেখেছিল। অন্য আরেকজনের জন্য। ইন্দ্রাণী এখনও ভেবে পায় না রজত কী দেখেছিল সুদেষ্ণার ভেতর? সুদেষ্ণা ইন্দ্রাণীর মতো সুন্দর নয়, গায়ের রং বেশ চাপা, ইন্দ্রাণীর তুলনায় কালোই বলা যায়। কথাবার্তায় সব সময়ে কেমন আদুরে আদুরে ভাব। কলেজে বন্ধুরা কম হাসাহাসি করত সুদেষ্ণার কথার ভঙ্গি দেখে? বলত, ওর মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো উচিত হয়নি, হওয়া উচিত ছিল মাদি বেড়াল।

মনে মনে একটু হাসল ইন্দ্রাণী। বেশিরভাগ পুরুষই আত্মাভিমানী মেয়ে পছন্দ করে না, ওই মাদি বেড়াল স্বভাবটাই ওদের টানে বেশি। প্রবাল অনেক অন্যরকম। অনেক খোলামেলা। তার কাছে প্রিয় নারী অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। এই সৌন্দর্যের কোনো বন্ধন নেই। ঘাস ফুল লতাপাতা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানখেতের মতো এও যেন এক প্রকৃতির বিস্ময়। এ কথা প্রবালই তাকে বলেছে বারবার।

প্রবালই কেন প্রথম থেকে জীবনে এল না ইন্দ্রাণীর?

এই মুনিয়া, এত জটিলতা থাকত না তা হলে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জীবনটার মুখোমুখি হতে হত না ইন্দ্রাণীকে।

ইন্দ্রাণী টোস্ট এগিয়ে দিল মেয়ের দিকে, উঠে বোসো। খেয়ে নাও।

মুনিয়া রজতের হাত চেপে ধরল, বাপি খাইয়ে দেবে।

বুকের ভেতর পিন ফুটছে, তবু ইন্দ্রাণী নিজেকে নিস্পৃহ রাখার চেষ্টা করল। ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে খাওয়া দেখল মেয়ের। শান্ত মুখে প্লেট নিয়ে চলে গেল। ফিরে এসে আরও নিরুত্তাপ মুখে বলল, একবার বাথরুমে যাবি তো?

রজত বলল, হ্যাঁ যাও। এবার মা'র সঙ্গে গিয়ে একটু বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।

বাবার বাধ্য মেয়ে মার হাত ধরে টলতে টলতে বাথরুমে যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত ভার মা'র ওপর ছেড়ে দিয়ে।

ইন্দ্রাণী ফিসফিস করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, তুই সত্যি সত্যি বাবার কাছে শুবি? শুতে পারবি?

বুদ্ধিমতী মুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মা'র গলা জড়িয়ে ধরেছে, বাপি তো একটা দিন আছে মা। একদিন বাপির কাছে শুই? কাল থেকে আবার তোমার কাছে শোব।

ইন্দ্রাণীর কেমন ধন্দ লাগছিল। লোকে বলে পিতৃত্ব নাকি সংস্কার আর মাতৃত্ব জৈবিক টান। তাই যদি হয় তবে মুনিয়া আর রজতের এই সম্পর্ককে কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায়?

ঘরে এসে মুনিয়া শুয়ে পড়েছে। রজত মেয়ের পাশে আধশোয়া। ইন্দ্রাণীরই বিছানায়।

ইন্দ্রাণী আলমারি খুলে একটা গায়ে দেওয়ার চাদর বার করল। বিছানা থেকে বালিশ নিল একটা। বালিশ চাদর বাইরের ঘরের সোফায় রেখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

পৃথিবী আবছা কুয়াশায় ঢেকে আছে। নীচের রাস্তার বাতিগুলো কেমন হলদেটে। ম্লান। নিঝুম হয়ে আসছে চারদিক। আশপাশের কোয়ার্টারগুলোর শরীরেও ঝিমুনি নেমেছে। ইন্দ্রাণী রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্থির। দূরে কোথাও থেকে একটা আবছা গানের কলি ভেসে আসছে। পুরোনো কোনও বাংলা গান কোথাও বোধহয় জলসা হচ্ছে। ইন্দ্রাণী তার অবচেতনায় গানটাকে চেনার চেষ্টা করছিল। সুর বড় চেনা, চেনা, কিন্তু গানটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। চেনা চেনা সুর অনুপ্রবেশকারীর মতো ঢুকে পড়ছে ইন্দ্রাণীর ভাবনায়।

হঠাৎই রজতের উপস্থিতি টের পেল ইন্দ্রাণী। রজত নিঃসাড়ে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইন্দ্রাণী নীচু গলায় প্রশ্ন করল, মুনিয়া ঘুমিয়েছে?

—এই ঘুমোল।

—তুমি খাবে তো কিছু?

—দিলে খাব। রজত বুঝি একটু কৌতুক করল।

ইন্দ্রাণী কথা বলল না।

অল্পক্ষণ নীরবতার পর রজতই আবার বরফ ভাঙল, তুমি রাগ করেছ?

—কেন?

—এই আমি জোর করে থেকে গেলাম বলে?

—তোমার মেয়ের কাছে তুমি থাকছ, আমার কী বলার আছে?

—তোমার অসুবিধে হল।

—অসুবিধে আমার নয়, তোমারই। নিজের বাড়ি ছেড়ে...বউ ছেড়ে.....

—তুমি এখনও পুরোনো রাগ ভুলতে পারোনি।

—তুমি পেরেছ তো? ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা বলতে গিয়েও ইন্দ্রাণীর স্বরে শ্লেষ ফুটে উঠল।

রজত চুপ।

ইন্দ্রাণী নিজেকে সংযত করে নিল, খাবে চলো।

রাত প্রায় এগারোটা।

ইন্দ্রাণী আর রজত ডাইনিংটেবিলে বসে খাচ্ছিল। মুনিয়ার অসুখ বলে বেশি কিছু রান্না হয়নি আজ। কদিন ধরে হচ্ছে না। রতনের মা অল্প মুরগির মাংস রেঁধে রেখে গেছে, সঙ্গে গোটা পাঁচ-ছয় রুটি। ওবেলা খানিকটা ভাত বেঁচেছিল, ইন্দ্রাণী গরম করে নিয়েছে ভাতটুকু। রজত রাত্তিরবেলা ভাত খেতেই বেশি ভালবাসত। সঙ্গে কিছু স্যালাড কেটে নিয়েছে ইন্দ্রাণী। শসা টোম্যাটো পেঁয়াজ ধনেপাতা।

রাত বাড়ছে। নিঃশব্দে নৈশ আহার সেরে চলেছে অনাত্মীয় দম্পতি।

রজত আচম্বিতে বলে উঠল, তোমার মায়াদি ঠিকই বলেছিল।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত মুখে তাকাল।

রজত এমন নিম্নস্বরে বলল যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে কথাটা, তুমি প্রবালকে বিয়ে করে নাও।

হঠাৎ এ কথা কেন?

হঠাৎ নয়। এতক্ষণ ভাবছিলাম। তুমি কতদিন আর একা একা থাকবে?

—আমি একা তোমায় কে বলল?

—আমি জানি। আমি কি তোমাকেও একটুও চিনি না? নয় নয় করেও পাঁচটা বছর তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম।

—না। চেনো না।

দরজা জানলা বন্ধ তবু বাইরের হিমহিম ভাব ছড়িয়ে গেছে ভেতরে। ইন্দ্রাণী বাষ্পহীন স্বরে প্রশ্ন করল, তুমি কি পাপবোধে ভুগছ রজত?

—কীসের পাপবোধ? আমি কোনও পাপ করিনি। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছিলে না, আমরা আলাদা হয়ে গেছি।

—ব্যস এটুকুনই?

—আর কী? আবার বিয়ে করার কথা বলছ? রজত গলা ভারী করল, আমি কোনও সাধুসন্ন্যাসী নই, আমার কামনা বাসনা থাকতেই পারে। অ্যান্ড আই হ্যাভ গট ম্যারেড। ইন্সিডেন্টলি অর অ্যাক্সিডেন্টালি সে তোমার বন্ধু।

খুব সপ্রতিভভাবে কথা বলতে চাইছে রজত, ইন্দ্রাণী দীপ্তিহীন হাসল, দ্যাখো, পাঁচ বছর তোমার সঙ্গে ছিলাম ঠিকই, আমাদের সেপারেশনও পাঁচ বছর আগে হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে এখন আমার ঝগড়া করার সম্পর্কও নেই। স্পৃহাও নেই। আজ যদি কোনও কথা হয়ও তবে তাতে কোনও লুকোছাপা না থাকাই ভাল।

—কী নিয়ে লুকোছাপা করব আমি? কেন করব? রজত বিষণ্ণ হাসল, আমার সঙ্গে সুদেষ্ণার অ্যাফেয়ার ছিল কি না, তোমার সঙ্গে প্রবালের কোনও বিশেষ সম্পর্ক ছিল কি না এসব কথা এখন অবান্তর। আমি বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছি, তুমি সুদেষ্ণার বাড়ি গিয়ে সুদেষ্ণার খোঁজ করেছ। আমিও অফিস ছুটির পর শিকারি বেড়ালের মতো প্রবালের ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছি, যদি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে ধরতে পারি! কিন্তু এসব কথা এখন কেন তুলব আমরা? সুদেষ্ণা বা প্রবাল তো অনেক পরের ফ্যাক্টর। বলতে পারো আফটার এফেক্ট। তার অনেক আগে থেকেই তো পরস্পরের ওপর আমরা বিশ্বাস হারিয়েছিলাম। রেসপেক্টও। কোনও সম্পর্কে ফাটল না ধরলে.....

—ফাটল আমি তৈরি করিনি। তুমি তৈরি করেছ। ইন্দ্রাণী এতক্ষণে ধৈর্য হারাল,

তোমার রুচি আলাদা। তোমার বিস্তার লেভেল আলাদা। তোমার মধ্যে অনেক কমপ্লেক্স। ফ্ল্যাট নিয়ে। আমার চাকরি নিয়ে। আমি যে স্বাবলম্বী সেটাই তো তুমি বরদাস্ত করতে পারোনি।

—হয়তো তাই। ইন্দ্রাণী যতটা উত্তেজিত, রজত ততই নির্লিপ্ত, তোমার হিসেবে তুমি ঠিক। আবার আমার হিসেব অন্যরকম। তুমি ভয়ানক জেদি। তুমি অহঙ্কারী। আমার বাবা মাকে তুমি কোনওদিন মানুষ বলে গণ্য করোনি। আমার কোনও নিজস্ব সার্কল থাক তা তুমি সহ্য করতে পারোনি। বাট অল দিজ থিংস আর পাস্ট ইন্দ্রাণী। আমাদের ডিভোর্সে এখন কোনও কারণ ছিল না যা অন্য লাখ লাখ ডিভোর্সের কারণের থেকে আলাদা। ঠিক?

ইন্দ্রাণী নিজের অজান্তেই ঘাড় নেড়ে ফেলল।

—তা হলে তোমারও আর পুরনো রাগ পুষে রেখে ভাল নেই। আমারও কোনও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। পাঁক ঘাঁটাও উচিত নয়। রজত ইন্দ্রাণী দিকে ঝুঁকল, আনমনে একটা একটা শসার টুকরো মুখে ফেলে চিবোল খানিকক্ষণ। আত্মগতভাবে বলল, আমরা যখন শেয়াল-কুকুরের মতো ঝগড়াঝাঁটি করতাম, পরস্পরকে আঁচড়াতাম, কামড়াতাম, দুজনেরই মনে হত আমি ভাল, তুমি খারাপ। কিন্তু কথাটা তো সত্যি নয়। আমরা কেউই ভাল লোক নই, কেউই খারাপ লোক নই। উই আর জাস্ট টু অর্ডিনারি পিপল। মোস্ট অর্ডিনারি। অকিঞ্চিৎকর রকমের সাধারণ। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, সামান্যতম সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উন্মত্ত দুটো মানুষ মাত্র। যাদের শুধু চাই চাই। যারা পরস্পরকে কিছু দেবে না। দিতে চায় না। এমন দুটো জীব।

রজতের কথায় কোনও ঝাঁঝ নেই, কোনও তিক্ততা নেই, যেন অমোঘ এক দৈববাণী উচ্চারণ করছে সে।

ইন্দ্রাণী ঠিক মানতে পারছিল না কথাগুলো। কোথায় যেন বাধাছিল তার। সত্যিই কি তারা ওইরকম?

থমথমে মুখে ইন্দ্রাণী বলল, তুমি গায়ে পড়ে এত কথা শোনাচ্ছ কেন? আমি তো কোনও পুরনো কথা তুলিইনি। তুমি নিজেই....

—হ্যাঁ, আমি নিজেই তুলেছি। নিজেই বলছি। রজত গ্লাসের জলে অল্প হাত ধুয়ে নিল, আমি মুনিয়াকে দেখতে এসেছিলাম। আমার অনেক দ্বিধা ছিল। আসার আগেও ছিল। আসার পরেও ছিল। কিন্তু এখন আমার বেশ মজা লাগছে।

—মজা?

—হ্যাঁ মজা। কেন জানো? দেখলাম এখনও তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাইছ।

—কখ্খনো না।

রজত হেসে ফেলল, এখনও সেই জেদ। সেই একা একা কষ্ট পাওয়া।

—আমি কষ্ট পাই না। আমি একা ভাল আছি।

—নেই। প্রবালকে বিয়ে না করে তুমি মেয়ের কাছে জিততে চাইছ। এখনও আমাকে হারাতে চাইছ। পারছ না।

ইন্দ্রাণী সহসা কেঁপে উঠল। প্রবল ঠাণ্ডায় এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যেন তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রজত।

ইন্দ্রাণীর শীত করছিল। ভয়ঙ্কর শীত।

চার

সামান্য শব্দে ইন্দ্রাণীর তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল।

এখন ঝকঝকে সকাল।

ভোরের মুখে কখন চোখ দুটো জড়িয়ে এসেছিল ইন্দ্রাণীর। বসার ঘরের সোফায় শুয়ে ঘুম আসেনি সারারাত। কিছুটা অনভ্যস্ত শয্যার জন্য। কিছুটা বা অন্য কোনও কারণে। চোখের পাতায় একটুখানি ঘুম নামলেই ইন্দ্রাণী চমকে জেগে উঠেছে। কেউ এল কী ঘরে।

আসেনি। ইন্দ্রাণী নিজেই উঠে কয়েকবার উঁকি দিয়েছে ও ঘরে। হালকা নীল নাইটল্যাম্পের আলোয় কী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল রজত। মুনিয়াকে বুকে আঁকড়ে।

সত্যিই কি রজত ঘুমোচ্ছিল? নাকি ঘুমের ভান করে শুয়েছিল মাত্র? ইন্দ্রাণী বুঝতে পারেনি। তবু কোনও এক গূঢ় সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করছিল মনে মনে। কেন একবারও এল না কেউ?

ইন্দ্রাণী গুটিসুটি মেরে উঠে বসল। মোটা চাদরটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিল গায়ে। সামনেই দেওয়ালে প্রবালের পেন্টিং। একা নারী দাঁড়িয়ে আছে জানলায় দু'হাতে খামচে আছে জানলার শিক। জানলার ওপারে উন্মুক্ত আকাশ। জানলার পাশেই খোলা দরজা। ছবিটা প্রবাল একজিবিশনে দিয়েছিল, কিন্তু বিক্রি করেনি। ছবির নাম ছিল, তুমি। ইউ।

সেই ছবির কাচে বিম্বিত এক পুরুষের ছায়া। রজত। দরজায় দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রাণী ঘুরল। রজত যাওয়ার জন্য তৈরি।

ইন্দ্রাণী বলল, ঘরে এসো।

রজত দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে। বলল, মুনিয়ার এখন টেম্পারেচার নিলাম। একশোর নীচে আছে।

—মুনিয়া উঠে পড়েছে?

—উঠেছিল। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

—তুমি কি এক্ষুনি যাচ্ছ? ইন্দ্রাণী নরম স্বরে বলল, একটু বোসো। চা খেয়ে

যাও।

রজত ঘড়ি দেখল, নাহ্‌ দেরি হয়ে যাবে। আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস যাব। তুমি মুনিয়ার টেস্টগুলো করিয়ে নিও।

ইন্দ্রাণী সোফা থেকে নামল। বাইরে একটা চমকদার নীল আকাশ ফুটে আছে। বারান্দায় ঝিলমিল করছে রোদ। ছোট্ট একটা চড়ুই রোদ্দুরে পিকপিক নাচছে।

ইন্দ্রাণীর ফ্ল্যাটের দরজা নিজে নিজেই খুলল রজত। বাইরে বেরোতে গিয়েও পিছন ফিরল একবার—আমি বিকেলে আসব। অফিস থেকে।

রজত চলে গেল। তার পায়ের আওয়াজ ক্ষীণ হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী খোলা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। তারপর আবার সোফায় ফিরে গুটিসুটি মেরে বসল।

পৃথিবীর কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। শুধু ইন্দ্রাণীর বুকটাই এখন অদ্ভুতরকমের নির্জন। তার মধ্যে আর রাগ নেই। বিদ্বেষ নেই। অসূয়া নেই। ঘৃণাও নেই। তার হৃদয়ে এখন উপড়ে ফেলার মতো কোনও শিকড়ই অবশিষ্ট নেই আর। এত ভয়ঙ্কর শূন্যতায় কী যে কাঙাল হয়ে যায় মানুষ।

ইন্দ্রাণী ডুকরে কেঁদে উঠল।

মধুচন্দ্রিমা, দ্বিতীয় পর্ব

জায়গাটা এখনও একই রকম আছে। সেই লম্বা লম্বা লোহার পাতে ঘেরা কম্পাউন্ড, চতুর্দিকে উঁচু উঁচু শাল সেগুন ইউক্যালিপটাসের পাহারাদারি। বাহারি লাল টালি ছাওয়া বনবাংলোখানা এখনও একই রকম ঝকঝকে। গেট দুটোকে এফোঁড় ওফোঁড় করে গড়িয়ে গেছে মোরাম বিছানা রাস্তা। কম্পাউন্ডের ভেতরেই পাহাড় প্রান্তে ঝাঁকড়া মহুয়াগাছখানাও আছে, গুঁড়িকে বেড় দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকার বাঁধানো পুবমুখো বেদিটাও। শুধু আউটহাউসটাই যা আরও জীর্ণ হয়েছে। চৌকিদারের কোয়ার্টারটাও। এক পাশে বিট অফিসারের অফিস কাম বাসস্থান। অল্পস্বল্প ঝোপঝাড় আছে ওদিকটায়। সেবারও ছিল। ফালি বাগানটাও আছে সামনে, গোলাপ ফুটে আছে কয়েকটা।

বনবাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিচ্ছিল মৈনাক। এইমাত্র চৌকিদার এসে খাতায় সইসাবুদ করিয়ে নিয়ে গেল। লোকটা মৈনাককে বেশ অবাকই করেছে। বাঙালি! নাম শশধর বেরা, থাকত মেদিনীপুরের ঘাটাল মহাকুমায়। কে এক তার মেসো আছে পাটনায়, বনদফতরের কর্মচারী, তাকে ধরে-করে শশধরের এই চাকরি। বয়স বেশি নয়, মেরেকেটে তিরিশ-বত্রিশ। মহাগপ্পোবাজ, এতক্ষণ নিজের কাহানি সাতকাহন করে শোনাচ্ছিল। বোতল আনার প্রস্তাবও দিচ্ছিল ঠারেঠোরে। মৈনাক সঙ্গে এনেছে শুনে বেচারা বেজায় হতাশ।

চিন্তাভাবনা করে মৈনাক দুটো মিলের অর্ডারও দিয়ে দিল শশধরকে। টাকাও। সওয়া একটা বাজে, পথে আজ যথেষ্ট উলটোপালটা খাওয়া হয়েছে, এখনও তেমন খিদে হয়নি, আগে দু কাপ চা আনতে বলল। এক্ষুনি এক্ষুনি ওটারই বেশি প্রয়োজন।

সুতপা এসেই বাথরুমে সেঁধিয়ে গেছিল। বেরিয়েছে। মৈনাক গলা পাচ্ছিল সুতপার। ঘরে এল মৈনাক,—হলোটা কী? হাঁকাহাঁকি করছ কেন?

—বাইরে কেষ্টঠাকুরটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? স্যুটকেসটা খুলে দাও।

—তাড়াহুড়োর কী আছে?

—আমার শীত করছে। নীল শালটা বার করে দাও দেখি। হাওয়াই চটিটা কোথায় ঢুকিয়েছিলে?

মৈনাক সামান্য বিরক্ত হল। একটুও তর সয় না। যা চাই তক্ষুনি চাই।

ঝুঁকে স্যুটকেসের ডালা খুলল মৈনাক। ভেতরটা গন্ধমাদন, চার দিনের জন্য

বেড়াতে এসে চব্বিশটা শাড়ি ঠেসেছে। এর মধ্যে কোথায় যে বিশল্যকরণীটা খুঁজবে?

পথে সিন্থেটিক শাড়ি পরে ছিল সুতপা, এখন একখানা আটপৌরে তাঁত জড়িয়েছে। রাঁচির হোটেলে মোটামুটি ভাঁজ করে কিট্‌সব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছিল শাড়িটা। এখনও অবশ্য ভালো করে পরা হয়নি, পরব পরব ভঙ্গিতে পেঁচিয়ে রেখেছে তনুলতায়। যদি অবশ্য তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি কোমর শোভিত দেহকাণ্ডটিকে এখন তনুলতা বলা যায়। তার ডিম্বাকৃতি মুখটা ভিজে ভিজে। টাটকা টাটকা। সাবান ধোওয়া।

চুলে চেপে চেপে চিরুনি টানছে সুতপা। বাসে জানালার ধারে বসেছিল, হাওয়ায় ধুলোয় চুলে বিচ্ছিরি জট। ছাড়াচ্ছে। মৈনাকের গরুখোঁজা ভঙ্গি দেখে অপ্রসন্ন না হয়ে মুখ টিপে হাসল,—তলায় দ্যাখো। ডান দিকে।

একই সঙ্গে নিজের গায়ে দেওয়ার শালও বের করে নিল মৈনাক। এক সেট পাজামা পাঞ্জাবিও। প্লাস্টিকে মোড়া হাওয়াই চপ্পল ফেলে দিল সুতপার সামনে। বিরস গলায় বলল,—আর কোনও হুকুম?

সুতপা ভ্রূভঙ্গি করল,—আহা, কলকাতায় তো নড়ে বসো না, এখানে নয় একটু করলেই।

মৈনাক প্রতিবাদ জুড়ল না। কলকাতায় সে যে একটু বেশি বাবুগিরি করে এ তো মিথ্যে নয়। ঘরসংসার, মেয়ে, পড়াশুনো, এমনকি বাজারহাটের অনেকটাই সুতপা দশ হাতে সামলায়।

ভ্যানিটিব্যাগ খুলে টুকটাক প্রসাধনী বার করে ড্রেসিংটেবিল সাজিয়ে ফেলেছে সুতপা। চিরুনি রেখে ভেসলিনের স্টিক ঘষল ঠোঁটে। এই ভরদুপুরেও হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা এখন, এখন ফোঁটা জলীয়বাষ্প নেই, চড়চড় করছিল ঠোঁট দুটো।

ঘরের মধ্যিখানে দু'খানা সিঙ্গল-বেড খাট। ছত্রি লাগানো। মশা আছে বোধ হয়। দুই খাটের মাঝে হাত চারেকের ব্যবধান। ধোপদুরস্ত চাদর পেতে দিয়ে গেছে শশধর, পায়ের কাছে কম্বল। বাথরুমে ঘুরে এসে ওপাশের খাটে বসল মৈনাক। সিগারেট ধরিয়েছে, সাইডটেবিলের অ্যাশট্রে কোলে টেনে নিল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—ঘরখানা কিন্তু বেশ।

—হুম্। খুব টিপটপ। মেঝের কার্পেটখানাও দ্যাখো কী পরিষ্কার।

—কী নেই বলো? ওয়ার্ড্রোব ড্রেসিংটেবিল সোফাসেট......একটা ফায়ারপ্লেসও আছে। রাত্তিরে ঠাণ্ডা লাগলে বলব, শশধর জ্বালিয়ে দেবে।

—বাথরুমে গিজারও আছে।

মৈনাক মৃদু হাসল,—যাক তোমার আফসোস তা হলে এতদিনে মিটল?

সুতপাও হেসে ফেলল। পনেরো বছর আগে তারা এসেছিল এখানে। হানিমুনে। অষ্টমঙ্গলার পরের রাতেই হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন, ভোরে রাঁচি নেমেই সোজা

এই পাহাড়শিখর। সুখে আনন্দে গলতে গলতে,. চঞ্চল প্রজাপতির মতো নাচতে নাচতে এই বাংলোয় পৌঁছেই মাথায় হাত। যাঃ, বুকিং-এর কাগজটাই তো রাঁচি থেকে আনা হয়নি। ছোট্ ছোট্ ছোট্, অন্য কোথাও যদি জায়গা মেলে। নেই। কোথ্থাও ঠাঁই নেই। বড়দিনের ছুটিতে এই পাহাড় সেবার টুইটম্বর। অগত্যা ফের এই ফরেস্ট বাংলো, চৌকিদারের বদান্যতায় কোনওক্রমে আউটহাউসে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা। ডিসেম্বরের প্রবল শীতে সারা রাত সে কী হিহি কাঁপুনি। খাটবিছানা নেই, চৌকিদারের দেওয়া উলঙ্গ দড়ির খাটিয়ায় গায়ের শাল বিছিয়ে একটা মাত্র কম্বলে জড়াজড়ি করে শুয়ে উষ্ণতা খোঁজার চেষ্টা করছে বনদম্পতি। মেঝে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা উঠছে, দেওয়ালে ফুঁড়ে হিম দাঁত বসাচ্ছে শরীরে, দরজা জানালার ফাঁকফোকর গলে ধারালো ছুরি চালাচ্ছে শীতল বাতাস। হাত পায়ে সাড় নেই, হাঁটু মুড়লেও কষ্ট হচ্ছে, কখনও মনে হচ্ছিল এই রাতই বুঝি শেষ রাত। পরদিন রাতের তাপমাত্রাটাও জেনেছিল তারা। শূন্য ডিগ্রি। বাপস্ সে এক অভিজ্ঞতা বটে। বনবাংলোর এই ঘরগুলোর দিকে সাধে কি সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকত সুতপা!

পুরোনো স্মৃতি দূরমনস্ক করে দিচ্ছিল সুতপাকে। আনমনে জিজ্ঞেস করল,—তোমার সেই চৌকিদারটার কথা মনে আছে?

—সেই পাঁড়েজি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁড়েজি। সে এখন কোথায় কে জানে!

—কবেই রিটায়ার করে গেছে। তখনই তো বেশ বুড়ো ছিল। মিনিমাম পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। অ্যাদ্দিনে হয়তো পটল।

—লোকটা কিন্তু খুব ভালো ছিল। আউটহাউস খুলে দিল আমাদের কষ্ট দেখে পরের দিন তোষক কম্বলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল........

—আমাদের নয়, তোমাকে দেখে। মৈনাক চোখ টিপে হাসল,—যুবতী মেয়ের কষ্ট বেচারার প্রাণে সহ্য হয়নি।

—মোটেই না। সবাই কি তোমার মতো? ইয়াং মেয়ে দেখলেই গলে যায়?

মৈনাকের হাসি টাল খেয়ে গেল। কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে তার কাছে প্রায়শই ছাত্রীরা আসে। সে পড়ায় ইতিহাস, ছাত্রের থেকে ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। মেয়েগুলোর সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই সুতপার কপালে ইয়া ইয়া ভাঁজ। প্রথম প্রথম ঈর্ষাটা উপভোগ করত মৈনাক, ইদানীং কেমন বিরক্ত লাগে। অনেক তো বয়স হল, মেয়ে পর্যন্ত বড় হয়ে গেছে, এখনও কি সুতপার এ সব বাতিক শোভা পায়? একটু-আধটু পদস্খলন কোন পুরুষের হয় না? ধোঁয়া দেখলেই চেঁচাতে হবে?

সুতপা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি মৈনাককে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুঁচি ফেলছে। ঝপাং করে কাঁধে আঁচল ছুড়ে বলল, —খাওয়ার অর্ডার দিয়েছ?

মৈনাক সরাসরি জবাব দিল না। পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল,—কী খাবে?

—যা হয় একটা কিছু হলেই হল।

—উঁহু। বি স্পেসিফিক।

—তখন যা ঠাণ্ডা কচুরি খাওয়ালে, এখনও গলা টক হয়ে আছে। পাতলা পাতলা মুরগির ঝোল আর ভাত বলে দিতে পারো।

—মহারানির জন্য তাই বলা হয়েছে। মৈনাক চেপে চেপে সিগারেট নেভাল,—ভাগ্যিস আমি আগে মুখ ফুটে মেনুটা বলে দিইনি, তা হলে তুমি নিশ্চয়ই আন্ডাকারি চাইতে।

সুতপা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল,—মানে?

—মানে নিজেকেই জিজ্ঞেস করো। কাল দুপুরে মাছের অর্ডার দিলাম, চিকেন কেন নয় বলে মুখ বেঁকালে। যেই না রাতে চিকেন বলেছি, অমনি মটন খাওয়ার সাধ জাগল। আমি যা করব, তাই তো খারাপ।

—সব কথা অমন বেঁকিয়ে ধরো কেন?

—আর তুমি? তুমি একেবারে সরল সাদাসিধে....

বিতণ্ডা এগোতে পারল না। দরজায় ঠকঠক। শশধর। হাতে চায়ের ট্রে। কাপ প্লেট নামিয়ে শশধর বলল,—কটার সময় খাবেন স্যার?

—কখন বলব? মৈনাক সুতপাকে দেখল,—আড়াইটে?

—হ্যাঁ। আড়াইটেই ভালো। সুতপা চা নিয়ে অন্য খাটটায় বসেছে। শশধরকে জিজ্ঞেস করল,—রান্না কে করে? তুমি?

—না ম্যাডাম। আমার বউ।

—বেশি ঝাল দিতে বারণ কোরো। আমরা ঝাল-মশলা কম খাই।

ঘাড় নাড়ল শশধর,—রাতে কী খাবেন ম্যাডাম?

—এক্ষুনি বলতে হবে?

—আজ্ঞে, বাজার করতে হবে তো।

শশধর হাত কচলাচ্ছে। মৈনাক ইঙ্গিত বুঝে গেল। সুতপাও। টাকা চাই।

পার্স খুলে মৈনাক একটা একশো টাকার নোট বার করে দিল,—হিসেব রেখো। আগেও একশো দিয়েছি। রাতেও আজ মুরগিই হোক। সঙ্গে রুটি। ভালো করে স্যালাড বানিও। বলেই চোখ ফের সুতপায়,—কী চলবে তো? নাকি মাটন বলব?

শশধর বলে উঠল—এখানে রোজ মাটন পাওয়া যায় না স্যার। কাল ভেদিয়ায় হাট বসবে, ওখানে মিলতে পারে।

— বেশ, কালই এনো তবে। তোমার ম্যাডাম দু-পেয়ের চেয়ে চারপেয়েটাই বেশি পছন্দ করে। আর হ্যাঁ, এখানে মশা কেমন?

—আছে স্যার। তবে এখন একটু কম। জব্বর ঠাণ্ডাটা পড়েছে তো।

—ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়?

শশধর বোধ হয় ঠিক বুঝল না। মাথা চুলকোচ্ছে,—হ্যাঁ মানে.......শীতে ম্যালেরিয়া হয় না স্যার।

—না বাবা, তুমি মশারি দিয়ে যেও।

শশধর মাথা নেড়ে চলে যেতেই সুতপা বলল,— তোমার কি টাকা উপচে পড়ছে? ঝপ ঝপ একশো একশো বার করে দিচ্ছ, ও তো মেরে ফাঁক করে দেবে।

—কত আর মারবে! দু-চার পয়সা হাতে না এলে ওই বা খুশিমনে সার্ভিস দেবে কেন!

— লোকটার কিন্তু খুব খাঁই। চোখ দেখলে বোঝা যায়। পাঁড়েজি মোটেই এরকম ছিল না। আমরাই ডেকে ডেকে টাকা দিতাম, মনে আছে?

—সময় বদলে গেছে তপু। চাইলেই তো আর সব কিছু আগের মতো হবে না। তুমি আমিই কি আর আগের মতো আছি?

—ওকে আসকারা দিও না, মাথায় চড়ে বসবে। সুতপা চায়ে চুমুক দিল,— এবার খরচার হাতটাও একটু কমাও। বেড়াতে আসা মানে কি টাকা ওড়ানো? কাল রাঁচিতে ফালতু ফালতু আটশো টাকা দিয়ে ঘর নিলে। মাত্র এক দিন তো থাকা, স্বচ্ছন্দে সস্তার হোটেলে ওঠা যেত।

জিভে উষ্ণ চায়ের স্পর্শ পেয়ে মৈনাকের মেজাজ শরিফ হয়েছে। লঘু গলায় বলল,—এত পাইপয়সার হিসেব কোরো না তো। ভাবো দেখি, কতকাল পর আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি!

—আহা, গত বছরেই তো দিল্লি-আগ্রা গেলাম।

—সে তো আমরা তিনজন। তুতুনও ছিল। শুধু দুজনে এভাবে........

কাল থেকে এই নিয়ে কথাটা বোধ হয় পাঁচবার উচ্চারণ করল মৈনাক। সত্যিই তো, শুধু তাদের দুজনের আর বেড়ানো হয় কই! হানিমুন থেকে ফেরার মাস দুয়েকের মধ্যে সুতপার পেটে তুতুন এসে গিয়েছিল। তারপর থেকে তারা যখনই বেরিয়েছে, মাঝখানে মেয়ে।

এবারও কি তুতুন ছাড়া আসার পরিকল্পনা ছিল? মোটেই না। এমন একটা মনোরম পাহাড় জঙ্গলময় জায়গায় যাওয়া হবে জেনে মেয়ে তো তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছিল। ছবিটা বদলে গেল শেষ মুহূর্তে। তুতুনের স্কুল হঠাৎই ঠিক করল এক্সকারশানে নিয়ে যাবে সেভেন এইটের ছাত্রীদের। অযোধ্যা পাহাড়ে। এই বড়দিনের ছুটিতেই। ব্যস্, ওমনি তুতুনের ঘাড় ট্যারা। বাবা-মা নয়, বন্ধুদের সঙ্গেই যাবে সে। চাপ দিলেই মুখ ভার, চোখ ছলছল। শেষে রেগেমেগে সুতপাই বলল, চলো আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি।

যদিও তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওনা হওয়ার পর মন্দ লাগছে না সুতপার। বার বার মৈনাকের এই স্মরণ করিয়ে দেওয়াটাও বেশ লাগছে। হৃদয়ের কোন এক তন্ত্রীতে

যেন বাজনা বেজে উঠছে হঠাৎ হঠাৎ। এই হানিমুনের জায়গাতেই দুজনের আবার আসাটা কি কাকতালীয়? তুতুনের না আসাটাও?

সুতপা অবশ্য গোপন আনন্দটাকে সেভাবে প্রকাশ করল না। কটাক্ষ করে বলল,—তো? দুজনে এসে কি হাত পা গজিয়েছে?

—গজাবে, গজাবে। একটু সময় যাক। আর একটু থিতু হও।

—হুঁহ, থিতু! যা লঝঝড় বাসে চড়ালে, সমস্ত হাড়গোড় যেন ঢলঢলে হয়ে গেছে।

—আগেরবারেও এই বাসেই এসেছিলে ম্যাডাম।

—সেবার সময় অনেক কম লেগেছিল।

—এই জন্যই তো বলি তুমি আর নেই সে তুমি। সুর করে গেয়ে উঠল মৈনাক, —সেবার সাড়ে ছ' ঘন্টা লেগেছিল, এবার এক ঘন্টা কম।

—তা হবে। আমার অত মনে নেই।

—তোমার তো সবই নিজের প্রয়োজন মতো মনে পড়ে। ঠাট্টার ছলেই মৈনাক বলল কথাটা,—তা এখন কী সেবা করতে হবে মহারানির? স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে দেব?

—পেন কিলার এনেছ? থাকলে দাও, আমার কোমর ব্যথা করছে। তোমার গাড়োয়ানি রসিকতা আমার ভালো লাগে না।

সুতপার স্বরের রুক্ষতায় হালকা ছন্দটা ছিঁড়ে গেল। খাট থেকে নেমে কিটসব্যাগ ঘেঁটে মৈনাক একটা ওষুধের স্ট্রিপ বার করেছে, ছুড়ে দিল সুতপার বিছানায়!

ট্যাবলেট গিলে সুতপা শুয়ে পড়েছে,—আমি একটু চোখ বুজে নিচ্ছি। চান করবে তো এখনি করে নাও। গরম জলে কোরো, নইলে তো আবার ফ্যাঁচফোঁচ শুরু হবে।

—থ্যাংকস্ ফর দা অ্যাডভাইস।

—আর শোনো, দয়া করে ওই ঘেমো গেঞ্জিটা আর পোরো না। বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছে।

—কাঁধে পাজামা পাঞ্জাবি ফেলে বাথরুমে ঢুকছিল মৈনাক, ঘুরে দাঁড়াল,— শীতকালে ঘাম কোথ্থেকে পেলে?

—তোমার বারোমাসই ঘাম। তোমাদের বংশটাই ঘেমো।

মৈনাক চটে গেল,— তোমার বাবা-মা'র গা দিয়ে বুঝি পারফিউম বেরোয়? তোমার ঘাম বুঝি গোলাপজল? বলেই আর উত্তরের অপেক্ষায় নেই মৈনাক। সশব্দে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

দুই

বিকেলবেলা মৈনাক একাই হাঁটতে বেরিয়েছিল। সুতপার গা ম্যাজম্যাজ করছে, শুয়েই রইল, উঠল না। এখানে কোনো রাস্তাই সমতল নয়, সর্বত্রই ওঠানামা আছে। চড়াই উতরাই করতে করতে মৈনাক বাসস্ট্যান্ডের দিকটায় চলে গেল। মাত্র এক কিলোমিটারটাক দূর, শেষের দিকে বেশ খানিকটা খাড়াই উঠতে হয়, পৌঁছে মৈনাক রীতিমতো হাঁপাচ্ছিল।

অঞ্চলটায় বসতি বলতে প্রায় কিছুই নেই। ভ্রমণার্থীদের জন্য গোটা কতক রেস্ট হাউস, গুটিকয়েক সরকারি বাংলো, স্থানীয় আদিবাসীদের একটা বস্তি, ব্যস্। পাইন আর ইউক্যালিপটাস ছাওয়া এই পাহাড়চূড়ায় মানুষের বসবাস বুঝি তেমন মানায়ও না। বাসস্ট্যান্ডের দিকটাই যা ন্যাড়ান্যাড়া, ওখানে একটা ছোট্ট জনপদ আছে। একটা বাজার মতো, অল্পস্বল্প কয়েকটা দোকান, দু-চারটে ঝুপড়ি। পনেরো বছর আগে এদিকটাও এক্কেবারে ফাঁকা ছিল, শুধু টিমটিম করত এক আধটা মলিন চায়ের দোকান। ছুটিছাটায় ভ্রমণার্থীদের এখানে ভালোই সমাগম। তখনও হত, এখনও হয়। বাজার চষছে তারা, রংবেরং সোয়েটার কার্ডিগান শাল টুপি মাংকিক্যাপ দেখা যায় ইতিউতি। একটা মহুয়ার ঠেকও গজিয়েছে, উগ্র কষটে গন্ধে ম ম করছে বাতাস।

মৈনাক দোকানে বসে গরম গরম চা খেল দু গ্লাস। উঠে টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা সারল। বিস্কুট চানাচুর নিমকি বাদাম.....সন্ধেবেলায় চাটও হবে, দরকার অদরকারে মুখও চলবে। কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিল। এক ডজন মোটা মোমবাতিও। শশধর বলছিল, সন্ধে হলেই এখানে নাকি কারেন্ট অনবরত যাতায়াত করে। ঘরে লণ্ঠন দেওয়া আছে, তবু হাতের কাছে মোমবাতি থাকা ভালো।

পাহাড়ে সূর্য ঝপ করে ডুবে যায়। এই আছে, এই নেই। এতক্ষণ একটা দিব্যি নরম আলো খেলা করছিল, দ্যাখ না দ্যাখ মরে গেছে আলোটা। ঠাণ্ডা আচমকাই দ্বিগুণ যেন।

কাঁপতে কাঁপতে বাংলোয় ফিরে মৈনাক দেখল সুতপা বসে আছে বারান্দায় বেতের চেয়ারে। গুটিসুটি মেরে। সুতপার পায়ের কাছে শশধরের বউ। দুজনে গল্প হচ্ছে খুব।

হাত ঘষতে ঘষতে মৈনাক ঘরে ঢুকে গেল। বাহারি শেডে ঢাকা বাল্‌বখানা জ্বালিয়ে রেখেছে সুতপা, কিন্তু আলোয় তেমন দ্যুতি নেই। লো পাওয়ার? মৈনাক টিউবলাইটের সুইচ অন্ করল। দপদপই সার, ভোল্টেজ কম, জ্বলছে না। যাক গে যাক, ম্যাটমেটে আলোই ভালো। ছায়ায় আলোয় বেশ একটা ঘোর ঘোর পরিবেশ তৈরি হয়েছে ঘরে।

সুতপা বকবক করেই চলেছে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে মৈনাক ডাকল,—শুনছ?

—যাই।

এল সুতপা। বেশ সাজগোজ করেছে বিকেলে। মুখে সুগন্ধি ক্রিমের প্রলেপ, তেলতেল করছে মুখখানা। কপালে চাকা টিপ, ঠোঁটে হালকা রং। চোখেও কিছু লাগিয়েছে কি? দৃষ্টি একটু গভীর লাগে যেন? দুপুরের সেই শ্রান্তির চিহ্নমাত্র নেই, বরং সুতপাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

এই না হলে ভাল্লাগে? মৈনাকের মনটাও প্রফুল্ল হয়ে গেল। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, —শরীর পুরো ফিট মনে হচ্ছে?

—অনেকটা। চম্পা একটা ফার্স্ট ক্লাস চা খাওয়াল, মাথা একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে।

—শশধরের বউয়ের নাম বুঝি চম্পা?

—হুঁ। বেশ মেয়ে। অনেক গল্প করছিল।

—কী গল্প?

—নানান রকম। ঘরোয়া কথা। পেটে বাচ্চা আছে, সামনের মাসে বাপের বাড়ি চলে যাবে।

—তাহলে খুব টাইমলি এসেছি বলো? একমাস পরে এলে শশধরের হাতে রান্না খেতে হত।

—ওর নাকি এমাসেই চলে যাওয়ার কথা ছিল। এ সময়ে ট্যুরিস্টদের খুব ভিড় থাকে তো, তাই রয়ে গেছে। কিন্তু কী কপাল, এবার লোকই নেই।

—তার মানে আমও গেল, ছালাও গেল। বাপের বাড়িও যাওয়া হল না, এখানে বরের উপরিও মিসিং।

—হুম। সুতপা ঠোঁট চেপে হাসল,—কিন্তু সত্যিই এ বছর লোক এত কম কেন বলো তো? ভাগ্যিস চম্পাকে ডেকে নিলাম, নইলে আমার কেমন হানাবাড়ি হানাবাড়ি লাগছিল।

—বুকিং ক্যানসেল হয়ে গেছে বোধ হয়। স্যুটকেস থেকে হুইস্কির বোতল বার করে সেন্টার টেবিলে রাখল মৈনাক। সুতপার পাশে সোফায় বসেছে। আলগাভাবে কাছে টানল সুতপাকে,—কিংবা ধরো এমনও হতে পারে.....আমরা আসব বলেই সবার বুকিং ক্যানসেল করে দেওয়া হয়েছে।

—ইশ, কী এমন লাটসাহেব এলেন রে!

মৈনাক চোখ টিপল,—উঁহুঁ, লাটসাহেব নয়, লাটসাহেবের জামাই।

—অ্যাই, ফের তুমি বাপ তুললে?

—তোমার বাপকে আমি তুলব? কত যেন ওজন এখন? আটাত্তর? না আশি? সুতপা কটাশ করে চিমটি কাটল একটা। উ হুঁ হুঁ হুঁ করে উঠল মৈনাক, পরক্ষণেই বউকে জাপটে ধরে চকাস চুমু খেয়েছে, নাকে নাক ঘষল।

হালকা ঠেলে মৈনাককে সরিয়ে দিল সুতপা,—হচ্ছেটা কী? যথেষ্ট বয়স হয়েছে...

—বয়স হলে বউকে আদর করা যায় না বুঝি?

—সব কিছুর একটা স্থানকালপাত্র আছে।

—তো কী? এখানে আছেটা কে?

—শশধর চম্পা তো আছে।

—দ্যাখো গিয়ে এই শীতে ওরাও এখন দুজনে.....। মুখচোখ বেঁকিয়ে একটা আদিরসাত্মক ইঙ্গিত করল মৈনাক,—আমরা এখানে মস্তি করতে এসেছি, তীর্থ করতে তো নয়।

—বটেই তো। সুতপা হাসতে হাসতে বলল,—বোতল.... মেয়েছেলে.....তামসিকতার একেবারে চূড়ান্ত। এই না হলে মাস্টারমশাই?

—জঙ্গলে এসেও সভ্য ভদ্র সেজে থাকতে হবে নাকি? মৈনাক বুড়ো আঙুল দিয়ে বোতলটাকে দেখাল, —আজকে কিন্তু তুমিও খাবে।

—আমার যে বড্ড মাথা ধরে।

—ধরুক। আমি মাথা টিপে টিপে ছাড়িয়ে দেব।

সুতপাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মৈনাক। গুনগুন গানের কলি ভাঁজছে। জগ আর গেলাস এনে রাখল টেবিলে। প্লাস্টিকের প্যাকেটগুলোও। দরজায় গিয়ে হাঁক ছাড়ল, —শশধর.....? শশধর......?

পাঁচ সেকেন্ডে শশধর হাজির। কাছেপিঠে ঘাপটি মেরে ছিল নাকি? অপ্রস্তুত মুখে চোখ চাওয়া চাওয়ি করল মৈনাক সুতপা। গলা খাঁকরি দিয়ে মৈনাক বলল,— একটা বড় প্লেট লাগবে যে।

বোতলে চোখ গেছে শশধরের। উৎসাহভরে বলল, —এক্ষুনি আসছি স্যার।

—বেশি করে পেঁয়াজকুচি শশাকুচিও এনো।

—পকোড়া ভেজে দেব স্যার?

—সে তো অনেক সময় লাগবে।

—কত আর! মিনিট পনেরো।

—দাও তবে।

শশধর দরজা খুলতেই কনকনে বাতাস ঢুকে পড়েছে অন্দরে, পলকে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগার জোগাড়। প্রায় দৌড়ে গিয়ে সুতপা দরজাটা ভেজাল। বলল— তোমাদের এই ফায়ার প্লেসটা কি শো-পিস?

—না ম্যাডাম, জ্বালানো যায়। তবে......কাঠ নেই। যদি বলেন কাল আনিয়ে রাখব।

—আজ শীতে জমে গিয়ে কাল ফায়ারপ্লেসে কী হবে? সুতপা ঈষৎ অসন্তুষ্ট,— ঠিক আছে, যাও।

শশধর চলে গেল।

খাটে গিয়ে বসল সুতপা, কম্বলে পা ঢেকেছে। বলল,—খুব ভুল হয়ে গেছে। ড্রয়ারটা আনা উচিত ছিল।

—উলের মোজাটা পরেছ?

—পরেছি তো।

—তা হলে এবার বোতল দেবীই ভরসা। চড়ে গেলে ঠাণ্ডা বাপ বাপ বলে ভাগবে।

শশধর ফের আসা পর্যন্ত বিছানাতেই মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে রইল সুতপা। পরিপাটি করে প্লেট সাজিয়ে আনল শশধর। শশা পেঁয়াজ ধোঁয়া ওঠা পকোড়া.....

দরজা ভালো করে বন্ধ করে মৈনাক ডাকল,—চলে এসো। কাম অন্।

পায়ে পায়ে এসে বসল সুতপা। মৈনাকের মুখোমুখি। কাঁপছে অল্প অল্প।

দুটো গ্লাসে আন্দাজমতো সোনালি পানীয় ঢালল মৈনাক। মেপে জল মেশাল। একটা গ্লাস সুতপাকে ধরিয়ে দিয়ে বলল,—চিয়ার্স। এসো, আমরা আমাদের সেকেন্ড হানিমুনের স্বাস্থ্য পান করি।

ঢক করে লম্বা চুমুক দিল সুতপা। একটু কেশেও নিল।

মৈনাকের এক হাতে গ্লাস, এক হাতে সিগারেট। জিজ্ঞেস করল, —শীত কমছে?

—হুঁ।

আর কথা নেই। নিঃশব্দে দুজনে পান করছে সোনালি তরল। প্লেট থেকে নিমকি তুলে তুলে খাচ্ছে সুতপা, শশা পেঁয়াজের কুচি দাঁতে কাটছে মৈনাক। জ্বলন্ত সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে বন্ধ ঘর। নৈঃশব্দ্যেও।

খানিকক্ষণ পর মৈনাকই বলল, —কী হল, একদম চুপ মেরে গেলে কেন?

—কী বলব?

—কিছু অন্তত বলো। কেমন লাগছে? এবার এসে কীরকম ফিলিং হচ্ছে......?

সুতপার মুখে আলগা ভাঙচুর, — মেয়েটার জন্য খুব ভাবনা হচ্ছে গো।

মৈনাক উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,—আরে দূর, তুতুনের এখন ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। দঙ্গল বেঁধে ট্যুর, সে দিব্যি মজাসেই আছে।

—থাকলেই ভালো। সুতপার ছোট্ট শ্বাস পড়ল,—আমাদের ছেড়ে এই প্রথম.... গেল তো গেল অযোধ্যা পাহাড়েই গেল।

—কেন, অযোধ্যা পাহাড় তো ভালো জায়গা।

—ছাই ভালো। দ্যাখোনি কাগজে, ওখানে কী সব খারাপ মশাটশা আছে!

—বেশি ঠাণ্ডায় মশা থাকে না, শুনলে তো শশধরের মুখে। এতক্ষণ এখানে রয়েছ, মশা টের পাচ্ছ? অযোধ্যা পাহাড়েও এখন খুব শীত। মৈনাক গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল। হাতের পিঠে ঠোঁট মুছে বলল, —তা ছাড়া তুমি তো স্কুলে গিয়ে

খোঁজ নিয়েছ। চার চারজন বাঘা বাঘা টিচার যাচ্ছে, তারা ঠিক খেয়াল রাখবে।

—কী জানি বাবা, আমার ভরসা হয় না।

—ছাড়ো তো। সবসময়ে অত মেয়ে মেয়ে কোরো না। বড় হচ্ছে, এখন ওকে একটু ডানা মেলতে দাও।

কথাটা হাল্কাভাবেই বলল মৈনাক, কিন্তু সুতপার যেন একটু আঁতে লেগে গেল। আহত স্বরে বলল,—মেয়ে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করব না?

—একশো বার করবে। তবে যতটা এখন রয় সয়, ততটাই। কোনো কিছুতেই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তপু।

—আমি বাড়াবাড়ি করি?

করো না? সারাক্ষণ মেয়েটার পেছনে লেগে আছ। বেচারা খেলাধুলো করতে পারে না, কারও বাড়ি যাওয়ার পারমিশন নেই, সর্বক্ষণ ঘেঁটি ধরে বইয়ে মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছ......

—সে তো তুতুনের ভালোর জন্যই। ওর স্কুলে যা পড়াশুনোর চাপ।

—মানছি। তবু সব কিছুর একটা লিমিট আছে। খোলা হাওয়ায় ছাড়বে না, পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে দেবে না, ঘরে বন্ধ রেখে রেখে ওকে তো তুমি একালষেঁড়ে বানিয়ে ফেলছ।

সুতপার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল, —পাঁচজন মানে কে? তোমার বাপের বাড়ির গুষ্টি?

—তারা তো আছেই। পুজোর সময়ে বউদি কত আদর করে ডাকল তুতুনকে, আয় আয় হোল নাইট ঠাকুর দেখতে যাব...তুমি বলতে পারবে না তুতুনের ইচ্ছে ছিল না.....তুমি প্যাঁচ মেরে কাটিয়ে দিলে। গেলে তোমার মেয়ের কী ক্ষতিটা হত?

—ও। কথাটা তুমি মনে পুষে রেখেছ?

—না, রাখিনি। হঠাৎ মনে পড়ল বলে বললাম।

—তা হলে পরিষ্কার শুনে রাখো, আমি বুবলির সঙ্গে তুতুনকে মিশতে দিতে চাই না। তোমার দাদার মেয়েটি অতি ডেঁপো, ওর সঙ্গে মিশলে আমার মেয়ের ইহকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

—বটেই তো। মৈনাক ফস করে বলে ফেলল,—তুমি তো সকলকেই ইহকাল ঝরঝরে হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাচ্ছ! আমাকে যদি হুড়ো দিয়ে ওবাড়ি থেকে বার করে না আনতে তা হলে নিশ্চয়ই আমারও সর্বনাশ হয়ে যেত!

—আমার ঠেলায় তুমি আলাদা হয়েছিলে? তুমি খুব সাধু পুরুষ? আমার সঙ্গে তখন অহরহ গুজগুজ করতে না, ও বাড়িতে আর বাস করা যায় না....ওটা বাড়ি নয়, মেছোহাটা..... মেয়েকে মানুষ করতে গেলে ওখান থেকে সরে যেতে হবে.....নিজের একটা কিছু করে নিতে হবে.....? আর এখন সব দোষ নন্দ ঘোষ?

সত্য যেন এক দু-ধার তলোয়ার। মৈনাক চুপ মেরে গেল। সুতপাও পাথরের

মতো স্থির। গ্লাসের সোনালি পানীয় শেষ, নতুন করে ভরার আর উৎসাহ পাচ্ছিল না মৈনাক। পকোড়া গালে ফেলে চিবোতে ভুলে গেল সুতপা। যেন এক স্নায়ুযুদ্ধ চলছে ঘরে, কে হারে কে জেতে।

আপনা আপনি সমাধান হয়ে গেল। লোডশেডিং। বনবাংলোর ঘর হঠাৎ কয়লাখনির খাদান। একটু অপেক্ষা করে সুতপা গজগজ করে উঠল,—কী হল, অন্ধকারে কতক্ষণ বসে থাকব?

মৈনাকের স্বরও বেজেছে—মোমবাতিটা যে কোথায় রাখলাম!

—দেশলাই তো জ্বালা যায়।

—হ্যাঁ, তাই তো।

—হুঁহ্ এই না হলে বুদ্ধি!

জ্বলছে মোমবাতি। স্তিমিত আলোয় সুতপাকে ঝলক দেখল মৈনাক। গলা ঝেড়ে বলল,—গ্লাসে তো একটু পড়ে আছে, শেষ করো।

—আর ভাল্লাগছে না।

—অযথা মুড খারাপ করছ কেন? ঠিক আছে বাবা, আমার দোষ।

—তোমার কেন হবে! সব দোষ আমারই।

—বেশ তো, এসো ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি করে নিই। মৈনাক শব্দ করে হেসে উঠল,—আরে বাবা, জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা তো ভালোই আছি। সত্যি ভালো আছি। ওই ক্যালর ব্যালর, গাদাগাদি......আমার স্টুডেন্ট পড়ানোর জায়গা ছিল না, বন্ধুবান্ধবদের ডাকতে পারতাম না, তোমারও ওখানে পোষাচ্ছিল না....

কাকে কৈফিয়ত দিচ্ছে মৈনাক? কেন দিচ্ছে? সুতপা বুঝতে পারছিল না। তবে ঝাঁঝ যেন অনেকটা মরে এল তার। হুইস্কির প্রভাবে মাথায় সামান্য ঝিমঝিম ভাব, মৃদু আচ্ছন্নতাই যেন মলম লাগাচ্ছে ক্ষতে।

মৈনাক একা একাই পান করছিল। সুতপা টর্চ নিয়ে একবার বাথরুমে গেল। সোফায় ফেরেনি, খাটে বসে ফের কম্বল টেনেছে।

আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল,— তোমার সেই এরিয়ারটা কবে পাচ্ছ?

—কোনটা? সিলেকশান গ্রেডের? মৈনাক সেন্টারটেবিলে পা তুলে দিল,—বিলটিল হয়ে গেছে, হয়তো নেক্সট মাসেই....

—কত পাবে?

—কী আর হাতে আসবে। ট্যাক্সেই তো সব খেয়ে নেবে।

—ও আমাকে অ্যামাউন্টটা বলতে আপত্তি আছে?

—আবার বাঁকা কথা। তুমি না একটা জিলিপি।

—তুমি অমৃতি।...বলবে অ্যামাউন্টটা? না চেপে যাবে?

মৈনাকের একটু নেশা হয়েছে। খিকখিক হেসে বলল,—আমার সবই তো তুমি

তপু। তোমার কাছে কী লুকোব?

—আহা ঢং। মরে যাই। সুতপাও ফিকফিক হাসছে,—ভ্যানতাড়া না করে বলবে?

—আঠাশ তিরিশ মতো হবে। একদম পয়সা অব্দি হিসেব দিতে পারব না।

বাইরে সরসর শব্দ! ইউক্যালিপটাসের পাতায় বাতাস কাটছে। একটা রাতচরা পাখির ডাক ভেসে এল। কর্কশ শব্দ। আরও কিসের যেন একটা আওয়াজ শোনা যায়। ক্ষীণ, কিন্তু তীক্ষ্ণ।

কান পেতে সুতপা আওয়াজটাকে বোঝার চেষ্টা করল একটুক্ষণ। আচমকা বলল, —টাকাটা দিয়ে কী করবে?

—যা করি। মৈনাকের স্বর জড়িয়ে গেছে,—ফ্ল্যাটের লোনের গভ্‌বায় ঢালব।

—পুরোটা ওখানে দিও না। আমার দশ হাজার মতো লাগবে।

—কী করবে?

—বারে, ফাল্গুনে রিন্টির বিয়ে না। ওকে একটা নেকলেস গড়িয়ে দেব। একদম ফঙফঙে মাল তো দেওয়া যায় না, অন্তত ভরি দুয়েক।

—নেকলেস? মৈনাক সামান্য ঝাঁকুনি খেয়ে গেল, —তার কমে দেওয়া যাবে না?

—বারে, দাদা আমার বিয়েতে কম করেছিল? সবে তখন চাকরিতে ঢুকেছে, এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করে, ধার করে, যা পারে বাবাকে দিয়েছিল। আজ আমাদের সামর্থ্য আছে, দাদার মেয়ের বিয়েতে একটা ভালো গয়না না দিলে আমার মানটা কোথায় থাকে? মৈনাক হাত উলটোল,—ঠিক হ্যায়। প্রাণে যখন চেয়েছে, দিয়ো।

—টিজ করছ?

—আরে না। চটো কেন? আমার টাকা তো তোমারই টাকা।

—তুমি তাই ভাবো বুঝি? সুতপা ঠোঁট বেঁকাল,—আমার সঙ্গে তো একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত করোনি, পাছে আমি দরকারে টাকা তুলি।

সর্বনাশ, আবার কাদা-ছোড়াছুড়ির সূচনা! কথায় কথায় কেন যে এমন তুচ্ছ ক্ষুদ্রতাগুলো বেরিয়ে আসে? এখনই হয়তো মৈনাকের একশোটা দোষ উদ্ঘটিত করবে সুতপা, আর সুতপার একশো একটা নীচতার অকারণ উন্মোচিত করবে মৈনাক। এটাই কি এখন অবধারিত?

মৈনাক আর বিশেষ কথা বাড়াল না। বোতলটা খাপে ঢুকিয়ে ওয়ার্ড্রোবে ভরে রাখল। নেশাটা আধাখেঁচড়া হয়ে থমকে গেছে। থাক গে, আজ এইটুকুই থাক।

আলো এল রাতে খাওয়া দাওয়ার পর। ভোল্টেজ খানিকটা বেড়েছে, টিউবলাইটও জ্বলল। তক্ষুনি তক্ষুনি শুতে ইচ্ছে করছিল না মৈনাকের, কিট্‌সব্যাগ খুলে বার করল তাসের প্যাকেটখানা। কম্বল গায়ে ছড়িয়ে পেশেন্স খেলছে।

সুতপাও নিজের খাটে। নিজের কম্বলের আড়ালে। মশারি বার করে দিয়ে গেছে শশধর, টাঙায়নি। মাঝে মাঝে মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে দেখছিল মৈনাককে। কী নিমগ্ন ভঙ্গিতে একা একা খেলছে মৈনাক! পর পর সাজাচ্ছে, নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার.....হরতন ইস্কাবন রুইতন....

বাইরে এখন হিমঋতু নিঝুম। গাঢ় আকাশে জেগে উঠেছে কোটি কোটি নক্ষত্র। ঝিকঝিক হাসছে। পৃথিবীর পানে তাকিয়ে এক ভরভরন্ত চাঁদ। চরাচরে অপরূপ জ্যোৎস্নার মায়া। শাল সেগুনের পাতায় রুপোলি আবেশ।

চাঁদ আকাশ ভাঙছিল। বনবাংলোর এক বন্ধ দরজায় এসে দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল চন্দ্রকিরণ।

ভেতরে সুতপা নীচু স্বরে ডাকছে,—কী গো, শোবে না?

তাসে ডুবে থাকা মৈনাক অন্যমনস্ক জবাব দিল,—হুঁ।

আরও নীচু গলায়, সুতপা প্রায় ফিসফিস করে বলল,—খাটদুটো কি জোড়া লাগাবে?

মৈনাক আবছাভাবে বলল,—উঁ? হুঁ।

তিন

ঝরনাটার চেহারা নিতান্তই সাদামাঠা। কোথায় এর উৎস কে জানে, মসৃণ পাথরের ঢাল বেয়ে সরু ধারায় নেমে এসেছে। সমতলে এসে অতি শীর্ণ এক নদী হয়ে বনপথে বয়ে যাচ্ছে তিরতির। স্থানীয় অধিবাসীরা ঝরনাটির নাম দিয়েছে কালিঝোরা। আপাত চোখে ঝরনার জলের রং সত্যিই কুচকুচে কালো, তবে কাছে গেলে বোঝা যায় জল কালো নয়, পাথরের জন্যই তাকে কালো দেখায়। আবার হাতে নিয়ে দেখলে কী দারুণ স্বচ্ছ, তালুর প্রতিটি রেখা প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে জলে। একেই বুঝি বলে কাকচক্ষু জল।

সাত সকালে ঝরনাটাকে ঘিরে রীতিমতো মানুষের মেলা বসে গেছে। এত লোক এ পাহাড়ে বেড়াতে এসেছে কাল বিকেলেও মৈনাক টের পায়নি। হইহই করছে সকলে, হিমশীতল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছে। এক দশাসই চেহারার লোক রঙিন আন্ডারওয়্যার সম্বল করে তো নেমেই পড়ল জলে! ঝরনা ধারায় স্নান! জলে গা ভিজিয়ে তৃপ্তি হয়নি লোকটার, পাথরে বসে চেপে চেপে সাবান ঘষছে গায়ে। তার সাহস দেখে দর্শককুল শিহরিত।

মৈনাক সুতপারও মজা লাগছিল। মৈনাক কৌতুক করে বলল, কী গো, নামবে নাকি?

—নামাই যায়। জম্পেশ একটা নিমোনিয়া নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যিখানে ছোট্ট ফাঁকা মাঠ। ইতিমধ্যেই সেখানে আবির্ভূত হয়েছে পিকনিক পার্টি। ম্যাটাডোর থেকে ঝপাং ঝপাং বড় বড় হাঁড়ি কড়া নামাচ্ছে। জোরে হিন্দি গান চালিয়ে দিল। চটুল সংগীতের মূর্ছনায় জংলা পাহাড়েব নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান।

কোনও মানে হয়? মৈনাক বিরক্ত মুখে বলল,—চলো, ফিরি।

সুতপা ঘড়ি দেখল, —এত তাড়াতাড়ি? সবে তো সাড়ে নটা বাজে, ফিরে কী করবে এখন?

—আর এখানে থাকা যায় না। কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।

—তোমার সঙ্গে কোথাও বেরোনোই দায়। এটা ভাল্লাগে না, ওটা পছন্দ হয় না......ভোরবেলা তোমায় কত করে ডাকলাম, ওঠো ওঠো, সানরাইজটা দেখি.....কম্বল ছেড়ে তোমার নড়তেই ইচ্ছে করল না।

—এমন শীতের ভোরে বিছানা ছাড়া যায়?

—তা যাবে কেন, মোষের মতো শুধু নাক ডাকানো যায়।

—সানরাইজের আছেটা কী? ও তো বাড়ির ছাদে উঠেও দেখা যায়।

—সে তো ধাপার মাঠে গিয়েও দেখতে পারো। সুতপা চোখ পিটপিট করল,—কী অসাধারণ দৃশ্য যে তুমি মিস করলে। সার সার পাহাড়, একটু একটু করে আলো ফুটছে.....কী কালারফুল! আমাদের বাংলোর মহুয়াবেদিটা এখনকার বেস্ট সানরাইজ স্পট। ওই ভোরেও ওখানে কত ট্যুরিস্ট এসেছিল জানো?

—আলটিমেটলি দেখলেটা কী? একটা দিশি হাঁসের ডিমের কুসুম লাফাতে লাফাতে উঠল। এই তো?

সুতপা মুখ ভার করল,— তোমার শুনে কাজ নেই।

—খেপছ কেন? কাল মর্নিং-এ মেরে দেব। ব্যাটা তো কালও উঠবে, না কি?

—থাক। এসেছ তো বোতল ওড়াতে, বোতলই ওড়াও।

চোখা একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল মৈনাক, তার আগেই কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠেছে। পিছন ফিরেই চমকাল মৈনাক। অলোক, তার ইউনিভার্সিটির সহপাঠী। অলোকও একটা কলেজে পড়াচ্ছে এখন, রানাঘাট লাইনে। জমি কিনে গড়িয়ায় বাড়ি করেছে অলোক, মৈনাকদের ফ্ল্যাটের কাছেই। এখন আর দুজনের তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা নেই বটে, তবে মাঝে-মধ্যে আসা-যাওয়া আছে।

মৈনাক হইহই করে উঠল,—কী রে, তুই এখানে? তুই কি আমাদের কলকাতা থেকে ধাওয়া করে এলি?

—একেই বলে প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। হা হা। অলোক গলা ছড়িয়ে হাসল,—কবে এসেছিস?

—কাল দুপুরে।.... তোরা?

—কাল সন্ধেয়। রাঁচি থেকে একখানা জিপ নিয়ে এসেছি।

অলোকের স্ত্রী শর্মিলাও এগিয়ে এসেছে, মুখে জ্বলজ্বল করছে হাসি। মৈনাককে বলল,—আপনার বন্ধুটির যা উদোমাদা, আপনাদের দেখতেই পায়নি। আমি বলতে....। বলতে বলতে সুতপার দিকে ফিরল—কী গো, তোমাদের মেয়ে কোথায়?

সুতপা স্মিত মুখে বলল,—ও এল না। স্কুলের সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

—গেছে, না পাঠিয়ে দিয়েছ? শর্মিলা খিল খিল হেসে উঠল। অলোককে বলল,—দেখেছ, কী সুন্দর কায়দা করে দুটিতে বেরিয়ে পড়েছে।

অলোক-মৈনাককে চোখ টিপল,—বস্, তোমার এখনও বেশ ইয়ে আছে তো? দিব্যি সেকেন্ড হানিমুন মানাচ্ছ!

—হ্যাহ, এই বুড়ো বয়সে হানিমুন! হাসাস না।

অলোক শর্মিলার বছর আষ্টেকের ছেলে লাফাতে লাফাতে হাজির,—বাপি বাপি, আমি ঝরনায় একটু পা ডোবাব। চলো না, তুমি আমায় একটু ধরে থাকবে।

—তোর মামাকে বল্।

—ও, তোর শালাও এসেছে বুঝি?

—শুধু শালা নয়, শালার শালাও আছে। সঙ্গে শালাশাবক, শালাপত্নী....

—আইব্বাস! এ তো পুরো গ্যাং রে।

—হুম্। মোট সাতজন। অ্যান্ডাবাচ্চা মিলিয়ে।

—ইশ্ আপনাদের কী মজা। কী সুন্দর দলবল জুটিয়ে বেরিয়েছেন। সুতপা পুট করে বলে উঠল।

—তোমরাই বা কী খারাপ বেরিয়েছ ভাই? শর্মিলা টিপ্পনি কাটল—দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী...থুড়ি, সুখে সুখী।

মৈনাক হেসে বলল—অন্যভাবেও বলতে পারো। দুজনে হাতাহাতি, কখনও লাঠালাঠি..........

ঠাট্টা হাসি চলছে জোর। অলোকের শালা ইন্দ্রজিতও খুব রসিক, এসে যোগ দিয়েছে হাস্যপরিহাসে। ইন্দ্রজিতের বউ কাকলির সঙ্গে দুমিনিটে আলাপ জমে গেল সুতপার, কলকল কলকল চলতেই লাগল। কাকলীর ভাই কবীর নেহাতই তরুণ, মেরে কেটে তেইশ-চব্বিশ, ক্যামেরা হাতে পটাপট ছবি তুলে যাচ্ছে সে। অলোকের ছেলেকে নিয়ে মৈনাক একবার ঝরনা থেকে ঘুরে এল।

সুতপা শর্মিলাকে জিজ্ঞেস করল,— তোমাদের এখন কী প্রোগ্রাম?

—আপাতত ফের ইরিগেশন বাংলো। চলো না আমাদের সঙ্গে। যাবে?

সুতপা মৈনাকের মুখের দিকে তাকাল। মৈনাক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—যাওয়াই যায়।

শুধু যাওয়া নয়, অলোকের অনুরোধে দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা ও হল সেখানে।

ভরপেট লাঞ্চ সাঁটিয়ে তাসে বসে গেল পুরুষরা। শুকনো শাকনা খেলা নয়, স্টেকে রামি। পার পয়েন্ট পাঁচ পয়সা। কবীর চাকরি বাকরি করে না, সম্ভবত এখনও প্রেমিকাও জোটেনি, তার তাস অসম্ভব ভালো, নিঃসাড়ে কুপিয়ে চলেছে তিন অগ্রজপ্রতিম সহখেলুড়েকে। মৈনাকরা অবশ্য তা নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছে না, তারা গল্পে বেশি মত্ত, খেলাটা তাদের নেহাতই অনুষঙ্গ। ইন্দ্রজিৎ চাকরি করে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে, অফিসের নানান চুটকি ছাড়ছে সে। মৈনাক তো হেসেই খুন। অলোক আর মৈনাক নিজের নিজের কলেজ নিয়ে ঘোঁটও করল খানিকক্ষণ। কথায় কথায় পলিটিক্স এসে গেল, ক্রিকেট-ফুটবলও। তর্কও বাধল। তবে সবই চলছে হালকা চালে। দুপুরটা ভারি জমজমাট কাটল মৈনাকের।

দুপুর সুতপারও মন্দ কাটেনি। কাকলির ঘরে গড়াল একটু, তার পর শুরু হল যার যার সন্তান। এপিসোড। তিনজনে মিলে হাঁটতেও বেরোল একটু, মিঠে রোদ্দুর মাখল গায়ে। ইউক্যালিপটাস থেকে টিয়ার ঝাঁকের ওড়াউড়ি দেখল, তিন সখীতে গন্ধ মাখল শালসেগুনের। শর্মিলা আর কাকলির ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছে, নরম মন খারাপ নিয়ে তাদের খানিকক্ষণ দেখল সুতপা। আহা রে তুতুনটা এলে কী ভালোই না হত।

বিকেল হতে না হতেই পুরুষদের তাড়া লাগাতে শুরু করেছে মেয়েরা। সানসেট সানসেট। জঙ্গলের ওপারে, পাহাড়ের উলটো প্রান্তে ভারি মনোরম এক টিলা আছে, সেখান থেকে চমৎকার সূর্যাস্ত দেখা যায়। গা মোড়ামুড়ি করে উঠল মৈনাকরা, জিপ হাঁকিয়ে পুরো দল গেল সেখানে, দিনের শেষ সূর্যাস্ত প্রাণ ভরে দেখল।

ফেরার পথে আর ইরিগেশন বাংলো নয়, মৈনাক সকলকে টেনে এনেছে বনবাংলোয়। শশধরকে মোটা বখশিস দিয়ে খানাপিনা হল জোর। কাকলির গানের গলাটি ভারি মিঠে, মোটামুটি চর্চাও আছে, সে একের পর এক রবীন্দ্রসংগীত শোনাল। সুতপাও এককালে ভালোই গাইত, উপরোধে পড়ে সেও গলা ছেড়েছে আজ।

আড্ডা ভাঙল অনেক রাতে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে কাদা, তাদের কাঁধে ফেলে প্রায় বরফজমা শীত মাড়িয়ে চলে গেল অলোকদের জিপ।

ফায়ারপ্লেস চালু হয়েছে আজ। শুকনো জ্বলন্ত কাঠের উত্তাপে অন্দরের শীতলতা আজ অনেক বেশি সহনীয়। এইমাত্র কারেন্ট চলে গেছে, মোমবাতির আলোয় ঘরময় এক স্নিগ্ধ অনুভূতি।

সন্ধেবেলা খাটদুটো জোড়া লাগানো হয়েছিল। গল্পগুজবের সময়ে। স্বামীস্ত্রী খাটে বসল পাশাপাশি। সুতপা নিজেকে কম্বলে ঢেকে বলল,—দিনটা আজ বেশ কাটল, না?

মৈনাক সিগারেট খাচ্ছিল। শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রে সরিয়ে রাখল সাইডটেবিলে। বলল,—অলোকটা বরাবরই খুব লাইভলি। ইউনিভার্সিটিতেও জমিয়ে রাখত।

—ইন্দ্রজিৎবাবুও কম নয়। জোকসের কী স্টক! বলেও বেশ রসিয়ে রসিয়ে।

—কাল দুপুরে তো ওরা ডাল্টনগঞ্জ চলে যাচ্ছে। যাবে নাকি ওদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ, শর্মিলাও খুব করে বলেছিল।....কিন্তু ফেরার কী হবে?

—থাকব তো কাল আর পরশু। সোমবার ওদের সঙ্গে রাঁচি ফিরব। ওদেরও তো ট্রেনের টিকিট সোমবারই।

—খারাপ হয় না। বেশ একসঙ্গে হইচই করতে করতে.....

—সেই জন্যই তো বলছিলাম। এখানে যা দেখার সে তো হয়েই গেছে। মর্নিং-এ সানরাইজ, দেন্ ভাগল্‌বা।

—একটা নতুন জায়গাও দেখা হবে। ডাল্টনগঞ্জের দিকে আগে তো যাইইনি।

—সব থেকে বড় কথা, ওদের সঙ্গটাও ভালো। আমাদের সঙ্গে ওয়েভলেনথ্ বেশ মিলছে।

—জিপে জায়গাও আছে। ধরে যাবে। কম্ফর্টেব্‌লি।

—মাগনা যাব না। ভাড়া শেয়ার করে নেব।

—তা তো বটেই।

—হুঁ। মৈনাক হাই তুলল,—প্রোগ্রাম তা হলে ফাইনাল? এসো এবার শুয়ে পড়ি।

মৈনাক সুতপার কম্বলে ঢুকে পড়ল। স্বামীস্ত্রী মিলিত হচ্ছে। যান্ত্রিকভাবে। অভ্যাসের মতো। মনে মনে খানিকটা যেন নিশ্চিন্তও দুজনে। নিজেদের বড় বেশি চিনে ফেলেছে তারা। মধ্যিখানে একটা কারুর উপস্থিতি জরুরি ছিল। মেয়ে না থাক বন্ধুবান্ধবই সই।